লালের পড়িবার ঘরে ঢুকিয়া দেখি তাঁহার টেবিলের উপর তাঁহার দুই ভলিয়ুম যোগশাস্ত্র এবং সর্ব্বদর্শনসংগ্রহের নবপ্রকাশিত ইংরাজী অনুবাদগ্রন্থ সাজান রহিয়াছে। নানা কথাবার্ত্তার পর যখন আমি উঠিয়া আসিতেছি রাজেন্দ্রলাল বলিলেন—এই কয়খানি পুস্তক লইয়া যাও, পড়িয়া দেখিও। কয়েক দিবস পরে তাঁহার বাসায় উপস্থিত হইলে রাজেন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলেন, 'হরপ্রসাদ, বহিগুলি পড়িয়াছ ?' আমি বলিলাম—হাঁ পড়িয়াছি। রাজেন্দ্রলাল জিজ্ঞাসা করিলেন—তোমার কোন্ অনুবাদ ভাল লাগিল ? আমি বলিলাম—'কাওয়েল ও গাফের কৃত অনুবাদ মূলানুগত, কিন্তু উহা বুঝিতে হইলে মনে মনে উহার সংস্কৃত তর্জ্জমা করিয়া লইতে হয়। আপনার অনুবাদ সব জায়গায় ঠিক literal না হইলেও we are carried away by your English.' তিনি সম্মতির সুরে বলিলেন—'Exactly so, আমিও তাহাই মনে করি।'

"রাজেন্দ্রলালের সমালোচকের দৃষ্টি খুব ছিল। লেখার ভাল-মন্দ বুঝিতে বা বিচার করিতে তিনি সিদ্ধহস্ত ছিলেন। কিন্তু তাঁহার একটা বড় মারাত্মক দোষ ছিল। কেহও যদি তাঁহার নিজের লেখার কোনও ভুল দেখাইত, তিনি ক্রোধে আত্মহারা হইতেন। কিন্তু আমিও ছিলাম নাছোড়বান্দা, তাঁহার রাগ বড় একটা গ্রাহ্য করিতাম না। হয় ত পুঁথীতে এক কথা আছে, ভুলিয়া তিনি আর এক লিখিয়া বসিয়াছেন এবং প্রুফ্ দেখিবার সময় আমি তাহা ধরিয়াছি। রাজেন্দ্রলাল ত একেবারে চটিয়া আগুন। আমি আস্তে আস্তে বলিলাম—'রাগিলে তো হইবে না, পুঁথীতে যাহা নাই তাহা লিখিয়াছেন।'

"এই বলিয়া পুঁথীর পাতা খুলিয়া যখন তাঁহাকে দেখাইয়া দিলাম, তখন তিনি মাথায় হাত দিয়া ভাবিতে বসিয়া গেলেন। খানিক পরে, গম্ভীরভাবে বলিলেন—এখন উপায় ? আমি তখন তাহাকে সংশোধন করিয়া লিখিতে বলিতাম। তখন তাঁহার রাগ

জল হইয়া যাইত, সন্তোষের চিহ্ন দেখা দিত। লেখার দোষ বাহির করিতে তিনি অদ্বিতীয় ছিলেন, তাঁহার মত সুন্দর ইংরাজী লিখিতে আর কাহাকেও দেখি নাই। আমি হয় ত একটা ইংরাজী লেখা তাঁহাকে পড়িয়া শুনাইতেছি; উহার যে অংশে দোষ তাহাও বেশ বুঝিতে পারিতেছি; কিন্তু কি হইলে যে ঠিক হয় স্থির করিতে পারিতেছি না। রাজেন্দ্রলাল ঠিক ধরিয়া ফেলিলেন এবং কাটিয়া কুটিয়া ভাষা এমন বদলাইয়া দিলেন যে, আমার আনন্দের আর সীমা থাকিল না।

"ইংরাজী রচনায় তাঁহার অসাধারণ ক্ষমতা ছিল। আমার বেশ মনে আছে, বাবু কৃষ্ণদাস পালের মৃত্যু হইলে যখন বাবু রাজকুমার সর্ব্বাধিকারী হিন্দুপেট্রিয়টের সম্পাদক হইলেন, তখন কোনও কোনও দিন দেখিতাম, রাজেন্দ্রলাল বক্তৃতার মত অনর্গল ইংরাজী বলিয়া যাইতেছেন, রাজকুমার বাবু লিখিয়া লইতেছেন এবং তাহাই হিন্দুপেট্রিয়টে পরে ছাপা হইয়া যাইতেছে। সে সময় রাজেন্দ্রলালই উহার প্রকৃত সম্পাদক ছিলেন। এই কাগজে তিনি বিস্তর প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। রাজেন্দ্রলাল মিত্রের প্রত্নতত্ত্ববিষয়ক অধিকাংশ মতামতই এখন নূতন নূতন গবেষণার ফলে অসার বলিয়া প্রমাণ হইয়া গিয়াছে, কিন্তু তাঁহার রচনাপ্রতিভা এখনও দেশের লোকের আদর্শ হইয়া আছে।"

শ্রীননীগোপাল মজুমদার।

তুফান

শ্রাবণ গগণ ঘন সমাকুল,
হু হু হু হু বায়ু ছুটে প্রতিকুল,
দরিয়ায় আজি তুফান ভুমুল,
উঠেছে উন্মত্ত উচ্ছ্বাস ঘোর।

উৎক্ষিপ্ত সফেণ তরঙ্গ বিপুল,
—গর্জ্জিয়া ছুটিয়া ভাঙ্গিতেছে কুল,
কিসের লাগিয়া পাথার অকুল
—এহেন তাণ্ডব নটনে ভোর?

এহেন অশান্ত উন্মাদ ভৈরব,—
কি বেগ উচ্ছ্বাসে ও নৃত্য তাণ্ডব,
কে নেছে কাড়িয়া কি গুপ্ত-বৈভব
ও অতল হ'তে করিয়া জোর?

প্রকৃতি জড় সে ছুটেছে রুষিয়া
কোটী ক্রুদ্ধ সর্প সমান ফুঁসিয়া
যেন সারা বিশ্ব ফেলিতে গ্রাসিয়া
করেছে বদন ব্যাদান ঘোর!

(হায়) কোথা সে সুকান্তি উজ্জ্বল নিলীমা,
বিপুল মহান্ হৃদয় গরিমা,
তরঙ্গে তরঙ্গে সে রঙ্গ ভঙ্গিমা
লিখিল হৃদয় মানস চোর!

শ্রীগিরীন্দ্রমোহিনী দাসী।

নিধু গুপ্ত

[২]

ছাপরা জীবন।

নিধুবাবু সঙ্গীতবিদ্যা শিখিবার জন্য শৈশবকাল হইতে যে সুযোগ ও অবসর খুঁজিতেছিলেন, যৌবনে ছাপরায় আসিয়া তাহা পাইলেন। সেখানে চাকরীতে ঢুকিয়া, দুই পয়সা হাতে পাইয়া শুধু স্বস্তি নহে— মনের মধ্যে তাঁহার বেশ একটু স্ফূর্ত্তিও আসিল। সেই সময়ে ভাগ্যক্রমে তাঁহার গান শিখাইবার লোকও জুটিয়া গেল। ছাপরায় তখন জনকতক বিখ্যাত কালোয়াৎ বাস করিতেন। নিধুবাবু তাঁহাদেরই একজনকে মাসিক কিছু দক্ষিণাস্বরূপ দিয়া নিজের জন্য সঙ্গীত-শিক্ষক নিযুক্ত করিলেন।

চাকরীর সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার সঙ্গীতচর্চ্চা চলিতে লাগিল। কেবল অনুরাগ নহে, এবিষয়ে স্বাভাবিক শক্তিও তাঁহার খুব বেশী ছিল। শুনা যায়, গানের যে সব কাজ-কায়দা গলায় আনিতে গায়ক-সাধারণের প্রায় মাসাবধি সময় লাগে, নিধু নাকি তাহা দুই-চারি দিনের মধ্যেই আয়ত্ত করিয়া ফেলিতেন। তাহা ছাড়া, পরিশ্রমেও তিনি বিমুখ ছিলেন না। অর্থ ও অবসর অকাতরে ব্যয় করিয়া গান শিখিতে লাগিলেন। ফলে, অল্পদিনের মধ্যেই সঙ্গীত-বিদ্যায় তাঁহার বেশ একরকম পারদর্শিতা জন্মিল।

তবে যেরূপ ভাবে গান শিখিবার শিক্ষানবিশী তিনি করিবেন ভাবিয়াছিলেন, তাহার সুবিধা হইল না। যে মুসলমান গায়ক তাঁহাকে গান শিখাইতেন, তিনি তেমন উদার হৃদয়ের মানুষ ছিলেন না। শুধু তাঁহাকেই বা দোষ দিই কেন?—তখনকার কোন মুসলমান-গায়কই পছন্দ করিতেন না যে, একজন বাঙ্গালী-গায়ক আসিয়া তাঁহাদের

সব বিদ্যা আত্মসাৎ করিয়া তাঁহাদেরই সমকক্ষ হইয়া উঠেন। নিধুর দ্রুত উন্নতি দেখিয়া তাঁহার ওস্তাদেরও সেই ভয় হইল, পাছে নিধু তাঁহার সমান ওস্তাদ হইয়া যান। সেই ভয়ে গানের পুঁজী বন্ধ করিয়া দিয়া তিনি নিধুকে পূর্ব্বে যাহা কিছু শিখাইয়াছিলেন, তাহারই চর্ব্বিত চর্ব্বণ করিতে লাগিলেন। নিধুর অবশ্য ইহা বুঝিতে বিলম্ব হইল না। তিনি ইহাতে ব্যথিত হইলেন—বিশেষ বিরক্তও হইলেন। গায়ককে একদিন ডাকিয়া এই বলিয়া বিদায় দিলেন যে,—'আমি আমার স্বদেশীয় ভাষায় গান রচিয়া তাহা গাইব—তোমাদের মুসলমানী গান আর শিখিব না।'

গুরুর হৃদয়-হীনতায় শিষ্যের হৃদয়ে আঘাত লাগিয়াছিল সত্য, কিন্তু সে আঘাতের ফল ভাল বৈ মন্দ হয় নাই। গিরিশচন্দ্র যেমন জনকয়েক লেখকের দুর্ব্ব্যবহারে বিরক্ত হইয়া সাহিত্য-সেবায় প্রবৃত্ত হন, এক্ষেত্রে নিধুরও অনেকটা তাহাই হইল। ওস্তাদের উপর রাগ করিয়া তিনি পশ্চিমের রাগ-রাগিনী তাল-মান অনুসারে বাঙ্গলা গান রচনা করিয়া গাইতে আরম্ভ করিয়া দিলেন। সেই গান যখন এদেশের রসজ্ঞ সমাজের কাণে পৌঁছিল, তখন তাহাতে মুগ্ধ না হইয়া কেহ থাকিতে পারিল না।

এরূপ মুগ্ধ হইবার বিলক্ষণ কারণও ছিল। তখনকার দিনে বাঙ্গলা গান গাইতে হইলে রামপ্রসাদের শ্যামা-সঙ্গীত এবং বৈষ্ণব কবিগণের বৈষ্ণব-পদাবলী ছাড়া অন্য গান বড় একটা পাওয়া যাইত না। দেওয়ানজী ও অন্যান্য ধনী-সৌখীন বাবুদের বৈঠকে বা মজলিসে পশ্চিমে খেয়াল ও টপ্পা গীত হইত বটে, কিন্তু তাহা শ্রবণেন্দ্রিয়কে সুখ দিতে পারিলেও মনকে তেমন তৃপ্তি দিতে পারিত না।—কাব্যের দিকটা উহার একেবারেই খালি থাকিয়া যাইত। এমন সময় পশ্চিমের খেয়াল ও সুরে রচিত নিধুর বাঙ্গলা গান শুনিয়া বাঙ্গালীর ভারী আনন্দ হইল। তাহা শুধু তাহাদের কাণের সঙ্গে নহে—মনের সঙ্গেও সম্পর্ক পাতাইল।

এই গানের প্রচার ও প্রসিদ্ধি লাভের পক্ষে আর একটা মস্ত সুবিধা ছিল এই যে, নিধুবাবু নিজেই গান রচনা করিতেন এবং নিজেই তাহা গাইতেন। তাঁহার গান যদি গীত না হইয়া কেবল ছাপার অক্ষরেই বাহির হইত, তাহা হইলে সে গানের তখন আদর হইত বলিয়া বিশ্বাস হয় না। কেননা, সাহিত্যে সে সময় কাহারও তেমন অনুরাগ ছিল না। গান-বাজনার উপরেই সকলের তখন সখ। সেই সখের সময় নিধুবাবু যেমনই নূতন সুরে নূতন ঢঙে গান ধরিলেন, অমনি সেই গান লইয়া এক মজলিস হইতে অন্য মজলিসে লোফালুফি চলিতে লাগিল।—সুরের সেই নূতনত্বটুকু বুঝাইবার জন্য দৃষ্টান্তস্বরূপ দুই তিনটি গানের আস্থায়ী এখানে উদ্ধৃত করিলাম।—

(১)

(সরি মিঞার টপ্পা—সিন্ধু খাম্বাজ)

ও মিঞা বে জানেওয়ালে (তামু)
আল্লা কি কসম ফিরিয়া নয়নুওয়ালে।...

বাঙ্গলা সঙ্গীতে এ সুর ছিল না। নিধুবাবুই ইহার অনুকরণে গান রচনা করিলেন,—

'যে যাতনা যতনে মনে মনে মন জানে
পাছে লোকে হাসে শুনে—লাজে প্রকাশ করিনে।...

(২)

(পশ্চিমে টপ্পা—খাম্বাজ)

দেখো রি এক বালা যোগী, মেরে
দুয়ারমে খাড়া হ্যায়।...

এ সুরও বাঙ্গলায় ছিল না। নিধুবাবু এই সুরে লিখিলেন,—

তোমারই তুলনা তুমি প্রাণ,
এ মহী মণ্ডলে।...

(৩)

(সরি মিঞার টপ্পা—বাঁরোয়া ;
এরি নাদান, গারি দে গেওয়ো ।...

এই সুরও নিধুবাবু তাঁহার বাঙ্গলা গানে আমদানী করিয়া গিয়াছেন। যথা—

'তবে প্রেমে কি সুখ হোতো ।......

এইরূপ সঙ্গীতচর্চ্চার সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার সঙ্গীত রচনার চর্চ্চাও চলিতে লাগিল। সেই সঙ্গীত শুনিয়া যে শুধু তখনকার বাঙ্গালী মজিয়াছিল তাহা নহে।—সুবিখ্যাত মুসলমান-গায়ক স্বর্গীয় রসুল বকস্ বলিতেন,—"বাঙ্গালা দেশে নিধুর টপ্পার তুলনা দেখিতে পাই না। আমি দুই-চারিটা ঐ টপ্পা সময়ে সময়ে গাইয়া থাকি। যেখানে সুরের যে পরিমাণে লয় থাকা উচিত, তাহা ঐসকল গান ছাড়া অন্য বাঙ্গলা গানে দেখি নাই।—গাইবার সময় 'সরির খেয়াল' কি বাঙ্গলা গান ঠিক করিতে পারি না।"—ইহা ছাড়া আরো শুনা যায় যে, রাজা রাজবল্লভের কালোয়াৎ আবব্রস্ খাঁ সাহেবও নিধুর গানের ভাবে ও সুরে অত্যন্ত মুগ্ধ ছিলেন। তিনি বলিতেন যে, একাধারে এমন গীত রচিবার এবং গীত গাইবার শক্তি দেখা যায় না। নিধু-বাবুর উপর ভগবানের অশেষ করুণা !

এইবার একটি বিশেষ কথা বলিবার আছে। কথা এই যে, নিধুর সময়টাকে এদেশের অনেক লেখকই সাহিত্য-সেবার বা সাহিত্য-সৃষ্টির পক্ষে অসময় বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। তাঁহাদের উক্তির যুক্তি এই যে, দেশের রাজনৈতিক-আকাশ যখন ঘনঘোর মেঘাচ্ছন্ন, সে সময়ে সাহিত্যের সৃষ্টি হইতেই পারে না। এই যুক্তির বলে তাঁহারা বাঙ্গালার প্রাচীন কাব্য-সাহিত্য এবং আধুনিক কাব্য-সাহিত্যের মাঝখানে নিধুর ও কবিওয়ালাদের যে গান, বাঙ্গালীর সেই গৌরবের ধন বিশাল সঙ্গীত-সাহিত্যকে সৌন্দর্য্যের নিকষে না

কষিয়া, তাহার প্রভাব প্রতিপত্তির কথা না ভাবিয়া, উপেক্ষার ফুৎকারে উড়াইয়া দিবার চেষ্টা করিতেছেন।

যতদূর মনে পড়ে, তাহাতে বলিতে পারি, ঐ যুক্তি এদেশে শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ই প্রথম আমদানী করিয়াছিলেন। ১২৮৭ সালের 'বঙ্গদর্শনে' তিনি লিখিয়াছেন,—"বাস্তবিক, তৎকালে ভারতবর্ষে সাহিত্য লোপ হইয়াছিল বলিলে অত্যুক্তি হয় না। অনেকে মনে করিতে পারেন বাঙ্গলা সাহিত্যের কথায় ভারতবর্ষের কথা কেন তুলিলেন? বাঙ্গালায় ত তখন সুশাসন সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, বাঙ্গালা ত তখন ভারতবর্ষের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা শান্তি-ভোগ করিতেছিল। এটি লোকের মহাভ্রম, ভারতবর্ষে এরূপ দারুণ গোলযোগ থাকিলে বাঙ্গালীর মনে শান্তি সম্ভবিতে পারে না; বিশেষ, বাঙ্গালা সমাজে তখনও শান্তি হয় নাই।"—কিন্তু কথাগুলা যেন কিছু গায়ের জোরে বলা হইয়াছে। কেন্‌না, ভারতবর্ষের ইতিহাস যাহা আমরা পড়িয়া থাকি, যাহার মধ্যে বাদ্‌শাহের সহিত নবাবদের, ও নবাবের সহিত বিদেশী বণিকদের, ও বণিকদের সহিত দেশী ষড়-যন্ত্রকারীদের খেলার অনেক সত্য মিথ্যা বিবরণ পাওয়া যায়, তাহা ত কৃষিজীবী বাঙ্গালীর বা বাঙ্গালা সমাজের ইতিহাস নহে। বিশেষতঃ তখনকার বাঙ্গালী ত এখনকার বাবু বাঙ্গালী বা রাজনীতিজ্ঞ বাঙ্গালী ছিল না। 'ভারত শুধুই ঘুমায়ে রয়' বলিলে তাহারা কিছুই বুঝিত না। তাহারা জানিত শুধু তাহাদের সমাজটিকে। সেই সঙ্গে তাহা-দের দেহে তখন বল ছিল, জঠরে অগ্নি ছিল, হৃদয়ে উল্লাস ছিল। অতি সামান্য আয় হইলেই তখন তাহাদের দুইবেলা দুইমুঠা পেটের অন্ন জুটিত। তখন একদিকে নিত্য বিপ্লব থাকিলেও—আবার অন্য দিকে দেবমন্দির ও মসজিদচূড়া মস্তক উত্তোলন করিত, জলদৈন্য দূর করিবার জন্য পুণ্য-প্রয়াসে দীর্ঘ দীর্ঘিকা খনিত হইত। অতএব সে সময়ে সঙ্গীত-চর্চ্চা বা সাহিত্য-সেবা না করিবার হেতু দেখিতে পাই না। আরও একটা মোটা কথা পড়িয়া রহিয়াছে যে, বাঙ্গালী

যদি তখন ধন-প্রাণ লইয়াই ব্যস্ত ছিল, তবে কবির দল পুষ্ট হইল কি প্রকারে?—তাহাদের গান শুনিল কে? প্রাণের ভয়, পেটের জ্বালা থাকিলে কি প্রণয়-সঙ্গীত বাহির হইতে পারে? আমরা এখন কোটি-অভাব-বিজড়িত নাগ-পাশে বদ্ধ দুর্ব্বল জীব! এখন আমাদের কাপড় জামার ভাবনা, দুইমুঠা অন্নের ভাবনা,—অতৃপ্তির ও অশান্তির তুষানল-জ্বালায় ধিকি ধিকি জ্বলিতেছি—পুড়িতেছি। এই ভীষণ ভাবনার মাঝখানে থাকিয়াও যদি আমরা সাহিত্য-সেবা, সাহিত্য-সৃষ্টি করিতে পারি, তবে তখন—যখন বাঙ্গালার সমাজ-শরীর সজীব ছিল, যখন টাকাই সার বুঝিয়া, টাকার মাপকাটিতে এদেশের মনুষ্যত্ব পাণ্ডিত্য প্রভৃতি সর্ব্বস্ব মাপা হইত না, যখন বাঙ্গালা-সমাজের সর্ব্বত্রই ভালবাসার আদান-প্রদান ছিল—কেহ কাহাকেও চাপিয়া-ঠাসিয়া চূর্ণ করিতে চাহিত না,—তখন সাহিত্য-সৃষ্টি কেন না হইবে? সমাজই এদেশের মর্ম্মস্থান। সেই সমাজের সহিত বিদেশী রাজার তখন কোন সম্বন্ধই ছিল না। কাজেই রাজায় রাজায় যুদ্ধ হইলেও এদেশের মর্ম্মস্থানে তখন কোন আঘাত লাগিত না। আঘাত লাগিত না বলিয়াই নিধু তখন নিঃশঙ্কচিত্তে গলা ছাড়িয়া বাঙ্গালীকে গান শুনাইয়া যাইতে পারিয়াছিলেন। কবির দলও তাই তখন পুষ্ট হইবার পক্ষে কোনও ব্যাঘাত পায় নাই। সে সকল গান শুনিলেই বুঝা যায়, তাহা 'বঙ্গীয় সমাজের কোমল প্রকৃতি, নিশ্চেষ্টতা এবং গৃহ-সুখ-নিরতির ফল'। অশান্তির সময় সে সঙ্গীত কিছুতেই রচিত হইতে পারে না।

বঙ্কিম বলেন,—'কাব্য-বৈচিত্র্যের তিনটি কারণ—জাতীয়তা, সামরিকতা এবং স্বাতন্ত্র্য। অর্থাৎ যিনি কবিতা লিখেন, তিনি, জাতীয় চরিত্রের অধীন; সামাজিক বলের অধীন; এবং আত্ম-স্বভাবের অধীন। তিনটিই তাঁহার কাব্যে ব্যক্ত হইবে।'—নিধুর সময়ে বাঙ্গালীর চরিত্র ও সামাজিক বল কিরূপ ছিল, বলিয়াছি। এবার তাঁহার স্বভাবের কথা বলিব।

তাঁহার স্বভাব সম্বন্ধে স্বর্গীয় কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত মহাশয় লিখিয়া গিয়াছেন,—"নিধুবাবু সহজেই সন্তোষচিত্ত ছিলেন, প্রায় কেহই তাঁহাকে বিষণ্ণ বা বিমর্ষ অথবা উৎকণ্ঠিত দেখিতে পান নাই, সর্ব্বদাই হাস্যপূর্ব্বক আমোদ প্রমোদে কালক্ষয় করিতেন। উপকার ধর্ম্মকেই পরম ধর্ম্ম মনে করিয়া সাধ্যানুসারে পরোপকারে ত্রুটি করিতেন না, দায়গ্রস্ত ব্যক্তি নিকটস্থ হইলেই যথাসম্ভব দান দ্বারা তাহাকে তুষ্ট করিতেন।"—কথাগুলি অতিভক্তের অতিরঞ্জন বা উচ্ছ্বাসের অত্যুক্তি নহে। নিধুর জীবন-বৃত্তান্ত বিশ্লেষণ করিয়াই ঐ অভিমত সঙ্কলিত হইয়াছে। আমরা তাঁহার জীবন-ঘটনা যতটুকু জানি, তাহা একে একে বিবৃত করিতেছি। তাহা পড়িলে পাঠকগণও বুঝিতে পারিবেন যে, নিধু এখনকার কবিদের মতন শুধু কবিতা লিখিবার সময় কবি হইতেন না,—জীবনেও তিনি বিলক্ষণ কবি ছিলেন।

স্বামী বিবেকানন্দের এক কবিতার একস্থানে আছে,—'যত উচ্চ তোমার হৃদয়, তত দুঃখ জানিহ নিশ্চয়।' কথাটা একহিসাবে সত্য। ধন, মান, সম্পদ—এজগতে যেসকলকে সুখ বলে, তাহা হৃদয়ের গুনে প্রায়ই অর্জ্জন করা যায় না। যে হৃদয় পরের কাজেই নিজেকে বিলাইয়া দেয়, সে নিজের ভাবনা ভাবিবে কখন? তাই জীবন-যুদ্ধে তাহাকে প্রায় পরের পিছনেই পড়িয়া থাকিতে দেখা যায়। নিধুরও অদৃষ্টে তাহাই ঘটিয়াছিল। চাকরীতে তিনি কোন উন্নতিই করিতে পারেন নাই। দেওয়ান্ রামতনু পালিত সহসা যখন বিষম বায়ুরোগগ্রস্ত হইয়া কর্ম্মের অযোগ্য হইয়া পড়েন, তখন সেই পদ-লাভের সম্ভাবনা নিধুবাবুরই হইয়াছিল। কারণ, তিনি যেমন বুদ্ধিমান, তেমনি কাজের লোক ছিলেন। তাহা ছাড়া, রামতনুবাবুর সহকারীর কাজও তিনি করিতেন। কিন্তু এমন সময় এই আফিসেরই জগন্মোহন মুখোপাধ্যায় নামে আর একজন কর্ম্মচারী আসিয়া তাঁহাকে ধরিয়া পড়িলেন। বলিলেন,—'এ চাকুরী যদি আমাকে না দিয়া আপনি গ্রহণ করেন, তাহা হইলে ব্রহ্মহত্যা করিবেন।'—জনাইয়ের

মুখোপাধ্যায়-বংশে এই জগন্মোহন বাবুর জন্ম। নিধুবাবু ইঁহাকে অত্যন্ত ভালবাসিতেন। ইঁহার কথায় তিনি কিছুমাত্র বিচলিত না হইয়া সহজভাবেই বলিলেন,—'কি করিলে এ চাকরী আপনার হয় বলুন?' জগন্মোহন বাবু বলিলেন,—'আপনি নিজের জন্য সাহেবকে কিছুত বলিতেই পারিবেন না। তা'ছাড়া আমি যাহাতে ঐ চাকুরী পাই, সেজন্য আপনাকে সাহায্য করিতে হইবে।'—তাহাই হইল। নিধু-বাবুর চেষ্টায় জগন্মোহন বাবু দেওয়ান হইলেন। নিধুবাবু সন্তুষ্ট-চিত্তে পূর্ব্বকাজ করিতে লাগিলেন।

তবে এ দাস্যবৃত্তি তাঁহাকে বেশী দিন পর্য্যন্ত করিতে হয় নাই যে মনের গুণে তিনি দেওয়ানী পদের মায়া ত্যাগ করিয়াছিলেন, সেই মনের বলেই তাঁহাকে চাকরীও ছাড়িতে হইয়াছিল। অফিসে সে সময় ঘুষ লওয়ার খুব প্রচলন ছিল। সকলেই ঘুষ লইতেন—কেবল নিধুবাবু লইতেন না। পাছে একথা নিধুবাবুর মুখ দিয়া বাহির হইয়া পড়ে, এই ভয়ে সকলে মিলিয়া তাঁহাকে ঘুষ লইতে অনুরোধ করেন—দলে টানিতে চেষ্টা করেন। কিন্তু নিধুবাবু তাহাতে ক্ষুব্ধ হন। কাহাকেও কিছু না বলিয়া একদিন অফিসের সাহেবের নিকট যাইয়া চাকরীতে একেবারে জবাব দেন। ইহাতে তাঁহার বন্ধু দেওয়ান জগন্মোহন বাবুর বিশেষ দুঃখ হয়। তিনি নিধুবাবুকে বলেন,—'আপনি যদি একান্তই চাকরী না করেন, তা'হলে দশ হাজার টাকা আপনাকে দিতেছি। আপনি তাহাই লইয়া দেশে ফিরিয়া যান।'—নিধুবাবু বন্ধুপ্রদত্ত অর্থ আনন্দে গ্রহণ করিলেন। যে দিন তাঁহার কলিকাতায় আসিবার কথা, সেইদিন দেওয়ান জগ-ন্মোহন বাবু তাঁহার বাসায় আসিয়া তাঁহার হাত দুইখানি ধরিয়া বলিয়া গেলেন,—"আপনি যাইতেছেন বটে, কিন্তু আমাদের একে-বারে ভুলিবেন না। প্রতি বৎসর সরস্বতী পূজার সময় একবার করিয়া আপনাকে এখানে আসিতে হইবে। আমার রচিত বাগ্-দেবীর বন্দনাটি গাইতে হইবে। নইলে বিশেষ দুঃখিত হইব।"—

সুখের বিষয়, বন্ধুর এ অনুরোধ উপেক্ষিত হয় নাই। প্রতি বৎসরেই নিধুবাবু ছাপরায় যাইতেন। সরস্বতী পূজার দিন বন্ধুর রচিত গানটি গাহিতেন। সে গানটি এই :—

জয় জয় বাগ্‌বাণী নিখিল প্রদায়িণী।
পদমধ্যে মুখাম্ভোজ, বক্ষে কর সরসিজ, পঞ্চাসতো বর্ণময় মানি ॥
সদা-সরসিজোদ্ভব, সরোজাক্ষ সদাশিব প্রভৃতি অমরবন্দিনী।
অক্ষ গুণ আর বিদ্যা, অমৃত ফল সমুদ্রা, দেহি পদ চতুষ্টয় পালি ॥১॥
সদাপীনোন্নতস্তনি, ঈষদাভা ত্রিনয়নি, সর্ব্ব ইন্দু শিরে ধারিনি।
জগন্মোহন দীনে, আশ্রয় স্বকীয় গুণে,
দেহি পদ অম্বুজে ভবানি ॥২॥

গানটি অবশ্য সুরচিত নহে। ঈশ্বর গুপ্ত উহা সংগ্রহ করিতে পারেন নাই, লিখিয়াছিলেন। পাঠকবর্গের কৌতুহল চরিতার্থের জন্য আমরা উহা সংগ্রহ করিয়া দিলাম।

আর একটি কথা বলিলেই নিধুবাবুর ছাপরা জীবনের কথা বলা শেষ হয়। সেটি অবশ্য তাঁহার কর্ম্ম জীবনের নহে—তাঁহার ধর্ম্ম-জীবনের কথা। অল্পবয়স হইতেই তিনি অত্যন্ত ধর্ম্মানুরাগী ছিলেন। ঈশ্বরে তাঁহার অনন্ত বিশ্বাস ছিল। কোথাও ভাল সন্ন্যাসী বা ফকির আসিয়াছে শুনিলেই তিনি তদ্দর্শনে ছুটিতেন। ছাপরা অবস্থিতি কালে তিনি প্রায় প্রতি সপ্তাহে ছাপরা জেলার অন্তর্গত রতনপুরা গ্রামে যাইয়া 'ভিখন্‌রাম' স্বামিজীকে দেখিয়া আসিতেন। ভিখন্‌রাম দক্ষিণাচারী ছিলেন। সকলেই তাঁহাকে সিদ্ধপুরুষ বলিত। নিধুবাবু এই স্বামিজীর নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেন। স্বমিজী তাঁহাকে অত্যন্ত স্নেহ করিতেন। "তুমি সুখী ও যশস্বী হও" বলিয়া তাঁহাকে তিনি আশীর্ব্বাদ করিয়াছিলেন।

নিধুবাবুর জীবন-নাট্যের প্রথম ও এক প্রধান অঙ্ক শেষ হইল। আগামী বারে তাঁহার বাকী জীবনের কথা, অর্থাৎ কলিকাতায় তিনি কেমন ভাবে জীবন কাটাইয়াছিলেন, তাহাই বিবৃত করিব।

শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ রায়।

শিবরূপ

১

রজতের গিরি-নিভ—
শুভ্র কলেবর শিব,
ভালে চারু চন্দ্রলেখা,—রতন-উজ্জ্বল—
অঙ্গে অঙ্গে কিবা দ্যুতি,
সুর-নর করে স্তুতি,
পঞ্চ মুখে পঞ্চ তত্ত্ব,—ওঙ্কার মঙ্গল !
নিষ্ঠুরতা করুনার
কে দেখিবে সমাহার,
নৃশংস পরশু করে, নেত্রে কালানল,
বরাভয় হস্তে মৃগ, করুণা-বিহ্বল।

২

নীল কণ্ঠে যায় দেখা—
সিন্ধুর সুনাম লেখা,
তাহার বিষাণ গর্জ্জ,—ভৈরব হুঙ্কার ;
অমঙ্গল-আশীবিষ
সে ত না উগরে বিষ,
প্রকোষ্ঠে জড়ান তাই, তারি কণ্ঠহার !
সদসৎ লীলা তাঁরি,
লীলায় শ্মশান-চারী,
ব্যাঘ্র-কৃত্তি-কটি-বাস,—অঙ্গে ভস্ম ভার ;
ত্যাগের মহিমা মূর্ত্তি,—ত্যাগ-অবতার।

৩

সেই ত্যাগ-অঙ্কে কিবা
ভস্ম কাম—শোভে শিবা,
হরগৌরী অভেদাঙ্গ—অভেদ মিলন;
ত্যাগ-ভোগ এক-ঠাঁই,
বিশ্বের বিভূতি তাই,
বিশ্ব সে শিবের রূপ—তারি প্রকটন;
শোক, তাপ, মৃত্যু, জরা
মঙ্গলের রূপ-ধরা—
বুঝিবে মানব কবে,—দেখিবে কখন,—
বিশ্বের মঙ্গল মূর্ত্তি মেলিয়া নয়ন।

শ্রীগিরিজানাথ মুখোপাধ্যায়।

মধুস্মৃতি ও সুভদ্রা হরণ

'ভারতবর্ষে'র মধুস্মৃতি পাঠ করিয়া আমারও মধুস্মৃতি জাগিয়া উঠিয়াছে। শ্রীমধুসূদনকে যদি দেখিয়া থাকি ত বাল্যেই দেখিয়াছি; সে কথা মনে নাই। আমার পিতৃদেবের সহিত তাঁহার সৌহার্দ্দ্য ছিল, সময়ে সময়ে তাঁহার মুখে মধুপ্রসঙ্গ প্রায়ই শুনিতাম, শুনিতে বড় ভাল লাগিত। মধুসূদনের সহিত প্রথম পরিচয় যেমন অনেকেরই হইয়াছে অর্থাৎ তাঁহার কাব্য নিচয়ের মধ্য দিয়া, আমারও তাই। যে দিন পিতৃদেব হাসিতে হাসিতে 'মেঘনাদবধ' হাতে দিয়া বলিলেন, 'দেখ্ দেখি কেমন বই। পড়্তে পারবি বুঝ্তে পারবি ত?' মনে

আছে, পুস্তকখানি হাতে লইয়া ক্রমাগতই পাতা উল্টাইয়া যাইতে লাগিলাম, দেখিয়া পিতা হাসিয়া বলিলেন—'তবেই হয়েছে'। আমি বলিলাম, "দাঁড়াও না বাবা, আগে দেখি।" দেখিতে দেখিতে দেখিলাম, "ছিনু মোরা কত সুখে পঞ্চবটীবনে"; দেখিলাম "বাহিরায় যবে নদী সিন্ধুর উদ্দেশে"; দেখিলাম, "দানবনন্দিনী আমি রক্ষকুল-বধূ, আমি কি ডরাই সখি ভিখারী রাঘবে।" শেষে দেখিলাম "বিসর্জ্জি প্রতিমা যেন দশমী দিবসে সপ্ত দিবানিশি লঙ্কা কাঁদিলা বিষাদে।" তখন স্থির হইয়া গেল, বইখানি ভাল করে পড়তে হবে। কারণ মিলনান্ত পুস্তক আমার ভাল লাগে না। তারপর ক্রমে ক্রমে মধুর সমুদ্রে নিমজ্জিত হয়ে গেলেম। যখন মধুর মধুর বংশীধ্বনি 'ব্রজাঙ্গনা'কে আহ্বান করলে তখন মনে হলো জগত বুঝি মধুময় হইয়াছে,—"মুছিয়া নয়ন জল চ'লো সই চল্ চল্, শুনিব তমাল তলে বেণুর সুরব, আসিল বসন্ত যদি আসিবে মাধব।"

তারপর, যখন আমি সূতিকা গৃহে, আমার নবজাত শিশুর কনক-কমলোপম আস্তে বিদ্যুদ্বিকাশের মত হাস্য রেখা দেখিতে দেখিতে জগৎ বিস্মৃত হইতেছিলাম, সে আজ বহুবর্ষের কথা; তার পর যুগের পর যুগ চলিয়া গিয়াছে; সে আনন্দবিন্দু, আজ বিষাদসিন্ধুতে পরিণত হইয়াছে! সে মাধুরী হাসি আজ আর জাগতিক কোন পদার্থেই দেখিতে পাই না! এমন সময়ে জড়-বার্ত্তাবহ সংবাদপত্র, ভীষণ বজ্রাঘাত তুল্য 'মধু'র অবসান জ্ঞাপন করিল—কাগজখানি হস্তেই ছিল—ধারার পর ধারা বহিয়া উপাধান সিক্ত হইতে লাগিল, দেখিয়া ধাত্রীদ্বয় ভীতচিত্তে জিজ্ঞাসা করিল, "কি মা,—কি হয়েছে, কাঁচা পোয়াতি, অমন করে কাঁদচেন কেন?" বলিলাম, কিছু না। কিন্তু কেন জানিনা সে অশ্রু নিবারণ হওয়া দূরে থাক্, আরও প্রবল বেগে বহিতে লাগিল; বাহুতে মুখাবরণ করিয়া ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতে লাগিলাম। তখন আমার বয়স ষোড়শ বৎসর। শুশ্রূষা-কারিণীরা মনে করিয়াছিল কোনও আত্মীয়বিয়োগ হইয়াছে—কান্না

থামানো উচিত। অতএব আমার শ্বশ্রূঠাকুরাণীকে সম্বাদ দিবার জন্য উঠিল। তখন আমার চমক ভাঙ্গিল; বলিলাম—বসো, কিছু বল্‌তে হবে না। পরে মুখ চোখ মুছিয়া একটু স্থির হইলে তাহারা জিজ্ঞাসা করিল, "হাঁ, মা, কি হয়েছে বলনা, কাগজে কি লেখা আছে?" বলিলাম সে তোমরা বুঝ্‌তে পারবে না। তাদের আগ্রহ বাড়িয়া উঠিল, ছাড়িল না। তখন বলিলাম, রামায়ণ শুনেছিস্‌? উত্তর—"হাঁ"। ইনি তেমনই একজন, অনেক ভাল ভাল পুঁথী লিখেছেন, খুব বিদ্বান ছিলেন, বড়লোকের ছেলে ছিলেন, এখন বড় কষ্টে হাঁসপাতালে মারা গিয়েছেন। বলিতে বলিতে আবার অশ্রু প্রবাহ ছুটিয়া আসিল, আত্মসম্বরণ করিতে পারিলাম না। তারা জিজ্ঞাসা করিল, 'ইনি কি তোমার আপন কেউ'? কি বলিব? বলিলাম —'না'। বোধ হয় বিশ্বাস করিল না। হায়! সে অশ্রু এখন কোথায়? পাষাণের মধ্যেও নির্ঝর প্রবাহিত হয়? মরুভূমেও ওয়েসিস্ আছে! এখন এ কি? নিজেকে দেখিয়া নিজেই চমকিত হই, কোথা হ'তে এ অচল অটল নীরস গম্ভীর নির্ব্বিকার কে এ আমার সেই আমিকে সরাইয়া তাহার স্থান অধিকার করিয়া বসিয়াছে। এ যে কাটিলেও শোণিত নাই, কুটীলেও মাংস নাই! কে এ? এ-প্রেত মূর্ত্তি কার? যে আমি, কৈশোরে সঙ্গিণীর বৈধব্য সমাগত দেখিয়া প্রার্থনা করিয়াছিলাম—ভগবান্! ওর এ কষ্ট সহ্য কর্ত্তে পারবো না, ওকে এ কষ্ট দিও না, তার চেয়ে বুঝি নিজের হলে সহ্য হবে, সে আমি কই? এ কে নীরস নির্ম্মম নিষ্ঠুর আমার মধ্যে দাঁড়াইয়া ঈষদ্ধাস্যে জগৎকে কৌতুক দৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করিতেছে। আমি ইহাকে ত কখন চাহিয়াছি বলিয়া মনে হয় না। তোমরা কিছু মনে করিও না,—বার্দ্ধক্যের ধর্ম্মই বুঝি এইরূপ, নহিলে প্রসঙ্গান্তরে আসিয়া পড়িব কেন।—যাক্, তার পর, দাইরা নাছোড়বান্দা, ছাড়িল না, বলিল 'মা, দয়া করে আমাদের ওনার রামায়ণ পড়ে বুঝিয়ে দিতে হবে।' বিষম সমস্যা,—গাঁতুড়ে কাঁদের মেঘনাদ বুঝাইতে হইবে। তখন

তাহাদের বিষম আগ্রহ দেখিয়া মেঘনাদ হইতে মধুর মধুর সমগ্র পদাবলী ছত্রে ছত্রে তাহাদিগকে বুঝাইতে নিযুক্ত হইলাম, তাহারা নির্ব্বাক্ নিস্পন্দ হইয়া চিত্রপুত্তলিকা তুল্য মুখের দিকে চাহিয়া থাকিত। এমন কি তারা যেন ক্ষুধা-তৃষ্ণাও ভুলিয়া গিয়াছিল, মেঘনাদ যখন শেষ হইল তখন তাহারা অঞ্চল দিয়া চক্ষু মুছিতে লাগিল। প্রমীলার যুদ্ধ, চিতারোহণাদি সমস্ত সত্য ঘটনা বলিয়া বিশ্বাস করিল, বলিল—"মা, কথকের মুখে রামায়ণ, মহাভারত কত শুনেছি, কিন্তু এমন কথা কখনো শুনিনি"!

এই গ্রন্থাবলী পাঠ কালে একদা চতুর্দ্দশপদী কবিতাবলীতে পাঠ করিলাম,—

"তোমার হরণ গীত গাব বঙ্গাসরে,
নবতানে, ভেবেছিনু সুভদ্রা সুন্দরী,
কিন্তু ভাগ্যদোষে শুভে আশার লহরী
শুকাইল—গ্রীষ্মে যথা জলরাশি সরে,"

পরে,—

"কোনও ভাগ্যবান কবি, পূজি দ্বৈপায়নে,
"লভিবে সুযশ সাঙ্গি এ সঙ্গীত ব্রতে"।

—জানিনা কেন, এই কয়ছত্র পাঠ করিয়া আমার মধ্যে যেন বিদ্যুৎ প্রবাহিত হইতে লাগিল—মনে হইতে লাগিল—আচ্ছা আমি কি সুভদ্রা হরণ ঐখান থেকে লিখে শেষ করতে পারবো না? মনের ভিতর হইতে উত্তর আসিল, নিশ্চয় পারবে। কে যেন ঐ কথা বারম্বার বলিতে লাগিল।

তারপর সূতিকা-গৃহ হইতে উঠিবার বিশ পঁচিশ দিন পরে আমার উপর আত্মার আবেশ হইতে আরম্ভ হইল, আমাদের বহু জনাকীর্ণ একান্নবর্ত্তী সকলেই দেখিল, দেখিয়া স্তম্ভিত হইল; টেবিলের উপর খাতা পেন্সিল রক্ষিত হইল, উক্তাবস্থায় লেখা বাহির হইল,—

"আর কি তা আছে, যেদিন প্রাণেশ মুগ্ধ
অহল্যা রূপেতে সে ত সেদিন গিয়াছে।
সহস্রলোচন হায় তবু অন্ধ আঁখি
হায় নাথ তবু অন্ধ আঁখি কামমোহে,
আমি হেয়ঃ হায় নাথ মানবীর কাছে,
তোমার ত্রিদশ ঈশ্বরী তব ভার্য্যা,
পুলোমনন্দিনী রূপে জগৎ দুর্লভা।"

উক্ত অবস্থান্তে সকলে লেখা লইয়া চতুর্দ্দশপদী কবিতাবলীর সহিত মিলাইয়া দেখিলেন, যে স্থান হইতে দেড় না দুই পৃষ্ঠা লিখিয়া শেষ হইয়াছে, সেই স্থানের পর হইতেই লেখারম্ভ হইয়াছে, তাহার পর হইতে কখন কখন উক্তাবস্থায় লেখা হইয়াছে, কখন বা সহজ অবস্থায় লেখা হইত; কিন্তু আশ্চর্য্য এই যে, এত তাড়াতাড়ি মনে আসিত যে লিখিয়া উঠিতে পারিতাম না। প্রায় এক সর্গ লেখার পর হঠাৎ একদিন মনে হইল, মধুসূদন সরস্বতী-বন্দনা করিয়া আরম্ভ করিয়াছেন, আমার যে এতটা লেখা হইল, আমার ত বাণী-বন্দনা করা হয় নাই। আশ্চর্য্য এই যে, ইহা মনে উদিত হইবামাত্রই কোন মুখস্থ কবিতা মনে আসার ন্যায় এই সরস্বতী-বন্দনাটি তৎক্ষণাৎ লিখিত হইয়াছিল :—

আমিও জননী ধরি ওপঙ্কজ-পদ
কামদ সদা প্রার্থী রে, সাধপূর্ণ মনে,
মধু বরিষণে মধু, মোহিলা সকল
মহিলা মানবে, গাইব তাঁহার সনে
হাসিবে সবাই কোকিলের সহ হেয়ঃ
বায়সের গীত, কিন্তু কে নিবারিবে মনঃকরী
মত্ত অতি যবে, ডাঙ্গশ অঙ্কুশ বৃথা;
কহিনু তোমারে, দাও মা কবিতা হার!

পরিব আদরে গলে ভাবে কল্পনার
সিঁথী সুধাময়, গাঁথি পরিব যতনে
সিন্দুর-বিন্দুর সনে; রমণী ললাটে
কিনা সাজে, সাজাইলে তুমি।

বলা আবশ্যক, ইহার পূর্ব্বে আমি বোধ হয় অমিত্রাক্ষর ছন্দে লিখি নাই। যাহা হউক, সমগ্র সুভদ্রাহরণ গ্রন্থখানি ২০।২২ দিনের মধ্যে শেষ হইয়াছিল, সপ্তম স্বর্গে সমাপ্ত। এখনও হয় ত খুঁজিলে জীর্ণাবস্থায় পাওয়া যায়। ইহা লিখিবার কত পরে অর্থাৎ আমার ২৭।২৮ বৎসর বয়সের সময় বোধ হয় 'অশ্রুকণা' বাহির হইয়াছে। তাহার পর অন্যান্য গ্রন্থও বাহির হইয়াছে। কিন্তু জানি না এ পর্য্যন্ত 'সুভদ্রা হরণ' কেন বাহির হয় নাই। নারায়ণের কৃপা হইলে সকলই সম্ভব হয়। দেখা যাউক, বাণীর ইচ্ছায় নারায়ণের কৃপা কি আকার ধারণ করে।

শ্রীগিরীন্দ্রমোহিনী দাসী।

অন্বেষণে

ওরে তাহারে খুঁজিতে যাস্ কোন্ ভিতে
উন্মত্ত সমান ধাও—
এই হৃদয়-মন্দির মাঝারে দাঁড়ায়ে
নিরখিতে ক্ষণ চাও!
সে যে রস অনুভূতি, বিহীন মুরতি!
পাগল করিবে তোরে,
যেন, কুসুমের বাস হৃদয় উল্লাস
জনমান্ধ জনে করে!

ওরে, যদি না আসে দুঃসহ, আকুল বিরহ
তবে মিলন বুঝিবে কেবা ?
যেন প্রসূতি বেদনা মায়েরে বুঝায় !
—স্নেহের স্বরূপ কিবা।
সেযে আনন্দ-কন্দরে আনন্দ-নির্ঝর
—অফুরন্ত মাধুরী-কায়া !
সদা আস্বাদে সে রস প্রেমিক পরাণে
আন জনে খুঁজে সারা।

শ্রীগিরীন্দ্রমোহিনী দাসী।

"তত্ত্বচিত গৌরচন্দ্র"

[৩]

[আষাঢ়ের নারায়ণের ৭৮৫ পৃষ্ঠার অনুবৃত্তি]

"তত্ত্বচিত গৌরচন্দ্র"-শীর্ষক প্রথম প্রবন্ধে দেখিয়াছি যে শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর লীলাকে রাধাকৃষ্ণলীলার অনুবাদরূপে গ্রহণ করিলেই কেবল এ সকল "গৌরচন্দ্রের" একটা সত্য ও সঙ্গত অর্থবোধ সম্ভব হয়। পরে, দ্বিতীয় প্রবন্ধে দেখিয়াছি, গৌরাঙ্গলীলা আপনিই বিশ্বের স্বরূপ, অনুবাদ ব্যতিরেকে ইহার মর্ম্ম উদ্ঘাটন করাও অসাধ্য। এই অনুবাদ পাইব কোথায় ?

মহাপ্রভু ত প্রত্যক্ষতঃ একই পুরুষ ছিলেন। তাঁর এক দেহ, এক প্রস্ত ইন্দ্রিয়, এক মন, এক বুদ্ধি, এক আত্মা ছিল। আমরা নিজেরা যেমন এক, তিনিও সেইরূপই ছিলেন। অথচ দুই না

হইলে ত লীলা হয় না। এ সমস্তার মীমাংসা কোথায়? বরঞ্চ আমাদের নিজেদের প্রাকৃত প্রণয়ের অভিজ্ঞতার দ্বারা দ্বৈতাশ্রিত রাধাকৃষ্ণলীলার মর্ম্ম একটু আধটু বুঝিতেও বা পারি। কিন্তু মহাপ্রভুর প্রত্যক্ষ দ্বৈতাশ্রয়শূন্য এই অদ্ভুত প্রেমলীলার রহস্য ভেদ করিব কিসে?

আমাদের মধ্যে যে একত্বের মধ্যেই দ্বৈতত্ব বা দ্বৈত আছে, আমরা এক হইয়াও যে বস্তুতঃ দুই, আমাদের নিজেদের ভিতরেই যে জ্ঞাতা-জ্ঞেয়, ভোক্তা-ভোগ্য, কর্ত্তা-কর্ম্ম প্রভৃতি সম্বন্ধের প্রতিষ্ঠা হইয়া, আমাদের জ্ঞান, ভোগ ও কর্ম্মকে সম্ভব ও সফল করিতেছে— এইটি ত অপরোক্ষ-অনুভবের কথা। আর এই অপরোক্ষ-অনুভবকে আশ্রয় করিয়াই, মহাপ্রভুর অপূর্ব্ব লীলাতত্ত্বটির নিগূঢ় মর্ম্ম উদ্ঘাটন করিতে হয়। ইহার আর অন্য উপায় নাই।

প্রাচীন শ্রুতি—দ্বাসুপর্ণা সযুজা সখায়া সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে।
তয়োরন্যঃ পিপ্পলং স্বাদবত্ত্যনশ্নন্নন্যোঽভিচাকশীতি॥

এই ঋকে এই নিগূঢ় তত্ত্বটিই প্রকাশিত করিয়াছেন। এই শ্রুতির অর্থ এই যে—

দুই পরস্পর-সংযুক্ত, সখ্যভাবাপন্ন পাখী এক বৃক্ষ আশ্রয় করিয়া আছেন। তাঁহাদের মধ্যে একজন মিষ্ট ফল ভক্ষণ করেন, আর একজন অনশন থাকিয়া কেবল দর্শন করেন।

এই দুই পাখী কারা? এক সময় ভাবিয়াছিলাম, ইহাদের একটি ঈশ্বর আর একটি আমরা। একটি পরমাত্মা আর অপরটি জীবাত্মা। কিন্তু এই আমরা বলিতে কি বুঝিব? এখন আমি বা আমরা বলিতে যাহা বুঝি, তাহাকে এই যুগল পক্ষীর একটি বলিয়া ধরিয়া লইলে ত শ্রুতির অর্থ হয় না। আমির বা আমার সম্বন্ধে ত সযুজা, সখায়া প্রভৃতি বিশেষণ খাটে না। এই আমি যে পরমেশ্বরের সঙ্গে নিত্য-যুক্ত হইয়া আছি, এমন ত জানি না, বুঝি না। এই আমির সঙ্গে তাঁর এই সখ্যও ত সিদ্ধ নহে। সযুজা সখায়া—নিত্যযুক্ত ও

নিত্য-সখ্য অবস্থা জ্ঞানগম্য না হইলে সত্য হয় না। এই যোগের ও সখ্যের জ্ঞানলাভ আবশ্যক। আমার ত এজ্ঞান নাই। অতএব এই যোগ ও ভক্তি আমার সাধ্য হইতে পারে কিন্তু সিদ্ধ হয় নাই। আর যতদিন না এই সিদ্ধিলাভ হইয়াছে, অর্থাৎ যতদিন না আমি জ্ঞানতঃ তাঁর সঙ্গে নিত্যযুক্ত ও নিত্যসখ্যবদ্ধ হইয়াছি, ততদিন আমার এই আমিকে এই শ্রুতিবর্ণিত দুই পাখীর একটি বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি না। অতএব দেখিতেছি যে এই আমি এই পাখী নয়। তবে এই পাখী কে?

সে'ও আমি বটে, কিন্তু আমার অহঙ্কারতত্ত্ব পর্য্যন্ত যে-আমির প্রসার, এই আমি সে আমির উপরে। এই আমি আমার দেহ নহে, আমার ইন্দ্রিয় নহে, আমার মন নহে, আমার বুদ্ধি নহে, আমার অহঙ্কার নহে। কিন্তু যে পরম-চৈতন্যের বা সাক্ষীচৈতন্যের উপরে আমার এসকলের প্রতিষ্ঠা, যাহার জ্ঞানে আমি জ্ঞানী, চৈতন্যে আমি সচেতন, প্রেমে আমি প্রেমিক,—যাহার শক্তিতে আমি কর্ত্তা সাজিয়া বেড়াই, সেই আমিই এই নিত্যবস্তু। তাহাই শ্রুতি-বর্ণিত দুই পাখীর প্রথম পাখী।

অতএব আপাততঃ এই দেহ হইতে আরম্ভ করিয়া ঐ গভীর-তম সাক্ষীচৈতন্য পর্য্যন্ত এই যে জটিল যৌগিক বস্তুকে আমি "আমি, আমি" বলি, তাহা এক নয়, দুইও নয়, কিন্তু তিন। ইংরাজিতে বলিতে গেলে বলিতে হয়, এই আমি unity'ও নয়, duality'ও নয়, কিন্তু একটি অপূর্ব্ব trinity,—ইহাই সত্য ত্রিত্ববাদ।

আমার মধ্যে ব্রহ্ম আছেন, সত্য কথা। আমিই ব্রহ্ম, ইহাও একেবারে মিথ্যা নহে। কিন্তু "তত্ত্বমসি" প্রভৃতি শ্রুতিতে যে ব্রহ্মা-ত্মৈকত্ব প্রতিষ্ঠিত করে, তাহার "ত্বং" এই পরিচ্ছিন্ন, উপাধিযুক্ত জীব নহে। আর এই পরিচ্ছিন্ন ও উপাধিযুক্ত জীবই আমাদের অহঙ্কারতত্ত্ব। "তত্ত্বমসি"র "ত্বং" এই অহঙ্কারতত্ত্বের উপরকার বস্তু। তাহা নিত্য,

সত্য, সনাতন ; তাহা অবিকারী, অপরিণামী, তাহা—"সাক্ষীঃ চেতাঃ নিগুর্ণশ্চ।" আমার মধ্যে ভগবান আছেন, সত্য কথা। আমিই এই ভগবান, ইহাও একান্ত মিথ্যা নহে। এই জন্যই প্রচলিত শঙ্করবেদান্ত যে-অর্থে ও যে-ভাবে জীব-ব্রহ্মের একত্ব স্থাপন করেন, তাহা অস্বীকার করিয়াও, বৈষ্ণবেরা পর্য্যন্ত নরকে নারায়ণ বলিয়া প্রণাম করেন। তবে যে-আমি ভগবানের বা নারায়ণের অংশ বা বিম্ব, তাহা আমার এই অহঙ্কারতত্ত্বের উপরকার বস্তু। ভগবান পূর্ণ পুরুষ, তিনি স্বতন্ত্র ঈশ্বর। তিনি আপনি আপনার জ্ঞাতা, আপনি আপনার ভোক্তা, আপনি আপনার কর্ম্মের কর্ত্তা ও বিষয়। অর্থাৎ তিনিও এক হইয়াও একান্ত এক নহেন, কিন্তু দুই। তাঁর আপনার মধ্যেই বিষয়-বিষয়ী, জ্ঞাতা-জ্ঞেয়, ভোক্তা-ভোগ্য, কর্ত্তা-কর্ম্ম সম্বন্ধের প্রতিষ্ঠা হইয়া তাঁহাকে পরিপূর্ণ ও স্বতন্ত্র ঈশ্বর করিয়াছে। তিনি এই-জন্য দুই'এ এক ও একে দুই। তিনি পুরুষ ও প্রকৃতি, বিষয়ী ও বিষয়, জ্ঞাতাও জ্ঞেয়, ভোক্তা ও ভোগ্য, কর্ত্তা ও কর্ম্ম,—উভয়ই। আর আমার আমিত্বের মধ্যেই, আমার অহঙ্কার-তত্ত্বকে ছাড়াইয়া, আমার জীবনের ও জীবত্বের নিত্য-আশ্রয় ভূমিতে, এই পুরুষ-প্রকৃতির নিত্যলীলার অভিনয় হইতেছে।

এই দেহের মধ্যে, এই দেহের অতীত ও দেহধর্ম্মবিবর্জ্জিত একটা কোনও কিছু আছে, এই বিশ্বাস যাহাদের আছে, তাঁহারাই আস্তিক। এই জন্য "ঈশ্বরাসিদ্ধেঃ" বলিয়াও আমাদের সাংখ্যেরা নাস্তিক-আখ্যালাভ করেন নাই। আর এই আস্তিক্য-বুদ্ধি যাঁহাদেরই আছে, তাঁরাই নিজেদের মধ্যে আত্মার বা ব্রহ্মের বা ভগবানের বা নারায়ণের অধিষ্ঠান স্বীকার করিয়া থাকেন। নির্গুণব্রহ্মবাদীগণ নিজেদের ভিতরকার এই পরমতত্ত্বকে নির্গুণ মনে করেন। এই তত্ত্বের মধ্যে কোনও জ্ঞাতা-জ্ঞেয় বা ভোক্তা-ভোগ্যাদি দ্বৈত-সম্বন্ধের জ্ঞান বা চৈতন্য নাই। ইহা নির্ব্বিশেষবস্তু, ইহাশুদ্ধ একত্ব। সুতরাং এই পরমতত্ত্বকে লাভ করিবার জন্য ইঁহারা শূন্যসমাধির অভ্যাস করিয়া

থাকেন। ভাগবতেরা নিজেদের ভিতরকার এই পরমতত্ত্বকে সগুণ-নির্গুণের অতীত মনে করেন। এখানে সগুণ-নির্গুণের সমন্বয় হইয়াছে। এখানে জ্ঞাতা-জ্ঞেয়, ভোক্তা-ভোগ্য সম্বন্ধের মধ্যেই পরমতত্ত্বের ভেদ ও অভেদ দুই' নিত্যপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছে; অভেদের মধ্যে ভেদ, ভেদের মধ্যে অভেদ প্রকাশ হইতেছে। এই প্রক্রিয়ার নামই লীলা। নিত্যই পরমতত্ত্বের অভেদেতে জ্ঞাতা-জ্ঞেয়, ভোক্তা-ভোগ্য; পুরুষ-প্রকৃতি এই ভেদ জন্মিতেছে, আবার যুগপৎ এই ভেদের মধ্যেই ইহাদের মিলনে অভেদ প্রতিষ্ঠিত হইতেছে। এই ভেদাভেদতত্ত্বই ভক্তির উপজীব্য। এই অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-সমন্বিত যে পরমতত্ত্ব তিনিই পরিপূর্ণ ভগবান। এই ভগবান জীবের মধ্যে রহিয়াছেন। জীবের জীবত্ব তাঁহারই উপরে প্রতিষ্ঠিত, তাঁহারই আশ্রয়ে প্রকাশিত। সুতরাং জীবের মধ্যেই, তার নিত্য-চৈতন্যের রঙ্গ-মঞ্চেতে এই নিত্য ভাগবতী লীলার অভিনয় হইতেছে। এই নিত্য জ্ঞানলীলার গুরুশিষ্য-সংবাদের দুই একটি কথার প্রতিধ্বনি মানবের অহঙ্কারের ভূমিতে তার বুদ্ধিতে আসিয়া জাগিতেছে, আর তাহাকে ধরিয়াই মানুষ তার যাবতীয় বিজ্ঞানদর্শনাদির প্রতিষ্ঠা করিতেছে। এই নিত্য রসলীলার দুএক বিন্দু রস মানুষের জীবনে আসিয়া উপচাইয়া পড়িতেছে, আর তাহাতেই তার যাবতীয় দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুরাদি সম্বন্ধের আশ্রয়ে নিত্য নব নব রস ফুটিয়া উঠিতেছে। এই রসের আভাসেই তার কাব্য, সঙ্গীত, চিত্র, ভাস্কর্য্য স্থাপত্য, নাট্য ও নৃত্যাদি চৌষট্টি কলার সৃষ্টি হইয়াছে। এই লীলার ছায়াতেই আমাদের লোকহিতৈষা, দেশহিতৈষা প্রভৃতি যাবতীয় লোকশ্রেয়ের প্রতিষ্ঠা হইতেছে। মানুষ বাহিরের সংসারলীলায় মগ্ন হইয়া কেবল এই বহিরঙ্গলীলার অভিনয়ই দেখে, কিন্তু ইহার অন্তরালে যে নিত্যলীলার অভিনয় হইতেছে, তার সাক্ষাৎকার লাভ করে না। এই জন্যই মায়াবদ্ধ হইয়া ক্লেশ পায়।

সাধন-বলে, নির্গুণ-ব্রহ্মবাদী যেমন শূন্য-সমাধি অভ্যাস করিয়া,

অদ্বৈত-ব্রহ্মসিদ্ধি লাভ করিতে পারেন, কেহ কেহ লাভ করিয়া থাকেন ; সেইরূপ যথাযোগ্য সাধন বলে ভাগবতপন্থীগণও এই লীলোপাসনার দ্বারা, আপনার অন্তরের নিগূঢ়তম অনুভূতিতে এই নিত্যলীলার সাক্ষাৎকার লাভ করিতে পারেন। আর এই লীলা যাঁর প্রত্যক্ষ হয়, তিনি কখনও পুরুষের সঙ্গে, কখনও বা প্রকৃতির সঙ্গে একাত্মতা অনুভব করিয়া, তাঁহাদের ভাবভাবিত হইয়া, এই নিগূঢ় লীলারস আস্বাদন করেন। শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে একাত্ম হইয়া কখনও তাঁহারা দুর্জ্জয়মানিনী শ্রীরাধিকার সাধ্যসাধনা করেন, আর কখনও বা শ্রীরাধিকার সঙ্গে একাত্ম হইয়া, হা কৃষ্ণ, হা নাথ, বলিয়া ভূমিতলে গড়াগড়ি যান। এই সাধন যাঁহাদের আছে, এই অবস্থা যাঁহাদের লাভ হইয়াছে, তাঁহারাই কেবল গৌরাঙ্গলীলা বস্তুটি সত্য সত্য যে কি, ইহা বুঝেন। নিজেদের অন্তরঙ্গ অভিজ্ঞতা ও অপরোক্ষ অনুভূতির দ্বারা তাঁহারা গৌরাঙ্গাবতারের প্রকৃত মর্ম্ম বুঝিয়া, গৌরাঙ্গলীলার অনুবাদে রাধাকৃষ্ণলীলার মর্ম্ম উদ্ঘাটন করিতে পারেন।

যাঁহাদের এই সিদ্ধিলাভ হয় নাই, তাঁহারা ইহার অনুবাদ পাইবেন কোথায়? তাঁহাদিগকে প্রথমে তত্ত্বের অন্বেষণে যাইতে হইবে। শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসনের দ্বারা, তাঁহাদিগকে প্রথমে নিজেদের আত্মতত্ত্বের জ্ঞানলাভ করিবার চেষ্টা করিতে হইবে। বিচার ও অনুভূতিকে আশ্রয় করিয়া, নিজেদের ভিতরে একত্বের মধ্যেই যে দ্বৈত আছে ; অনিত্যের মধ্যেই যে নিত্যবস্তু আছে ; ইন্দ্রিয়ের অন্তরালে যে ইহাদের নিয়ন্তা একজন আছেন, যিনি হৃষিকেশ ; নিজেদের জীবনের জ্ঞান-প্রেম-কর্ম্মের ক্রমবিকাশের অন্তরালে যে জ্ঞান-প্রেম-কর্ম্মের একটা নিত্যসিদ্ধ আদর্শ এবং আশ্রয় আছে ; এই ক্ষণস্থায়ী জীবনের ও সংসারলীলার পশ্চাতে তাহার গতি ও নিয়তিরূপে যে একটা নিত্যসিদ্ধ জীবন-ও-সংসার লীলা রহিয়াছে ; এসকল না থাকিলে জীবনের, সংসারের, দাস্যসখ্যাদি সম্বন্ধের ও রসের কোনও অর্থ ও সাফল্য থাকে না ;—এই ভাবে নিজের অভিজ্ঞার বিচার ও অনুভূতির

বিশ্লেষণ করিয়া, তাঁহাদিগের পুরুষ-প্রকৃতি-তত্ত্বের মর্ম্মগ্রহণ করিবার চেষ্টা করিতে হইবে। কিন্তু ইহাতেও সত্যের আভাসমাত্র পাওয়া যাইবে, সত্যের সাক্ষাৎকারলাভ হইবে না। এই আভাস পাইলে ক্রমে আস্তিক্য-বুদ্ধিলাভ হইবে। পুরুষ-প্রকৃতিতত্ত্ব যে সত্য, নিজেদের জীবনের রঙ্গভূমির অন্তরালে যে এই পুরুষপ্রকৃতির নিত্যলীলার অভিনয় হইতেছে, এই বিশ্বাস জন্মিবে। এই বিশ্বাসকেই শাস্ত্রে শ্রদ্ধা কহেন। এই শ্রদ্ধা জন্মিলে, লীলার অনুশীলনে অধ্যবসায় হইবে। অপরোক্ষ অনুভূতিলাভ না হইলেও, তখন মানসকল্পনাবলে লীলারস-আস্বাদনের সামর্থ্য জন্মিবে। তারপর, ভাগ্য প্রসন্ন হইলে, প্রকৃত সদ্‌গুরুচরণাশ্রয় পাইলে, শ্রীশ্রীগুরুদেবের সিদ্ধ দেহে ভাগবতীলীলার অভিনয় প্রত্যক্ষ হইবে। তখন প্রত্যক্ষ-শ্রীগুরুলীলাকে অনুবাদ করিয়া, তাহার সাহায্যে শ্রীগৌরাঙ্গলীলার, এবং শ্রীগৌরাঙ্গলীলার অনুবাদে রাধাকৃষ্ণের নিত্যলীলার মর্ম্মগ্রহণ সম্ভব হইবে।

এরূপ সদ্‌গুরুলাভ সহজ নয়। যে গুরু আপনার মধ্যে, আপনার অন্তরঙ্গ অপরোক্ষ অনুভূতিতে—পুরুষপ্রকৃতির নিত্যলীলার সাক্ষাৎকার লাভ করিয়া, মহাপ্রভুর মতন দিবানিশি সেই লীলারসে মগ্ন রহিয়াছেন, কেবল তিনিই শ্রীগৌরাঙ্গলীলার ও রাধাকৃষ্ণলীলার সত্য অনুবাদ করিতে পারেন। এমন গুরু লাখে না মিলয়ে এক। যতদিন না এমন সদ্‌গুরু-লাভ হইয়াছে, ততদিন "তদুচিত গৌরচন্দ্রের" মর্ম্মগ্রহণ সম্ভব নহে।

শ্রীবিপিনচন্দ্র পাল।

শান্তি

১

ওগো সৌম্য, মৌন শান্তি !
মোর ভাঙ্গি' দাও আজি, কাড়ি' যাও আজি
জীবনের যত ভ্রান্তি।
জীবনের শত ঘাত প্রতিঘাত
সহিবারে নারি আর দিবারাত
মুছাইয়া দাও পরশে তোমার শত জনমের ক্লান্তি,—
ওগো সৌম্য ! ওগো মৌন !
ওগো কমনীয় শান্তি !

২

এ জীবন-গহনারণ্যে
শত শত কাজ বেঁধেছে আমায়
শত পাপ শত পুণ্যে।
আজি ভারে তার পরাণ আকুল,
এর পরপারে যাইতে ব্যাকুল
পরাণ আমার ; লহ কাড়ি' মোর শতেক বাসনা দৈন্যে —
ওগো সৌম্য, ভরাও আমার
তোমারি বিপুল পণ্যে।

৩

হৃদয়ের শত ক্রন্দন
লুকায়ি' আমায় ঘিরিয়া ঘিরিয়া
বেঁধেছে অযুত বন্ধন।
ক্রন্দন কি গো ফুরাবেনা হায়?
জীবন-প্রবাহ শুকায়ে যে যায়!
বন্ধন মাঝে চিরকাল কিগো করিবে হৃদয় স্পন্দন?
ওগো ও মৌন! মৌন করাও
হৃদয়—বাসনা—ক্রন্দন।

৪

ওগো শান্তি-মন্দাকিনী!
হর্ষ বিষাদ করি' সমাহিত
এস অন্তরে নামি'।
দুখের সুখের ঘাত প্রতিঘাত
উচ্ছ্বাস ক্ষণে ক্ষণে অবসাদ
ডুবাইয়া তব অতল গর্ভে তোমারি মুরতিখানি
রাখ শুধু মোর অন্তর মাঝে
শান্তি-মন্দাকিনী।

শ্রীসুরেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

জাতীয় জীবনে ধ্বংসের কারণ

[২]

পূর্ব্ব প্রবন্ধে(১) আমরা দেখাইয়াছি যে ধ্বংসের প্রাক্কালে জাতীয় জীবনে কি কি লক্ষণ সচরাচর প্রকাশ পাইয়া থাকে। যে সকল প্রতিকূল শক্তি জাতীয় জীবনকে ধ্বংসের দিকে লইয়া যায়,—অর্থাৎ যেগুলিকে আমরা ধ্বংসের কারণ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছি,—বর্ত্তমান প্রবন্ধে আমরা তাহাদের সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করিতে প্রবৃত্ত হইব।

প্রাকৃতিক দ্বন্দ্ব :—বাহ্যপ্রকৃতির সঙ্গে জীবসমূহের যে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ, তাহা বলা নিষ্প্রয়োজন। যে সকল প্রাকৃতিক শক্তি ও জলবায়ুর পরিবেষ্টনীর মধ্যে জীবদেহ গঠিত হইয়া উঠে, তাহাদের প্রভাব উহার উপর বহুল পরিমাণে কার্য্য করিয়া থাকে। ডারুইনের পূর্ব্ববর্ত্তী, বিবর্ত্তন বাদের সূচনাকর্ত্তা ফরাসীপণ্ডিত লামার্ক এপর্য্যন্ত বলেন যে, জৈববিবর্ত্তনের ইহাই একমাত্র ও প্রধান কারণ। প্রাকৃতিক শক্তি ও পরিবেষ্টনীই জীবদেহের উপর কার্য্য করিয়া তাহাকে নানা পরিবর্ত্তন ও বৈচিত্র্যের মধ্য দিয়া ফুটাইয়া তুলিতেছে। ডারুইন ও তাঁহার অনুবর্ত্তীগণ এতটা স্বীকার করেন না। তাঁহারা বলেন যে, প্রাকৃতিক শক্তি ও পরিবেষ্টনী জীবজগতের বিকাশের একমাত্র ও প্রধান কারণ না হইলেও, তাহা যে জীবদেহের গঠনের উপর বহুল প্রভাব বিস্তার করিয়া থাকে, তাহাতে সন্দেহ নাই (২)।

---

(১) নারায়ণ—মাঘ, ১৩২২—'জাতীয় জীবনে ধ্বংসের লক্ষণ ;

(২) Darwin—The Origin of Species.

মনুষ্য জীবজগতের শ্রেষ্ঠ জীব। এই প্রাকৃতিক শক্তির প্রভাব তাহার উপরেও সমান পরিমাণে কার্য্য করিতেছে। মানবজাতির উন্নতি ও অবনতি, আচারব্যবহার, রীতিনীতি প্রভৃতি প্রাকৃতিক শক্তির দ্বারা বহুল পরিমাণে নিয়মিত হইয়া আসিতেছে। বাক্‌ল্ তাঁহার 'সভ্যতার ইতিহাস' গ্রন্থে (৩) প্রাকৃতিক শক্তি ও জলবায়ু প্রভৃতিকেই মানব-সভ্যতার একমাত্র নিয়ামক বলিয়া ধরিয়া লইয়াছেন। তাঁহার মতে মানুষ সর্ব্বাংশে প্রকৃতির দাস। যে সকল প্রাকৃতিক পরিবেষ্টনীর মধ্যে সে ঘটনাক্রমে পতিত হয়, সেগুলিকে সে অতিক্রম করিতে পারে না। তাহার নিজের শক্তি যে কিছুই নাই। অবশ্য বাক্‌লের মতের গোড়ায় একটু গলদ আছে। তিনি নিজের স্বদেশ ইংলণ্ড ও ইউরোপকেই সভ্যতার আদর্শ ধরিয়া লইয়াছেন ও সেই মাপকাটী দিয়া মাপিয়া বিভিন্ন মানব-সভ্যতার মূল্য নির্দ্ধারণ করিয়াছেন। আবার মানুষের অন্তর্নিহিত শক্তিকে তিনি একপ্রকার ছাড়িয়াই দিয়াছেন। কিন্তু মানুষের আত্মশক্তি যে সভ্যতা-গঠনের একটী প্রধান অঙ্গ—তাহা আমরা পরে দেখিতে পাইব।

কিন্তু বাক্‌লের মতকে সর্ব্বাংশে গ্রহণ করিতে না পারিলেও তাহার মধ্যে যে অনেক পরিমাণে সত্য নিহিত আছে, তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। অনুকূল জলবায়ু, উর্ব্বরাভূমি, গভীর ও বিশাল প্রবাহিনী, বন্দরোপযোগী সমুদ্রকূল,——এ সকল যে সভ্যতা বিকাশের বিশেষরূপে সহায়ক, তাহাতে সন্দেহ নাই। প্রাচীন ও আধুনিক সভ্যতা বিকাশের কেন্দ্রস্থলগুলি পর্য্যালোচনা করিলেই এ কথা আমাদের হৃদয়ঙ্গম হইবে। প্রাচীনতম আসিরিয়া ও ব্যাবিলনের সভ্যতা ইউফ্রেটিস্ ও টাইগ্রিস্ নদীর সঙ্গমক্ষেত্র আধুনিক মেসপটেমিয়া দেশেই গড়িয়া উঠিয়াছিল। এই নদীমাতৃক উর্ব্বরা দেশ আবার সমুদ্রতীরবর্ত্তী

(৩) Buckle's History of Civilisation.

হওয়ায় বাণিজ্যের পক্ষেও বিশেষরূপে অনুকূল হইয়াছিল। প্রাচীন সভ্যতার অন্য এক কেন্দ্রস্থল মিসর দেশ। আর এই মিশর-সভ্যতা বহুশাখাশালিনী নীল নদীর আশ্রয়েই পরিবর্দ্ধিত হইয়াছিল, সন্দেহ নাই। প্রাচীন ভারতীয় আর্য্য-সভ্যতা একদিকে আর্য্যাবর্ত্তের অনুকূল জলবায়ু, অপরদিকে সিন্ধু গঙ্গা প্রভৃতি বিশাল নদীপ্রবাহ-দ্বারাই অনেক পরিমাণে নিয়মিত হইয়াছিল। প্রাচীন চৈনিক সভ্যতার কেন্দ্রস্থলও ইয়াংসিকিয়াং ও হোয়াংহো নদীর লীলাস্থল, সমুদ্র-তীরবর্ত্তী উর্ব্বরা ভূখণ্ডেই প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। আধুনিক পণ্ডিতদের আবিষ্কারের ফলে জানা গিয়াছে যে, দক্ষিণ-আমেরিকার পেরু ও মধ্য-আমেরিকার মেক্সিকো প্রভৃতি স্থান ক্ষিতি প্রাচীনকালে একটী বিপুল সভ্যতার কেন্দ্রস্থল ছিল। আর ঐ দুই স্থানই যে প্রকৃতিক অবস্থান হিসাবে দক্ষিণ ও মধ্য আমেরিকার শ্রেষ্ঠ স্থান তাহা কেহ অস্বীকার করিবেন না। প্রাচীন গ্রীক ও রোমক সভ্যতাও সমুদ্র-তীরবর্ত্তী বাণিজ্যের অনুকূল স্থানেই বিকাশ প্রাপ্ত হইয়াছিল। আধুনিক কালেও সমুদ্রবেষ্টিত ইংলণ্ড ও জাপান, নদীমাতৃক ফ্রান্স ও জার্ম্মাণী, নাতিশীতোষ্ণ জলবায়ু নদীহ্রদশালিনী আমেরিকার সম্মিলিত রাষ্ট্র প্রভৃতিও প্রকৃতির অনুগ্রহে বঞ্চিত হয় নাই।

অপর পক্ষে প্রতিকূল প্রাকৃতিক শক্তি অনেক জাতি ও সমাজকে যে চাপিয়া রাখিয়াছে—তাহাকে বিকাশ ও উন্নতির পথে যাইতে দেয় নাই—তাহার অন্তর্নিহিত শক্তি ও সামর্থ্যকে প্রবল বাধার দ্বারা পঙ্গু করিয়া ফেলিয়াছে, ইহাও লক্ষ্য করিলে দেখা যাইতে পারে। অসহ্য শীত ও অসহ্য উত্তাপ উভয়ই মানব প্রকৃতিকে পঙ্গু করিয়া ফেলে, তাহার বিকাশের পথে বাধা দেয়। উত্তর মেরুর নিকটবর্ত্তী ল্যাপ-ল্যাণ্ড, গ্রীণল্যাণ্ড ও আইস্‌ল্যাণ্ডের অধিবাসীবৃন্দ ইহার দৃষ্টান্তস্থল। ইহারা যে অপেক্ষাকৃত প্রাচীন জাতি, ইহা একপ্রকার নির্ণীত হইয়াছে। কিন্তু তাহাদের জাতীয় জীবনের কালপরিমাণ দীর্ঘ হইলেও, তাহারা এযাবৎ বিশেষ কোনই উন্নতি করিতে পারে নাই—সেই

অতি প্রাচীন অসভ্যাবস্থাতেই আছে বলিলেই হয়। ইহাদের প্রাকৃতিক পরিবেষ্টনী এত প্রবলরূপে প্রতিকূল যে ইহারা কিছুতেই তাহাকে অতিক্রম করিতে পারে নাই ইউরোপ ও আমেরিকার অধিবাসীবৃন্দ জ্ঞান, বিজ্ঞান ও বাণিজ্য সম্পদে ক্রমেই সমৃদ্ধ হইয়া উঠিতেছে; কিন্তু ইহারা সেই প্রাচীন কালের মতই সীল-মৎস্য শিকার করিয়া ও বল্গা-হরিণে চড়িয়াই কোন প্রকারে জীবন কাটাইয়া দিতেছে। অসহ্য উত্তাপের ফলে মরুভূমিবাসী আরব বেদুইন ও মধ্য-আফ্রিকার অসভ্য নিগ্রোজাতিসকল এই বিংশ শতাব্দীতেও সেই অতি আদিম অবস্থাতেই জীবন যাপন করিতেছে। ব্রেজিলের আরণ্য-প্রকৃতি এত ভীষণ যে তৎস্থানবাসী মানবজাতি কিছুতেই তাহাকে অতিক্রম করিয়া উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে পারে নাই। দুর্গম পর্ব্বতবেষ্টিত ককেসিয়া ও তিব্বতের অধিবাসীগণ এবং নির্জ্জন দ্বীপবাসী পলিনেশিয়ার নানাজাতির দৃষ্টান্তও এস্থলে দেওয়া যাইতে পারে।

জল বায়ু ও প্রাকৃতিক শক্তির পরিবর্ত্তনও অনেক সময় মানব সভ্যতার গতি ফিরাইয়া দেয়। যেরূপ অনুকূল প্রাকৃতিক অবস্থার মধ্যে কোন সভ্যতা গড়িয়া উঠিয়াছিল, হঠাৎ তাহার পরিবর্ত্তনে জাতীয় উন্নতির গতি রুদ্ধ হইতে পারে। ইহার দৃষ্টান্ত মানব-জাতির ইতিহাসে বিরল নহে। যে স্থানে আসিরিয়া ও ব্যাবিলন সভ্যতার জন্মভূমি, ঐ স্থানে যে বহু প্রাকৃতিক পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে, 'আব হাওয়া'র দ্রুত পরিবর্ত্তন হইয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই। আর ঐ পরিবর্ত্তন যে প্রাচীন সভ্যতার ধ্বংসের পক্ষে যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছে, ইহাও বলিতে পারা যায়। বর্ত্তমান কালে তাতার ও পশ্চিম মঙ্গোলিয়া প্রদেশ নদীহীন মরুভূমি সদৃশ। কিন্তু প্রাচীন কালে ঐ স্থান যে কিয়ৎ পরিমাণে 'সজলা সফলা' ছিল, তাহা মনে করিবার যথেষ্ট কারণ আছে। আর ঐ স্থানে যে পূর্ব্বকালে একটা সুবিস্তৃত সভ্যতা গড়িয়া উঠিয়াছিল, পাশ্চাত্য পণ্ডিত ষ্টীন, সেভেন হেডেন প্রভৃতির আবিষ্কারের ফলে তাহা এখন সুবিদিত হইয়াছে। ঐ

প্রাচীন মধ্য-অসিয়ার সভ্যতার উপরে ভারতের আর্য্য বৌদ্ধ সভ্যতার কম প্রভাব ছিল না। প্রধানতঃ প্রতিকূল প্রাকৃতিক পরিবর্ত্তনের ফলে সে সভ্যতা এখন কোথায় লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। প্রাচীন সভ্যতার জন্মস্থান সেই দেশ এখন যাযাবর বর্ব্বর জাতিসমূহের বাসস্থান। কোন কোন পণ্ডিত অনুমান করেন যে, উত্তর মেরুর সন্নিকটে ইউরোপ ও আসিয়ার সন্ধিস্থলে, আদিম আর্য্য সভ্যতা গড়িয়া উঠিয়াছিল। তখন ঐ স্থানের জল বায়ু অনেকটা নাতিশীতোষ্ণ ছিল। কালে হিম যুগের আবির্ভাবে ঐ দেশ লোক-বাসের অনুপযোগী হইয়া উঠিল ও সুপ্রাচীন আর্য্যসঙ্ঘ চতুর্দ্দিকে বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িল। বরফাবৃত সাইবিরিয়ার সমতল প্রান্তর এখন শ্বেতভল্লুক ও রাজদণ্ডে দণ্ডিত রাসিয়ার হতভাগ্য অধিবাসীদের জন্যই প্রধানতঃ নির্দ্দিষ্ট রহিয়াছে।

আধুনিক কালে বাঙ্গালা দেশেও একটা প্রতিকূল প্রাকৃতিক পরিবর্ত্তন ঘটিতেছে, এইরূপ আমাদের মনে হয়। নদীপ্রাধান্য, জলপ্লাবন-বিধৌত উর্ব্বরা ভূমির নিম্নতা ও সমুদ্র সান্নিধ্যই যে প্রাচীন বাঙ্গালার সভ্যতাবিকাশের মূল, তাহা বোধ হয় কেহ অস্বীকার করিবে না। গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্র এবং তাহাদের অগণিত শাখাপ্রশাখা একদিকে যেমন বাঙ্গালাকে 'সুজলা সুফলা' ও অন্তর্বাণিজ্যের উপযোগী করিয়া তুলিয়াছিল,—অন্য দিকে তেমনই, এই নদীমালার সাহায্যেই প্রাচীন বঙ্গীয়গণ রণতরীবলে দুর্দ্ধর্ষ ও প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল। প্লাবনবিধৌত সমতলভূমি বাঙ্গালার নীরোগ-গৃহকে ধনধান্যে পূর্ণ করিয়া তুলিয়াছিল। প্রতিবাসী সমুদ্রকেও প্রাচীন বাঙ্গালী কাজে লাগাইতে ভুলে নাই। আজিকার এই সমুদ্রযাত্রাবিমুখ বাঙ্গালীজাতির পূর্ব্বপুরুষেরাই বিশাল মহাসমুদ্র অকুতোভয়ে পার হইয়া দেশদেশান্তরে বানিজ্য বিস্তার করিয়াছিল ও ভারত মহাসাগরের নানাদ্বীপপুঞ্জে বাঙ্গালার জয়পতাকা উড়াইয়া দিয়াছিল (৪)।

(৪) History of Indian Shipping and Maritime Activity—by Dr. Radha Kumud Mukerjee. এবং

কিন্তু বাঙ্গালাদেশের এই প্রাকৃতিক সংস্থান চিরকাল একরূপ থাকিতে পারে না। ভূতত্ত্ববিদ্‌গণ বলেন যে, প্রায় সমগ্র বাঙ্গালা-দেশটাই গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্রের বদ্বীপ হইতে গড়িয়া উঠিয়াছে। উত্তরে শিবালিক গিরিমালা, পূর্ব্বে রাজমহল পাহাড়, পশ্চিমে চট্টগ্রামের মালভূমি ও দক্ষিণে সমুদ্র, বাঙ্গালাদেশের এই অধিকাংশ আয়তনই বদ্বীপজাত সমুদ্রতীরবর্ত্তী নিম্নভূমি। গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্র ও তাহার শাখাপ্রশাখা, এই সমতট দেশের প্রায় সর্বস্থান দিয়াই বহিয়া চলিয়াছে; বর্ষায় ইহাদের প্লাবনে এই দেশের প্রায় সর্ব্বত্র বিধৌত হইয়া আসিয়াছে। ফলে এক দিকে যেমন দেশ উর্ব্বরা ছিল, অন্য দিকে কোন সংক্রামক বা দেশব্যাপী ব্যাধিও সেখানে বিশেষরূপে প্রভাব বিস্তার করিতে পারে নাই। কিন্তু এই নিম্নভূমি চিরকালই নিম্ন থাকিতে পারে না। প্রাকৃতিক কার্য্যের ফলেই নদীবাহিত পলিপুঞ্জের দ্বারা ও অন্যান্য কারণে ক্রমেই এই দেশ উচ্চ হইয়া উঠিতেছে; নদীগর্ভসকল ক্রমেই অগভীর, শুষ্ক ও ভরাট হইয়া আসিতেছে। ইহার ফলে বর্ষায় নদীর প্লাবন আর তেমন ভাবে দেশের সর্ব্বত্র ধুইয়া লইয়া যাইতে পারে না। অনেক স্থলে প্লাবনের জল বাহির হইবার পথ রুদ্ধ হইয়া গিয়াছে। পূর্ব্বে বর্ষার প্লাবন আসিয়া দেশের সর্ব্বত্র ধৌত ও পরিষ্কার করিয়া দিয়া যাইত; তাহাতে জল সরিয়া গেলে ভূমি শুষ্ক ও ব্যাধিবীজহীন হইত; নদী সকলও গভীর ও জলপূর্ণ থাকিত। কিন্তু এখন ক্রমশঃ ভূমি উচ্চ হওয়াতে প্লাবনের জল আর তেমন ভাবে যথেষ্ট পরিমাণে আসে না, ও যাহা আসে তাহাও বাহির হইতে পারে না; নদী সকলও আর তেমন গভীর ও পরিপূর্ণ থাকে না। ফলে, দেশ আর্দ্র ও স্যাঁতসেঁতে হইয়া উঠিতেছে, নদীর মুখ ভরাট হইয়া দেশে ক্রমেই জলাভাব ঘটিতেছে। প্রাকৃতিক কার্য্য এই ভাবে চলিতে থাকিলে বহুকাল পরে হয়ত নিম্নভূমি বাঙ্গালাদেশ—বিহার, উড়িষ্যা, মধ্যপ্রদেশ ও পাঞ্জাব প্রভৃ-

'সাগরিকা'—শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়,—'সাহিত্য', ১৩২০।

তির ন্যায় নদী-বিরল, শুষ্ক, উচ্চভূমি হইয়া উঠিবে। কিন্তু বর্ত্তমান এই মধ্যবর্ত্তী অবস্থায় দেশ যে এখনকার ন্যায় স্যাঁতসেঁতে ও আর্দ্র থাকিবে ও ক্রমেই সেখানে জলাভাব বেশী পরিমাণে ঘটিতে থাকিবে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। বর্ত্তমান বাঙ্গালাদেশের অনেক স্থানে রেল-ওয়ে লাইন বিস্তৃত হইয়াছে। ইহার ফলেও দেশের অনেক স্থলে জলনিকাশের পথ রুদ্ধ হইয়াছে ও সেতুনির্ম্মাণের দ্বারা অনেক নদীর স্রোতের গতি হ্রাস ও মুখ রুদ্ধ হইয়া গিয়াছে। আর আর্দ্র ও স্যাঁতসেঁতে ভূমি, প্লাবনের অভাব, নদীর অগভীরতা ও মুখরোধ, দেশের নানাস্থানে জলনিকাশের বাধা—এই সকল যে ম্যালেরিয়ার ন্যায় দেশব্যাপী ভয়ঙ্কর রোগের একটা প্রধান কারণ, তাহাতে সন্দেহ নাই। বাঙ্গালাদেশে গত অর্দ্ধশতাব্দীর মধ্যে ম্যালেরিয়ার উৎপত্তি ও বিস্তারের আরও অনেক আভ্যন্তরীণ কারণ থাকিতে পারে,—দেশব্যাপী দারিদ্র্য যে এই ভীষণ রোগের বিস্তারের পক্ষে যথেষ্ট সহায়তা করিতেছে তাহাতে সন্দেহ নাই; কিন্তু পূর্ব্বোক্ত প্রতিকূল প্রাকৃতিক পরিবর্ত্তন সমূহ যে সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর কারণ, ইহাই আমাদের মনে হয়। ম্যালেরিয়াতত্ত্ববিৎ ডাক্তার বেণ্টলীও ইহার প্রায় সকলগুলিকেই বাঙ্গালার ম্যালেরিয়ার কারণ বলিয়া সম্প্রতি নির্দ্দেশ করিয়াছেন (৫)। কালে প্রাকৃতিক অবস্থার পরিবর্ত্তনে অথবা মানুষের উদ্যমে হয়ত ম্যালেরিয়ার প্রতিষেধ হইতে পারে। কিন্তু এখন যে এই ভীষণ রোগ বাঙ্গালা জাতিকে ধ্বংসোন্মুখ করিয়া তুলিয়াছে, তাহা বোধ হয় আর বলিতে হইবে না। গত বৎসর এক ম্যালেরিয়াতেই বাঙ্গালাদেশে দশ লক্ষ লোকের মৃত্যু হইয়াছে; বোধ হয় ইউরোপের এই ভীষণ যুদ্ধেও এর চেয়ে বেশী লোক মরিয়াছে কিনা সন্দেহ। আর এই মৃত্যু-সংখ্যা বৎসরের পর বৎসর বাড়িয়াই আসিতেছে! ফলে, দেশে জন্মের হার ত বাড়িতেছেই না,

(৫) Dr. Bentley—Lectures on Malaria (University Lectures, 1916).

বরং মৃত্যুর হার উত্তরোত্তর বাড়িয়া চলিয়াছে। শিশু-মৃত্যু সাংঘাতিক রূপে বৃদ্ধি পাইয়াছে, সঙ্গে সঙ্গে প্রসূতি-মৃত্যুর সংখ্যাও বাড়িয়াছে। কোন্ দিকে যাইয়া যে ইহার শেষ হইবে তাহা ভাবিতেও মন গভীর বিষাদাচ্ছন্ন হইয়া উঠে।

এই প্রাকৃতিক পরিবর্ত্তনের ফলে বাঙ্গালাদেশের আরও অনেক অবস্থা পরিবর্ত্তনের সম্ভাবনা। ইহাতে স্বচ্ছন্দমত নৌচালনের পথ বন্ধ হওয়াতে অন্তর্বাণিজ্যের অনেক অসুবিধা ঘটিবে। বন্যার সঙ্গে জমিতে পূর্ব্বের মত পলি না পড়াতে, ভূমির উর্ব্বরাশক্তি কমিয়া যাইবে; ধনধান্যপূর্ণ বাঙ্গলাদেশ হয়ত অনুর্ব্বর হইয়া দাঁড়াইবে। এক কথায়, রোগ দারিদ্র্য প্রভৃতি জাতীয় জীবনের ঘোরতর শত্রু সকল এই পরিবর্ত্তনের ফলে ধীরে ধীরে বাঙ্গালাদেশ অধিকার করিতে থাকিবে ও বাঙ্গালী জাতিকে ক্রমে ধ্বংসের পথে লইয়া যাইবে।

জাতীয়দ্বন্দ্ব:—প্রাকৃতিক শক্তির সঙ্গে দ্বন্দ্বের ফলে অনেক জাতি যেমন ধ্বংস হইয়া যায়, জাতিতে জাতিতে দ্বন্দ্বও তেমনই অনেক জাতির ধ্বংসসাধন করে। ফলতঃ এই প্রতিযোগীতা ও দ্বন্দ্ব মানবসমাজে এতই প্রবল ও সর্ব্বব্যাপী যে অন্যান্য জীবের ন্যায় মানুষেরও ইহা সাধারণধর্ম্ম বলিলে অত্যুক্তি হয় না। প্রতিযোগীতার সর্ব্বাপেক্ষা প্রকটমূর্ত্তি জাতিতে জাতিতে যুদ্ধ। পরস্পরের সঙ্গে যুদ্ধের ফলে প্রাচীনকালে কত জাতি যে ধ্বংস হইয়া গিয়াছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। অসভ্য ও বর্ব্বরাবস্থায় বলিতে গেলে যুদ্ধই মানুষের একমাত্র কার্য্য ছিল। নিজের আহার সংগ্রহ ছাড়া আর যতটুকু সময় বাকী থাকিত, মানুষ তাহা যুদ্ধ করিয়াই কাটাইয়া দিত। অসভ্য লোহিত-ইণ্ডিয়ান্-জাতিরা পরস্পরের সঙ্গে প্রতিনিয়ত যুদ্ধই করিত, আর তাহার ফলে তাহাদের মধ্যে কত শাখাজাতি যে লুপ্ত হইয়া যাইত তাহার ইয়ত্তা নাই (৬)। কাফ্রি, নিগ্রো, পলিনেশিয়ান্ প্রভৃতি জাতিদের মধ্যেও ইহার দৃষ্টান্ত ভূরি ভূরি রহিয়াছে।

(৬) Malthus on Population.

অপেক্ষাকৃত সভ্য অবস্থাতেও মানুষের এই জিগীষা-প্রবৃত্তি সমান প্রবল দেখা যায়। প্রাচীন রোমক ও গ্রীকেরা প্রতিবাসী দুর্ব্বল জাতিদের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়াই সময় কাটাইত। প্রাচীন হিব্রু জাতি রোমের সঙ্গে যুদ্ধের ফলেই একপ্রকার ধ্বংস হইয়া গিয়াছিল। ভারতবর্ষে প্রাচীন আর্য্যজাতিরা অনার্য্যদের সঙ্গে যুদ্ধ করাটাই জীবনের একটা প্রধান কার্য্য করিয়া তুলিয়াছিলেন। তাঁহাদের অস্ত্রের মুখে কত অনার্য্যজাতি যে ভারতবর্ষ হইতে লুপ্ত হইয়া গিয়াছে তাহা কে বলিতে পারে। মধ্যযুগের ইউরোপও এক বিপুল সমর-ক্ষেত্র ছিল বলিলে অত্যুক্তি হয় না; আর সেই সমরক্ষেত্রে কত দুর্ব্বল জাতি যে প্রবলের সম্মুখে আত্মবলি দিয়াছে তাহার ইতি-হাস পাঠকের অবিদিত নাই। প্রায় সেই সময়েই ভারতবর্ষে হিন্দু মুসলমান, পাঠান ও মোগল, শিখ, রাজপুত ও মারহাট্টা জাতিতে মিলিয়া শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া রণক্রীড়া করিতেছিল। আধু-নিক কালেও ইউরোপের সভ্যজাতিরা কি নিষ্ঠুরভাবে আমেরিকা ও পলিনেশিয়ার বহু অসভ্য ও বর্ব্বর জাতির তরবারি-মুখে উচ্ছেদ সাধন করিয়াছিল, তাহা ভাবিতেও হৃদকম্প উপস্থিত হয়। আর এই বিংশ শতাব্দীর সভ্যতার উজ্জ্বল বিদ্যুতালোকে, আধুনিক জ্ঞান বিজ্ঞানের লীলাক্ষেত্র ইউরোপ ভূখণ্ডে যে ভীষণ মৃত্যুক্রীড়া চলিতেছে, তাহার পরিণাম যে কোথায় যাইয়া দাঁড়াইবে, তাহা ভাবিয়াও মানবজাতি শিহরিয়া উঠিতেছে।

প্রবল জাতির সঙ্গে দ্বন্দ্ব ও যুদ্ধের ফলে দুর্ব্বল জাতির যে সাক্ষাৎ ধ্বংস ঘটে তাহার দৃষ্টান্ত-বাহুল্যের প্রয়োজন নাই। কিন্তু সাক্ষাৎ ধ্বংস না ঘটিলেও যুদ্ধের অবশ্যম্ভাবী আনুষঙ্গিক ফলে যুধ্যমান জাতিসকলকে যে অনেক স্থলে ক্রমে ক্রমে ধ্বংসের পথে লইয়া যায় তাহাই বর্ত্তমান প্রবন্ধে আমরা বিশেষ করিয়া দেখাইতে চেষ্টা করিব।

যুদ্ধের ফলে মানবজাতির যে কত অনিষ্ট ঘটে তাহা বিবৃত

করিয়া অনেক চিন্তাশীল মহাত্মারা বৃহৎ বৃহৎ গ্রন্থ লিখিয়াছেন। এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে বিস্তৃত আলোচনার স্থানাভাব। সুতরাং আমরা সংক্ষেপে কিছু বলিতে চেষ্টা করিব।

১। আর্থিক :—যুদ্ধের ফলে জাতির যে ঘোরতর আর্থিক ক্ষতি হয়, তাহা সহজেই বুঝা যায়। তাহার বহুযত্নসঞ্চিত, বহুবর্ষের পরিশ্রমলব্ধ, বিপুল ধনসম্পত্তি যুদ্ধের ফলে একনিমিষে নষ্ট হইয়া যায়। বাড়ীঘর প্রাসাদহর্ম্ম্য, গ্রামনগর, শিল্প ও বিদ্যামন্দির প্রভৃতি বহুযুগের জাতীয় সাধনার ফলস্বরূপ কত বস্তু যে ভস্মসাৎ হইয়া যায়, তাহার ইয়ত্তা নাই। যুদ্ধের বিপ্লবে শান্তজীবনের অনেক শৃঙ্খলাতেই উলোটপালট ঘটে, বহুশতাব্দীর পরিশ্রমে চালিত অমূল্য শিল্পবাণিজ্যের ধারা লুপ্ত হইয়া যায়। জীবিকার সকল ব্যবস্থা, ধনোৎপাদনের সকলপ্রকার প্রণালীই যুদ্ধদানবের ধ্বংসদণ্ডের স্পর্শে ছিন্নবিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে। দানবের প্রধান সহচর দুর্ভিক্ষ, জাতীয় ঋণের পতাকা হাতে করিয়া বিজয়গর্ব্বে নৃত্য করিতে থাকে, আর করভারে প্রপীড়িত দুর্ভাগ্য নরনারী সেই ভীষণ দৃশ্য দেখিয়া জীবনে হতাশ ও অবসন্ন হইয়া পড়ে।

২। সামাজিক :—জাতির প্রধান সম্পত্তি মানুষ। যুদ্ধে সেই প্রধান সম্পত্তিই বিশেষরূপে ক্ষয় হয়। পূর্ণবয়স্ক ধনবান্ ও সুস্থ ব্যক্তিরাই প্রধানতঃ যুদ্ধ করিতে যায়। বিদ্বান বুদ্ধিমান্, জ্ঞানী ও মনুষ্যত্বযুক্ত ব্যক্তিরাও দেশের বিপদে স্থির থাকিতে পারে না। ফলে দেশের যাহারা শিরোভূষণ, সমাজের যাহারা মেরুদণ্ড, যুদ্ধে তাহাদেরই পতন হইয়া থাকে। আর তাহার ফলে যে জাতির কত ক্ষতি হয় তাহা বলিবার আবশ্যক নাই। অপর পক্ষে, যুদ্ধে পুরুষেরাই প্রধানতঃ যোগ দেয়; সুতরাং যুদ্ধের ফলে পুরুষের সংখ্যাই কমিয়া যায় ও সমাজে পুরুষের অনুপাতে স্ত্রীলোকের অত্যধিক সংখ্যা বৃদ্ধি হয়। ইহাতে ব্যভিচারের প্রাদুর্ভাব হয়, সঙ্কর জাতির সৃষ্টি হয় ও জারজের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। আর এসকলই জাতীয়

জীবনের পক্ষে বিষস্বরূপ। আবার, যাহারা যুদ্ধ করিতে যায় না, তাহারা প্রায়ই বৃদ্ধ, রুগ্ন, অপরিণত বয়স্ক, ভীরু, কাপুরুষ ও স্বার্থপরের দল। ইহাদের ঔরসে যেসকল সন্তান জন্মে, তাহারা কখনই সুস্থ, বলবান্, মনুষ্যত্বযুক্ত হইতে পারে না; সুতরাং ইহাদের জন্ম জাতির পক্ষে মঙ্গলকর হয় না। যুদ্ধ হইতে যাহারা ফিরিয়া আসে, তাহাদের মধ্যেও অধিকাংশ রুগ্ন, বিকলাঙ্গ ও স্নায়ু-দৌর্ব্বল্যে কাতর হইয়াই আসে। ইহাদের বীজও বিশুদ্ধ হইতে পারে না; কিন্তু সমাজে পুরুষের অল্পতা নিবন্ধন এই সকল ব্যক্তিই বংশবৃদ্ধি করিতে থাকে ও জাতীয় জীবনে দুর্ব্বলতা ও নানারূপ রোগের প্রসারে সাহায্য করে।

৩। নৈতিক:—পূর্ব্বে যাহা বলা হইল, তাহাতেই বুঝা যাইবে যে যুদ্ধের পরে সমাজের মধ্যে নানরূপ ব্যভিচার ও দুর্নীতি বাড়িতে থাকে। গার্হস্থ্য বন্ধন ও পারিবারিক পবিত্রতা কমিয়া যায়। দীর্ঘকালব্যাপী অস্বাভাবিক উদ্বেগ ও তীব্র পরিশ্রমের প্রতিক্রিয়া-রূপে কর্ম্মে উৎসাহ ও একাগ্রতা শিথিল হইয়া পড়ে। বিলাসিতা ও ইন্দ্রিয়পরায়ণতা বৃদ্ধি পাইতে থাকে। এদিকে সমাজের শ্রেষ্ঠ মনীষীদের ক্ষয়ে জাতীয় জীবনে চিন্তাশীলতা ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের হ্রাস হইতে থাকে এবং লোকে ইন্দ্রিয়-ভোগসুখে মত্ত হইয়া জীবনের উচ্চ আদর্শ ভুলিয়া যায়; আর অন্তর্জ্জগতের যে গভীরতা ও অনন্যোন্মুখীনতা ধর্ম্মজীবনের ভিত্তি, সমাজ হইতে তাহা লোপ পাইতে থাকে।

এইরূপে যুদ্ধের আনুষঙ্গিক ফলে, জাতীয় জীবনের যে ক্রমে ক্রমে ধ্বংস হইতে থাকে, ইতিহাসে তাহার দৃষ্টান্তের অভাব নাই। অনেক স্থলে একেবারে ধ্বংস না হইলেও জাতি আর পূর্ব্বের উন্নতাবস্থা ও সভ্যতা ফিরিয়া পায় না; আর ইহাও ধ্বংসেরই নামান্তর। জগজ্জয়ী রোম পৃথিবী জয়ের আকাঙ্ক্ষায় যে বহুবর্ষব্যাপী যুদ্ধ করিয়াছিল, তাহারই শোচনীয় পরিণাম যে তাহার উত্তরকালীন ধ্বংসের ভিত্তি, তাহাতে সন্দেহ নাই। যুদ্ধের যতগুলি ভীষণ ফলের

উল্লেখ পূর্ব্বে করা হইয়াছে, তাহার প্রায় সকলগুলিই রোমকদের জাতীয় জীবনে দেখা গিয়াছিল; এবং এইরূপে রোম যখন দুর্ব্বলতা ও দুর্নীতিপরায়ণতার মধ্যে হাবুডুবু খাইতেছিল, বর্ব্বর গথেরা তখনই আসিয়া তাহাদিগকে অনায়াসেই শৃঙ্খলাবদ্ধ করিতে পারিয়াছিল। গৃহবিবাদ ও আন্তর্জ্জাতিক যুদ্ধই প্রাচীন গ্রীসেরও ধ্বংসের কারণ। দীর্ঘকাল ধরিয়া গ্রীসের বিভিন্ন রাষ্ট্রগুলি পরস্পরের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছিল ও তাহাকে রোমের দাসত্ব স্বীকার করিতে হইয়াছিল। আর তাহার পরে গ্রীস পূর্ব্বের ন্যায় মাথা তুলিয়া দাঁড়াইতে পারে নাই। জ্ঞান বিজ্ঞানের যে ঐশ্বর্য্যে সে জগতকে চমকিত করিয়াছিল, তাহার সে ঐশ্বর্য্য ধীরে ধীরে নষ্ট হইয়া গিয়াছিল। স্বাধীনতা-প্রয়াসী ফ্রান্স উৎসাহমদে ক্ষিপ্ত হইয়া প্রায় অর্দ্ধশতাব্দী ধরিয়া ইউরোপের রণক্ষেত্র যে নর-শোণিতে প্লাবিত করিয়াছিল, তাহার ফল হাড়ে হাড়ে সে বুঝিতে পারিয়াছিল। তাহারই শোচনীয় পরিণামে বিগত শতাব্দীতে সে জার্ম্মাণীর হাতে কারাবন্দী হইয়াছিল। তাহার শিল্প-বাণিজ্যের ধ্বংস হইয়াছিল, লোক-সংখ্যা কমিয়া গিয়াছিল, যে অতুল প্রতাপে সে ইউরোপের শীর্ষস্থানীয় ছিল, তাহার সে অতুল প্রতাপ হ্রাস হইয়া, জগতের সম্মুখে তাহাকে হীন করিয়া দিয়াছিল এখনও তাহার পরিণাম হইতে ফ্রান্স সম্পূর্ণরূপে অব্যাহতি পায় নাই; এখনও লোক-সংখ্যা বৃদ্ধির সমস্যায় তাহাকে মাথা ঘামাইতে হইতেছে। তাহার লোক-সংখ্যা যদি অন্যান্য দেশের ন্যায় স্বাভাবিক ভাবে বৃদ্ধি পাইত, তবে আজ জার্ম্মাণীকে পদানত করিতে তাহার পক্ষে এত দীর্ঘকাল লাগিত না। কুরুক্ষেত্রের ভীষণ যুদ্ধের পর ভারতবর্ষের যে শোচনীয় অবস্থা হইয়াছিল তাহাও এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যাইতে পারে। ঐ যুদ্ধের প্রাক্কালে মহাবীর অর্জ্জুন যে আশঙ্কা করিয়াছিলেন, (৭)

---

(৭) শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা—প্রথম অধ্যায়।

আমরা দেখিতে পাই যে পরবর্ত্তী কালে তাহা বর্ণে বর্ণে সত্য হইয়াছিল। নিঃক্ষত্রিয় ও নির্বীর্য্য ভারতবর্ষে ধর্ম্মরাজ্যের স্থাপন হইয়াছিল সন্দেহ নাই, কিন্তু ভারতীয় আর্য্যসভ্যতার মেরুদণ্ড যে ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল ও ভারতবর্ষ যে আর তাহার পরে পূর্ব্বের ন্যায় মাথা তুলিয়া দাঁড়াইতে পারে নাই, পরবর্ত্তী ইতিহাস তাহাই আমাদিগকে সাক্ষ্য দেয়। আবার দশম শতাব্দী হইতে দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যে ভারতবর্ষের অন্ধকারময় যুগে যে আন্তর্জ্জাতিক যুদ্ধ ও গৃহ-বিবাদ দেশময় চলিতেছিল, তাহার শোচনীয় পরিণামও ভারতবর্ষ হাতে হাতে ভোগ করিয়াছিল। যে কিছু বীর্য্য ও তেজ ভারতবর্ষের ছিল, এই শতাব্দীর পর-শতাব্দী ব্যাপী আন্তর্জ্জাতিক যুদ্ধই তাহা নষ্ট করিয়া দিয়াছিল। আর তাহার ফলে পাঠানদের ভারতাক্রমণ ও অধিকার অতি সহজ হইয়া উঠিয়াছিল। আধুনিক ইউরোপীয় যুদ্ধেও ইতিমধ্যেই বেলজিয়াম ও সার্ভিয়া প্রভৃতির ন্যায় ক্ষুদ্র রাজ্য সকলের যে সমূহ ক্ষতি হইয়াছে, তাহাত সকলেই দেখিতে পাইতেছেন। এইসকল জাতি যুদ্ধের পর আর পূর্ব্বাবস্থা ফিরিয়া পাইবে কিনা, ও পাইলেও কতকাল ধরিয়া যে তাহার জন্য চেষ্টা করিতে হইবে, তাহা কে বলিতে পারে?

শ্রীপ্রফুল্লকুমার সরকার।

পূর্ব্বরাগ

লালসা

১

[নায়িকা পক্ষে]

যে দিন হইতে, দেখেছি তাহারে,
পড়েছি বিষম ফাঁদে।
আর কোন কিছু, দেখে না কি আঁখি,
(সুধু) "ওই, ওই," বলি কাঁদে॥
জাগিয়া দিবসে, দেখি ওই রূপ
দেখি যে স্বপন মাঝে।
পরাণ ভিতরে, কিবা সে বাহিরে,
বুঝি না কোথা বা রাজে॥

কণ্ঠের সে বাণী শ্রবণে পশিয়া
মরমে বিন্ধিয়া গেছে।
তবধরি কাণ, নাহি শোনে আন
(কেবল) ছুটিছে তাহারি পিছে॥
মলয়নিঃস্বনে, মধুপ-গুঞ্জনে,
তটিনীর কলনাদে।
বিহগের গানে, ঘন-বরষণে
কেবলি সে বাণী বাজে॥

অনুকূল বাতে, একটি নিঃশ্বাসে
পাইনু অঙ্গের গন্ধ।

সে-বাসে বিভোর, জানে না এ নাসা,
আর কোন ভালমন্দ ॥
সারাবিশ্ব মাঝে, তাই সুধু খোঁজে
যেমন পাগল-পারা।
কোন্ ফুলবাসে, মজাইছে তারে,
ঢুঁড়িয়া হইছে সারা ॥
প্রতি অঙ্গ মোর, দারুণ তিয়াসে
পুড়িছে তাহারি লাগি।
মিলিবে কি তারে, মিটিবে এ সাধ,
হবে কি এমন ভাগি ॥

২

[নায়ক পক্ষে]

মিছে কেন পুছ মোরে রূপের বাখান।
আমি সুধু এই জানি, হেরি তার মুখখানি,
ছুটে ভাব, টুটে ভাষা, স্তবধ পরাণ ॥

যখনি দেখিতে তারে পেয়েছে এ আঁখি
একই অঙ্গে বান্ধা পড়ি, করিয়াছে জড়াজড়ি,
গতিহীন, শক্তিহীন, তারেই নিরখি ॥

যখনি বরণ দেখি, ভুলি কি গড়ন?
গড়নে নয়ন দিলে, ভুলি যে বরণ!
ভুলে যাই মুখশশি চরণ-কমল দেখি।
ভুলি পয়োধর-শোভা, গ্রীবার বলনী লখি ॥
প্রতি অঙ্গে ডেকে বলে, চেয়ে দেখ মোরে!
কত শোভা, কি বলিব, প্রতি অঙ্গে ঝরে।

কুসুম-কোমল দেহে আঁখি পড়ে যবে,
অনন্ত পরশ কি গো, কেঁপে উঠে তবে!
অমিয়-সিঞ্চিনী বাণী পশিলে এ শ্রবণে,
শ্রুতি বিনা কিছু আর নাহি রহে ভুবনে!
দাঁড়াইলে, কহে বিশ্ব—স্থিরা ভব ধরণী!
চলে যবে, উঠে নৃত্য বিশ্বমাঝে অমনি!
প্রতি অঙ্গ, প্রতি ভঙ্গী, প্রতি ভাব তার,
পূর্ণ করে ব্রহ্মাণ্ডের অমিয়া ভাণ্ডার॥

শ্রীবিপিনচন্দ্র পাল।

বৌদ্ধ-ধর্ম

[১৪]

জাতক ও অবদান।

মানুষ যখন বুদ্ধ হন, যখন তাঁহার দিব্যজ্ঞান হয়, তখন তাঁহার অনেকগুলি অলৌকিক শক্তির উদয় হয়। তাহার মধ্যে পূর্ব্ব-নিবাসের অনুস্মৃতি একটী। তিনি তখন দিব্যচক্ষে দেখিতে পান যে, সৃষ্টির প্রথম হইতে তিনি কতবার জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, কোথায় জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, কি কি কর্ম্ম করিয়াছিলেন, এবং সেই সকল কর্ম্ম দ্বারা তিনি বুদ্ধ হইবার পথে কখন কতদূর অগ্রসর হইয়াছিলেন। আমাদের ভাষায় আমরা বলি তিনি জাতিস্মর হন। যাঁহারা পুনর্জ্জন্ম মানেন না তাঁহাদের মতে জাতিস্মর হওয়ার কথাই উঠিতে পারে না। কিন্তু যাঁহারা মানেন, তাঁহারা পূর্ব্বজন্মে "কি ছিলাম,

কি করিয়াছিলাম” জানিবার জন্য বড়ই ব্যগ্র হন। তাঁহারা মনে করেন, ধ্যান ধারণা যোগ প্রভৃতি উপায় দ্বারা তাঁহারা পূর্ব্ব জন্মের কথা জানিতে পারেন। কেহ এক জন্ম, কেহ দুই জন্ম, কেহ বা দশ জন্ম বিশ জন্ম পর্য্যন্ত স্মরণ করিতে পারেন। পুণ্য কর্ম্ম, তীর্থ পর্য্যটন, যোগযাগ সৎকর্ম্ম করিলে হিন্দুরা মনে করেন দশজন্মার্জ্জিত পাপক্ষয় হয়, কোটী জন্মার্জ্জিত পাপক্ষয় হয়। তাই যাঁহারা পুনর্জ্জন্ম মানেন তাঁহারা এই সকল সৎকর্ম্ম করার জন্য অত্যন্ত ব্যগ্র হইয়া উঠেন।

বুদ্ধ ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান তিনই দেখিতে পাইতেন। সুতরাং তিনি আপনার পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্ম যে স্মরণ করিতে পারিতেন, তাহা আশ্চর্য্য নহে। শাক্যসিংহ বুদ্ধ হইয়া অনেক উপদেশ দিয়াছেন; সেই সকল উপদেশ লোকে যাহাতে সহজে বুঝিতে পারে, তাহার জন্য অনেক সময়ে তিনি আপনার পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মের কথা দিয়া সেগুলি ব্যখা করিয়া দিতেন। এই যে পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মের কথা, ইহার নাম জাতক।

জাতকের প্রাদুর্ভাব হীনযানে, পালিভাষায়, অত্যন্ত অধিক। পালিভাষার গ্রন্থে ৫৫৫টি জাতক আছে; অর্থাৎ বুদ্ধদেব আপনার ৫৫৫টি পূর্ব্বজন্মের কথা লিখিয়া গিয়াছেন। এই যে নম্বর ৫৫৫, ইহা কিন্তু সর্ব্ববাদি সম্মত নহে; কেহ বলেন ৫৫০, কেহ বলেন ৫২৫, কেহ বলেন ৫৩৫, কেহ বলেন ৫১৫। ব্রহ্মদেশে ৫১৫ নম্বরই চলিত, তাহার মধ্যে ১০ খানি বড়-আর ৫০৫ খানি ছোট। সংস্কৃতে একখানি জাতকমালা আছে। সেখানি আর্য্য-শূরের প্রণীত; ইহাতে ৩৪টি মাত্র জাতক আছে। এই সংস্কৃত পুস্তক হীনযানের কি মহাযানের বলিতে পারা যায় না। কেন না, হীনযানের লোকেও সংস্কৃতে লিখিত। বসুবন্ধু যখন হীনযান ছিলেন, তখন তিনি অভিধর্ম্ম কোষ নামে একখানি পুস্তক লিখেন, সেখানি সংস্কৃতে। প্রোফেসর কর্ণ অথবা ভট্টকর্ণ সংস্কৃত জাতকমালা ছাপাইয়াছেন। এই সকল জাতকের

মধ্যে কোন্ কোন্‌টি পালির কোন্ কোন্ নম্বরে পাওয়া যায়, তাহাও তিনি দেখাইয়া দিয়াছেন। ডেনমার্কের প্রোফেসর ফোস্‌বোল পালি-জাতকগুলি ছাপাইয়াছেন। রায় শ্রীযুক্ত ঈশানচন্দ্র ঘোষ সাহেব এই পালিজাতকগুলি বাঙ্গলা করিতেছেন। বুদ্ধদেব কোন্ সময়ে, কোন্ শিষ্যের কথায়, কি উদ্দেশ্যে, এক একটি জাতক বলিয়াছিলেন, তাহা স্পষ্ট করিয়া বুঝাইয়া দিয়া তাহার পর তিনি সেই জাতকটির বাঙ্গলা তর্জ্জমা করিতেছেন।

বুদ্ধদেব যখন নিজে এই গল্পগুলি বলিতেছেন, তখন মনে করিতে হইবে, এই গল্পগুলি তাঁহার পূর্ব্বেও প্রচলিত ছিল। তিনি গল্পগুলি আপনার পূর্ব্বজন্মের গল্প বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। সুতরাং এ গুলি ভারতবর্ষের অতি প্রাচীন সম্পত্তি, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। ইহা হইতে খৃঃ পূঃ ছয় শতকের পূর্ব্বে ভারতবর্ষের রীতি নীতি, আচার, ব্যবহার, মনের ভাব, ধর্ম্মের ভাব, জানিতে পারা যায়।

মহাযানের লোকের কিন্তু, জাতকের উপর তত আস্থা ছিল বলিয়া মনে হয় না। কারণ, এক জাতকমালা ছাড়িয়া দিলে, উহাদের আর জাতকের বই নাই। এই জাতকমালা আবার যখন মহাযানীরা পড়ে, তখন উহার নাম হয়, বোধিসত্ত্বাবদানমালা। রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহাশয় জাতকমালার বা বোধিসত্ত্বাবদানমালার যে বিবরণ দিয়াছেন, তাহা দেখিলে বোধ হয় যে আর্য্যশূরের লেখা এই পুঁথীখানি মহাযানীরা সঙ্গীতির ছাঁচে ঢালিয়া লইয়াছেন এবং মঙ্গলা-চরণের পর উহাতে "এবং ময়া শ্রুতমেকাস্মিন্ সময়ে ভগবান্ শ্রাবস্ত্যাং বিজহার" বলিয়া মুখপাত করিয়াছেন; অর্থাৎ আর্য্যশূরের বহিখানিকে উঁহারা বুদ্ধের বচন করিয়া তুলিয়াছেন। তাঁহারা প্রথমতঃ একটি নূতন জাতক দিয়া আর্য্যশূরের ৩৪টি জাতকের স্থানে ৩৫টি করিয়া লইয়াছেন। আর্য্যশূরের বহির নাম জাতকমালা; মহাযানের বহির নাম বোধিসত্ত্বাবদান, বা, বোধিসত্ত্বাবদানমালা। ইহা দেখিলেই বোধ

হইবে যে মহাযানীয়া জাতক শব্দটা পছন্দ করিতেন না। উঁহারা জাতকের স্থানে অবদান শব্দ ব্যবহার করিতেন। উঁহাদেরও পূর্ব্ব-বর্ত্তী মহাসাঙ্ঘিকের দল, তাঁহারাও জাতকের পরিবর্ত্তে অবদান বলিতেন। মহাসাঙ্ঘিক হইতেই যে মহাযানের উৎপত্তি হইয়াছে, একথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, আরও অনেকেরই এই বিশ্বাস। মহাসাঙ্ঘিকের যে একখানিমাত্র পুস্তক পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে অনেকগুলি জাতকের গল্প আছে, কিন্তু সেগুলির নামও অবদান। অবদান শব্দে সংস্কৃত ভাষায় মহৎকার্য্য বুঝায়। মহাযানের অবদানে শুধু বুদ্ধদেবের পূর্ব্বজন্মের কথা নয়, আরও অনেক মহাপুরুষেরই পূর্ব্বজন্মের কথা আছে। যেমন, অশোকরাজা পূর্ব্বজন্মে কোন বুদ্ধকে একমুষ্টি ধূলা দিয়া তৃপ্ত করিয়াছেন, তাই আর একজন্মে তিনি চক্রবর্ত্তী রাজা হইয়াছিলেন। সুতরাং অবদান শব্দ যতটা ব্যাপক, জাতক শব্দ ততটা নয়। মহাযানে অবদানের অনেক পুস্তক আছে। আর্য্যশূরের অবদানশতকে এইরূপ ১০০টি অবদান আছে। দিব্যাবদানমালায় ৩৭টি অবদান আছে। ভদ্রকল্পাবদানে ৩৫টি জাতক আছে। অশোকাবদান দিব্যাবদানমালার একটি অবদান, গদ্যে লেখা; কিন্তু অশোকাবদান নামে পদ্যে লেখা আরও একটি বৃহৎ অবদান আছে। সুগতজন্মাবদান নামে আমরা আরও একখানি অবদান পাইয়াছি। অবদানের শেষ এবং উৎকৃষ্ট পুস্তক বোধিসত্ত্বাবদান কল্পলতা—এখানি খৃঃ ১১ শতকে কাশ্মীরে ক্ষেমেন্দ্রব্যাসদাস নামে একজন কবির লেখা। তিনি হিন্দু, ব্রাহ্মণ ও একজন উৎকৃষ্ট কবি ছিলেন। তাঁহার একজন স্তুক নামে বৌদ্ধ বন্ধু ছিলেন। ক্ষেমেন্দ্র যখন রামায়ণ, মহাভারত, বৃহৎকথা প্রভৃতি বড় বড় পুস্তকের বিষয় লইয়া রাময়ণ-মঞ্জরী, ভারতমঞ্জরী, বৃহৎকথামঞ্জরী প্রভৃতি কাব্য লিখিয়া খুব প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিলেন, তখন স্তুক একদিন আসিয়া বলিলেন, আমাদের অবদানগুলি বড় কট্‌মট ভাষায় লেখা, কতক গদ্য, কতক পদ, কোনটাই সুবোধ নয়। তুমি যদি তোমার ভাষায় এইগুলি

কাব্যাকারে লিখিয়া দাও, তবে আমাদের ধর্ম্মের বড় উপকার হয়। তাই ক্ষেমেন্দ্র বোধিসত্ত্বাবদান রচনা করেন। ইহাতে ১০৮টি অবদান আছে। ইহার পূরা পুঁথী বড়ই দুস্প্রাপ্য। এসিয়াটিক সোসাইটির পুঁথীতে ৫১—১০৮ পর্য্যন্ত অবদান আছে; কেম্ব্রিজের পুঁথিতে ৪১—১০৮ অবদান আছে, শ্রীযুক্ত রায় বাহাদুর শরচ্চন্দ্র দাস মহাশয় তিব্বত হইতে একখানি পুঁথী আনাইয়াছেন, তাহাতে ১—৪৯টি অবদান আছে। তিনি পুঁথীখানি ছাপাইতেছেন, ডানপাতে সংস্কৃত বামপাতে ভুটিয়া ভাষায় তাহার তর্জ্জমা। তিনি ইহার বাঙ্গলাও করিতেছেন।

আমরা একটি জাতক ও একটি অবদান পাঠকগণকে উপহার দিতেছি। ১। আর্য্যশূরের জাতকমালার প্রথম ব্যাঘ্রী জাতক। ২। মহাবস্তু অবদানের পুণ্যবস্তু ও তাঁহার বন্ধুদিগের অবদান।

১।

এক সময়ে বুদ্ধদেব কোন ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। কল্পসূত্র অনুসারে তাঁহার জাতকর্ম্মাদি সংস্কার হইয়াছিল। তিনি অত্যন্ত মেধাবী, কৌতূহলী ও অনলস ছিলেন। সেই জন্য তিনি অল্পদিনের মধ্যেই অষ্টাদশ বিদ্যায় পারদর্শী হইয়াছিলেন এবং ব্রাহ্মণেরা যে সব কলা শিক্ষা করিতে পারেন, সে সকল কলাতেও তিনি ব্যুৎপন্ন হইয়াছিলেন। তাঁহার পসার প্রতিপত্তিও খুব ছিল। কিন্তু গার্হস্থ্যে তাঁহার মন উঠিল না। তিনি প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিলেন। তিনি সন্ন্যাসী হইয়াছেন শুনিয়া, যাঁহারা তাঁহাকে ভালবাসিতেন, তাঁহারাও সন্ন্যাসী হইলেন। অজিত তাঁহার প্রধান শিষ্য হইল। তিনি পাহাড়পর্ব্বত, বনজঙ্গলে ভ্রমণ করিতে বড়ই ভাল বাসিতেন; অজিত সর্ব্বদাই তাঁহার সঙ্গে থাকিত। একদিন তিনি পর্ব্বতের গুহায় এক বাঘিনী দেখিলেন। সে এইমাত্র সন্তান প্রসব করিয়াছে, অত্যন্ত দুর্ব্বল, ক্ষুধায় কাতর, সতৃষ্ণ নয়নে বাচ্ছার দিকে চাহিতেছে।

ব্রাহ্মণপুত্র দেখিলেন বাঘিণী ক্ষুধায় এত কাতর যে, সে বাচ্ছাটিও খাইতে চায়। করুণার সাগর সন্ন্যাসী শিষ্যকে বলিলেন—বাঘিণী দেখিতেছি ক্ষুধায় বাচ্ছাটি খাইয়া ফেলিবে, তুমি অনুসন্ধান করিয়া যদি উহাকে কোন খাবার আনিয়া দাও, তবে বড়ই ভাল হয়। শিষ্য চলিয়া গেলে, সন্ন্যাসী ভাবিলেন,—আমার এ ছার দেহে কি কাজ? আমি ইহার আহার হইনা কেন? এই ভাবিয়া তিনি এক উচা জায়গা হইতে বাঘিণীর সম্মুখে পড়িয়া দেহ ত্যাগ করিলেন। বাঘিণীও আনন্দের সহিত তাঁহার দেহ ভক্ষণ করিতে লাগিল। শিষ্য আসিয়া দেখিল, তাঁহার গুরু বাঘিণীর জন্য দেহত্যাগ করিয়াছেন। সে আর আর শিষ্যদের এই কথা বলিল। সকলেই মনে করিল, ইনি কোন না কোন জন্মে বুদ্ধ হইবেন।

২।

কোন জন্মে ভগবান্ বারাণসীর রাজা অঞ্জনের পুত্র হইয়াছিলেন। তাঁহার নাম হইয়াছিল পুণ্যবন্ত। তাঁহার চারিজন বন্ধু ছিল। তাঁহাদের নাম বীর্য্যবন্ত, শিল্পবন্ত, রূপবন্ত, ও প্রজ্ঞাবন্ত। তাঁহাদের কাহার কি গুণ ছিল, তাহা নামেই প্রকাশ। একবার পাঁচ বন্ধুতে মিলিয়া আপনাদের গুণপরীক্ষার জন্য কাম্পিল্ল যাত্রা করিলেন। পথে তাঁহারা দেখিলেন, গঙ্গায় প্রকাণ্ড এক বাহাদুরী কাঠ ভাসিয়া যাইতেছে,—দেখিয়াই বীর্য্যবন্ত জলে ঝাঁপ দিয়া পড়িলেন ও কাঠ ডাঙ্গায় তুলিলেন। পরীক্ষায় জানিলেন এটা চন্দনের কাঠ—বিক্রয় করিয়া অনেক টাকাকড়ি পাইলেন ও পাঁচজনে টাকা ভাগ করিয়া লইয়া অনেক আমোদ আহ্লাদ করিলেন।

শিল্পবন্ত একদিন এক নগরের প্রান্তে বসিয়া বীণা বাজাইতেছিলেন। বীণায় সাতটি তন্ত্রী ছিল। বীণার ঝঙ্কারে সমস্ত লোক মুগ্ধ হইয়া ঝাঁকিয়া পড়িল। এরূপ বীণা তাহারা আর কখনও শুনে নাই। বাজাইতে বাজাইতে বীণার একটা তার ছিঁড়িয়া গেল।

কিন্তু সে এমনি কলাবৎ, ছয় তারেই সাত তারের মত বাজাইতে লাগিল। ক্রমে আরও একতার ছিঁড়িল। তাহাতেও বাজনার কোন ব্যতিক্রম হইল না; ক্রমে চার তার, তিন তার, দুই তার, শেষে এক তারে দাঁড়াইল। তখনও সপ্ততন্ত্রী বীণার ঝঙ্কার হইতেছে। নগরের লোক তাঁহাকে অনেক টাকা পুরস্কার দিল।

রূপবন্তের রূপ দেখিয়া নগরের এক বেশ্যা মুগ্ধ হইয়া গেল এবং তাঁহার কথায় তাঁহার বন্ধুগণকে অনেক টাকাকড়ী দিল।

এইবার প্রজ্ঞাবন্তের পালা। তিনি একদিন বাজারে গিয়া দেখিলেন, এক শেঠের ছেলে এক বেশ্যার সহিত ঝগড়া করিতেছে। ঝগড়ার বিষয় একলক্ষ টাকা। শেঠের ছেলে বেশ্যাটিকে আগের রাত্রিতে ডাকাইয়া পাঠাইয়াছিল ও একলক্ষ টাকা দিতে স্বীকার হইয়াছিল। বেশ্যার অন্য লোকের বাড়ী যাইবার কড়ার ছিল, সে সে রাত্রিতে যাইতে পারিল না। সে পরদিন সকালে আসিয়া উপস্থিত হইল। শেঠ বলিল তোমায় আমার আর কাজ নাই। রাত্রে স্বপ্নে আমি তোমায় পাইয়াছিলাম, আমার কাজ হইয়া গিয়াছে। সে বলিল যদি স্বপ্নে আমায় পাইয়াছিলে, তবে আমার টাকাটি দাও। এঝগড়ার আর মীমাংসা হয় না। দুই দলেই লোক জুটিয়া গেল। শেষে প্রজ্ঞাবন্ত আসিয়া মধ্যস্থ হইলেন। শেঠকে বলিলেন, তুমি এখনই টাকা লইয়া আইস। সে টাকা আনিয়া সম্মুখে রাখিল। প্রজ্ঞাবন্ত বলিলেন—একখানি বড় আর্শী লইয়া আইস। আর্শী আনিলে, তিনি বেশ্যাকে বলিলেন—"তুমি ঐ আর্শীর ভিতর হইতে টাকা লও। শেঠজী স্বপ্নে তোমার ছায়ামাত্র পাইয়াছিলেন, তুমিও টাকার ছায়া লও, আসল টাকায় তুমি কি করিয়া হাত দিবে?" বেশ্যার মুখ চুণ। মহানন্দে শেঠ সমস্ত টাকা প্রজ্ঞাবন্তকে পুরস্কার দিল, পাঁচ বন্ধুতে টাকা ভাগ করিয়া লইয়া খুব আমোদ-প্রমোদ করিলেন।

পুণ্যবন্ত এক রাজবাড়ীর সমুখে একদিন বসিয়া আছেন। এমন

সময় মন্ত্রিপুত্র সেখানে উপস্থিত হইলেন। তিনি পুণ্যবন্তের পুণ্য-জ্যোতিতে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে রাজবাড়ীর ভিতর লইয়া গেলেন এবং উহারই এক অংশে তাঁহাকে থাকিতে দিলেন। রাত্রিতে পুণ্যবন্ত ঘুমাইয়া আছেন, রাজকন্যা আসিয়া তাঁহার সেবা করিতেছেন। এই ব্যাপার দেখিয়া রক্ষকগণ পুণ্যবন্তকে লইয়া রাজার নিকট উপস্থিত করিল। রাজা অনুসন্ধানে জানিলেন পুণ্যবন্তের কোন দোষই নাই। তিনি কাশীরাজের পুত্র জানিয়া, রাজা মহাশয় তাঁহাকে কন্যা সম্প্রদান করিলেন ও রাজ্যের উত্তরাধিকারী করিলেন।

এই পুণ্যবন্তই বুদ্ধদেব, বীর্য্যবন্ত তাঁহার শিষ্য শোনক, শিল্পবন্ত, রাষ্ট্রপাল, রূপবন্ত সুরেন্দ্র ও প্রজ্ঞাবন্ত শারিপুত্র।

শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী।

জীবন্মুক্ত

(কথা-নাট্য)

পুষ্পের কজ্জলে লেখা ছিন্ন ভূর্জ্জপাতা
হের মুক্তি লেখা তায় পড়ে হেথা সেথা!

প্রথম দৃশ্য।

[বিজয়নগরের প্রাসাদ মধ্যে কৃষ্ণরায়ের প্রমোদ উদ্যান, সম্মুখে কৃত্রিম হ্রদ, হ্রদতীরে নিকুঞ্জবাটীকা, গুচ্ছ গুচ্ছ কামিনী বকুল নাগকেশর ও স্বর্ণ চম্পকের সুগন্ধে বাতাস মোদিত, দূরে পর্ব্বতশ্রেণী ধূসর, অর্দ্ধনিমজ্জিত সন্ধ্যাসূর্য্যের আরক্ত আভা মিলাইয়া আসিতেছে... বিরাটশীর্ষ শিরীষ বৃক্ষ হইতে ফুল ঝরিয়া পড়িতেছে, হ্রদের স্বচ্ছ

জলে নীল ধূসর পাটলচ্ছবি মেঘ তরঙ্গভঙ্গে দুলিয়া উঠিতেছে... মরালশ্রেণী চঞ্চু হইতে জলধারা ছুঁড়িয়া ছিটাইয়া দিতেছে, আবার ডুবিতেছে, আর যেখানে মেঘচ্ছায়া আরক্ত সুবর্ণ অঙ্কিত, জল-চ্ছায়ার সেই বর্ণতরঙ্গ তাহাদের জলক্রীড়ায় ভাঙিয়া ছড়াইয়া পড়িতেছে...তীর নিকটে জলাঘাসের উপর শেষ আলোকের রক্ত-পীতাভা ঝলকিয়া উঠিতেছে, সেই ঘাসের পাতায় বসিয়া প্রজাপতি পাখা নাড়িতেছে, তার সুবর্ণমণ্ডিত পাখার সূক্ষ্ম ধারে সূর্য্যকিরণ ঠিকরিয়া উঠিতেছে...বাতাসভরে হাওয়ার তালে ঘাসের পাতার সঙ্গে সঙ্গে দুলিয়া উঠিতেছে, হ্রদের চারিধারে সবুজ আঙিনা ঢালু, তাহাতে যেন কে ফুল ছিটাইয়া দিয়াছে...পার্শ্বে বহুদূর বিস্তৃত গোলাপ-কানন...ফুলে মুকুলে ভরিয়া আছে, আর মৃদুল বাতাসে এ পাশে ও পাশে হেলিয়া দুলিয়া কুঁড়ি মুখে করিয়া হাসিতেছে... কৃষ্ণরায়ের ক্রীতদাস রাঙিয়া বৃক্ষমূলে জলসেচন করিতে করিতে একটা গোলাপের গাছের ডালে উর্ণনাভ দুলিয়া দুলিয়া জাল বুনিতে-ছিল, তাহার অস্ফুট কুঁড়িকে ঘেরিয়া লুতা তাহার জালের সুতার বুনানি টানিতেছিল, রাঙিয়া হাসিতে হাসিতে সেই জাল ছিঁড়িয়া দিল...আপন মনে কি কহিতে লাগিল...আর দূরে শ্যামা গোলাপ গাছের বুকে দুলিতে দুলিতে কি বলিতেছিল...]

রাঙিয়া। গুল গুল পিয়া! পিয়া! ও সখি! ফোট্ ফোট্... গুল গুল গোলাপ! ওই শোন্ শ্যামা কি বলে...পিয়া! পিয়া! গুল গুল! ও সখি ফোট্ ফোট্...এই যে ফোটে-ফোট, ডাক শুনছ আর ধীরে ধীরে পাপ্‌ড়ি মেলছ, আর রূপ ছাপা যাচ্ছে না...বাঃ, বাঃ কিন্তু কার জন্যে? বলি কার জন্যে এ রূপের ঢেউ পাপ্‌ড়িতে রাঙিয়ে তুলছ, আপনি আপনি?...না কার' জন্যে...ব্যথার কাঁটা ফোটাচ্ছ, আর রাঙিয়ে তুলছ...আপ্‌নি আপ্‌নিই...না রাঙিয়া তোমার রঙের ঝোঁকে বুঝি কি বেভুল বকছে...

ওই যে শ্যামা কি বলছে শুনছ...পিয়া! পিয়া! গুল গুল...ও সখি ফোট্ ফোট্..কিন্তু গোলাপ! ওই সূর্য্যি ডুব্‌ল আঁধার ত ছেয়ে আসছে, তারপর? তারপর ভোর না হ'তে হ'তে তোমার ফুলজন্মের ঘোর ত কেটে যাবে, কাল সকালে ত ওই বিলাস কুঞ্জের ফুলের পাত্রে গিয়ে বিরাজ করবে, কার জন্যে, কার' পূজোর জন্যে? হ্যাঁ... রূপের পূজো...না বিলাসের কার? কার?...কেনই এ ফোটা, আর কেনই এ কাঁটা...ওই যে শ্যামা কি বলে না, গুল গুল পিয়া! পিয়া! ও সখি ফোট্ ফোট্... গুল গুল...কেবল ফোটা...কেবলই ফোটা? কে ফুট্‌ছে গুল! তুমি না আমি? না কার' মুখের ছাঁচ্ মাটির ভেতর দিয়ে আপনি আপনিই ফুটে উঠ্‌ছে...ওই যে শ্যামা কি বলে না...বলি এত যে তোমার গোড়ায় এই জল ঢালা আর এই প্রাণ ঢালা, আর এই দিন রাত্তির ধরে তোয়াজ আর খেজমুতি,...কেবলই ওই ফোটা...শুধু ফুট্‌ছ, আর ফুট্‌ছি, গুল গুল পিয়া! পিয়া! তুমি ফোট ঝর...শ্যামার বুকে কাঁটা ফুটিয়ে প্রাণ মাতান সুর শোন আর ফোট, ঝর...তায় দুঃখ কি...ফোট ফোট তা বেশ, তা তা বেশ,...এ দুনিয়ায় ত' চাঁদের দাম মেলে না, দাম আছে চাঁদির...তা বেশ...রূপ বেচ, সুর কেন...তা বেশ, তা যত রূপ যত সুর সবই কি ওই সম্রাটের একলার না দুনিয়ার ও ভাগ আছে...আমি যে জন্মটা ধরে রূপের দোরে প্রাণটা বিকলেম, তার কি হোল বল...কিছু না ...হারে দুনিয়াদার!...দুনিয়াদারীটা বেশ...না? দেওয়া আর নেওয়া...এই কি দুনিয়াদারী...না হাতে গড়া প্রাণ তোমারই হাতধরা...

(সন্ধ্যার ধূসর ছায়া তখন ঘনাইয়া আসিতেছিল, হ্রদতীরে রাজ-

হংসগণ ডাকিতেছিল, মৃদুল বাতাসে হ্রদের কমল বন থাকিয়া থাকিয়া কাঁপিয়া উঠিতেছিল...ঊর্দ্ধে আকাশতলে বলাকার পাঁতি শ্রেণীবদ্ধ মালিকার ন্যায় দুলিতে দুলিতে ভাসিয়া যাইতেছিল...কৃষ্ণরায়ের ক্রীত দাসী পিয়ারা বীণা বাজাইতে গান করিতে করিতে সেই স্থানে আসিল...পিয়ারা তন্বী, নীলাম্বরে তাহার যৌবনকে আঁটিয়া রাখিতে পারিতেছে না...পার্শ্বে তিলকফুলের মঞ্জরী হইতে পুষ্পরেণুকণা উড়িয়া তাহার মুখে পড়িতে লাগিল...রাঙিয়া তখন বৃক্ষমূলে জলসেচন করিতেছিল...সে যেন পিয়ারাকে দেখিয়াও দেখিল না। পিয়ারা গাইতেছিল...)

প্রাণ কি কার হাতধরা
যে ধর্‌তে পারে ধরি তারে
আপ্‌নি সেধে দিই ধরা!

রাঙিয়া। (স্বগতঃ) ধরা ধরি চলেছে বটে...

(পিয়ারা বীণার তারে সজোরে মূর্চ্ছনা দিয়া তান তুলিল, আবার গাইল...)

যে সোহাগ জানে না
প্রাণের দরদ করে না;
রসের কথা কইতে গেলে, কানে তোলে না—
পোড়া মনত সরে না...
অরসিকের প্রাণ নিয়ে কি চলে কার' ঘর করা
তার লাগলে বাতাস, শুধুই হুতাশ,
হয় শেষে দিশেহারা।

রাঙিয়া। (স্বগতঃ) শুধু ঘর আর বার...

(রাঙিয়া একটু হাসিয়া আবার গাছের গোড়ায় জল ঢালিতে লাগিল...একটা পাপিয়া ঝঙ্কার করিয়া উঠিল...পিয়ারা আবার গাইল...

যে সোহাগ জানে না,
প্রাণের দরদ করে না...
পোড়া মনত সরে না...

(পাপিয়া উড়িয়া উড়িয়া সেই সুর শুনিয়া ডাকিতে ডাকিতে এ বৃক্ষ হইতে ও বৃক্ষে গিয়া বসিতে লাগিল, পিয়ারা চুপ করিয়া সেই পাপিয়ার পানে চাহিয়া দেখিতে লাগিল...সন্ধ্যাসূর্য্যের নিভ-নিভ আলোর রেখা তাহার মুখের উপর পড়িয়াছে...পাপিয়া আবার ডাকিয়া উঠিল...রাঙিয়া একবার করিয়া গোলাপ কুঁড়ির পানে চায়, আর একবার পিয়ারার মুখের পানে অলক্ষিতে চায়...

(দূরে গোলাপকুঞ্জে শ্যামা ডাকিয়া উঠিল। গুল্ গুল্ পিয়া পিয়া ও সখি ফোট্ ফোট্)

পিয়ারা। কি রাঙিয়া, রাঙিয়া কি বোলি বোলে পাপিয়া...

(রাঙিয়া যেন তাহা শুনিয়াও শুনিল না...পিয়ারা ঠোঁট ফুলাইযা সরিয়া একটা গোলাপ কুঁড়ির কাছে দাঁড়াইয়া তাহার পানে চাহিয়া···সুর করিয়া কথা কহিতে লাগিল

চাও চাও, বদন তোল
নয়ন খোল,
কওনা কথা মন খুলে,
ও মানিনী মান রাখ তুলে..
ওগো সরম ভাঙ মরম রাখ
রাঙিয়ে কেন রও ভুলে—
তুমি কওনা কথা মুখ তুলে
আমি অধর ধরে চুমু দেব,
উঠ্‌বি ফুটে সব ভুলে...
বলি কওনা কথা মন খুলে...
ওলো এত গরব তোর
আপন মনে আপনি বিভোল
রূপের নেশায় ভোর—
না ফোটায় যে তোরে

হ'য়ে তার গরবে গরবিনী
মরিস্ গুমরে
ওলো দেখিস্ দেখিস্, সাম্‌লে থাকিস্
ফুটে যখন পড়্‌বি ঝরে...
কিগো! কথা কবেই না মুলে...
শুধু কুঁড়ির ভেতর বন্ধ করে,
গন্ধ রাখ্‌বে সব তুলে,
তুমি চাওনা ফিরে চোখ তুলে...

* * * *

বীণা! বীণা! আর কেন তোর
তারের ঝঞ্ঝনা
ও গোলাপ কথা কবে না লো কবেনা...

রাভিয়া। না না—ভুল ভুল...সব ভুল...
ফুলের কুঁড়ি আপনি ফোটে
আপন সুখে আপনি লোটে,...
অ্যাঁ...আ...না-না সব ভুল...কার ফুল, কার ভুল...

পিয়ারা। ভুল ভুলুয়া রে...
এতদিনের ভুলের লেখা
মুছলে কি করে?

রাভিয়া। জলের ঢেউ জলেই মরে
ফুট্‌লে ফুল আপ্‌নি ঝরে
তায় চিনব কি করে...

পিয়ারা। চিন্‌তে পারলে না, বঁধু চিন্‌তে পারলে না,
ঝেলাম নদী পেরিয়ে এলাম
তবু, সেলাম নিলে না
এখন গেলাম, মলাম, হায়রে গোলাম
প্রাণ যে বাঁচে না

জলের ঢেউ মরে জলে
দাগত মরে না...
রাঙিয়া। উড়িয়ে দিয়ে ধূলো বালি
ঝড়ের তুলি বুলিয়ে যায়
মেঘ সে বলে আঁধার রেখায়
সকল লেখাই মুছে যায়...
পিয়ারা। বটে, কোন গহনের পাতায় পাতায়
রঙিন লেখা জড়িয়ে সেথায়
হেথায় এসে গোলাপ কাঁটায়
ফুট্‌ছে কি ব্যথা!
তাই বেরোয় নাক কথা—
চিন্‌বে কি মোর মাথা,
যদি হৃদয় গহন কর্‌তে গাহন
বুঝতে সে ব্যথা
রাঙিয়া। সেত ছেঁড়া ভুর্জ্জির পাতা
তায় ফুলের কাজল মাখিয়ে পাগ
লিখ্‌ছে ভুলের খাতা...
তার নেইক ফুল নেইক মূল
গোড়ায় গলদ তার
আধেক রাতে ছটাক স্বপন
সত্যি হয় সে কার?
পিয়ারা। সত্যি যখন হয়না তখন
তুমি খালাস তা হলে
স্বপোন যত করছি রোপণ
পোড়া মনকে ছলে...
বলি ভাবের ঘরে চুরি কি চলে?...
ফুলের চাষে দিয়েছ মন

ফুলত সে আর নাই
এখন কুল হারিয়ে ভুলের ঘোরে
চিন্‌বে কারে ছাই
তোমার বলিহারি যাই...

রাঙিয়া। হাহা পিয়ারা, পিয়ারা,
তুল্‌ছ কথার ফোয়ারা...
তোমার দোয়ার মেলে না
রসে ধোয়া মনটী তোমার
গাইতেছে স্বর নানা—
মূকের মতন দেখে স্বপোন
কেমন বল্‌তে পারি না...
এখন মাটি কাটি, জল ঢালি
দেখ্‌ছ আমার সবই খালি...

পিয়ারা। পোড়া চোখে তোমার পড়ুক বালি
বলি গোলাপ সনে অতেক আলাপ
তায় প্রলাপ কাটে না
কেবল আমার বেলায় হও সে বোবা
কথা জোয়ায় না...
মন যে বোঝে না
নইলে কি আর আনাগোনা,
তুমিত বেশ আছ সুখে
আমি যে বাঁচি না..

রাঙিয়া। মন নিয়ে যে করে ঘর
তার পেছনে কেবল ধর্‌ ধর্‌
মনের জালে বেঁধে মন
করছ কেবল ওড়ন পাড়ন
মনের বুনন্‌ থামে না—

নিজের জালে জড়িয়ে নিজের
মরণ কামনা...
পিয়ারা। মরা ত হয় না
মনত মানে না—
তোমার কি মনে পড়ে না লো
শুধু কি দিন এল, আর গেল
আঙুর গাছের তলায় তলায়
ছেলে বেলায় হেলায় খেলায়
দুহাতে ধরে মু'খানি তুলে
চুমুটী যখন খেয়েছ লো
সে দিন মনে পড়ে না লো...
ভোর না হতে তুলতে ফুল,
এলিয়ে দিতে মাথার চুল,
নির্ঝর ঝর ঝরত ফুল
আমার কাল কেশে,
শুকতারাটা দেখত হেসে ভেসে,
উঠত অরুণ ফুট্‌ত ফুল
তোমার ভুল কি আমার ভুল
ঠাউরেছ বেশ শেষে,
দোদুল দুল আঙুর দুলে
কে সে দিত মুখে তুলে—
ঝর্ঝর ঝর শুকনো পাতা
পড়ত আমার কেশে
কথায় কথায় দিন ফুরাত
সকাল হোত বিকাল হোত
সাঁঝ হলে কে লুকিয়ে যেত হেসে
শুকতারা সে ফিরে দেখত হেসে...

দিনের পরে গেছে দিন
রাতের পরে ভোর গো
সোহাগ পাখী গাইত চুপে
আমার বুকে কার গো
এখন কৃষ্ণ রায়ের কাননে এসে
মন মজেছে ফুলের রসে
ফুল বদলে পেয়ে ও ফুল
সকল ভুলে ডুবেছ গো...
এখন মনে পড়বে কেন বল
শুধু মেজে ঘসে সং সাজা মোর হোল...

বাউরা। হুঁ...হুঁ...পিয়ারা! পিয়ারা! ও ধারের গাছ গুলো সব আছে বাকী, ও শুধু আঁখি ঠেরে মনকে ফাঁকি,

তোমার এখন সাজের দিন
আমার এখন কাযের দিন
পিয়ারা। কায! কায! কায!
তোমার মাথায় পড়ুক বাজ
জনম ভোর যে ক্রীতদাস
তার আছে শুধু পাঁশ
গলায় জোটে না ফাঁস?
তোমার আবার কিসের কায
প'রে পরের সাজ, নাচ্চ বাঁদর নাচ
আহা কি সাজই সেজেছ—
ভুলে ঝেলাম, বাজাও সেলাম
এখন গোলাম বনেছ
খুঁড়ছ মাটি, ঢালছ জল
ফুটছে ফুল, ধরছে ফল

ভায় তোমার কি হোল
বেল পাকলে কাকের কি বল ?

রাঙিয়া। কিছু না এই কোটে, ঝরে পাকে পড়ে
বাতাস বয় পাতা নড়ে
সূয্যি ওঠে, সূয্যি ডোবে...

(রাঙিয়া অন্যমনস্ক হইয়া অগ্রসর হইল)

পিয়ারা। বলি শোনই না,
শুনতেও কি মানা...

রাঙিয়া। উঁহু না-না যে কেনা তার সব মানা, তার চোখ না,
কান না, হাত না, পা না, তার চেনাও না !...

পিয়ারা। বলি মন যে মানে না ..
এ খেলা কি আর ভাঙে না
কেনই এত লুকোচুরি
কেনই এত ধরাধরি
প্রাণ যে বাঁচে না
নইলে কে বলে বল না...

(গোলাপকুঞ্জ কাঁপাইয়া শ্যামা তীব্র উচ্চ কণ্ঠে ডাকিয়া উঠিল)

রাঙিয়া ! রাঙিয়া ! কি বোলি বোলে পাপিয়া !
তাও কি জান না...

রাঙিয়া। (হাসিয়া) শুল শুল...পিয়া ! পিয়া ! ও সখি কোট্
কোট্...

(রাঙিয়ার প্রস্থান)

(তখন পূর্ব্বদিক আলোকে প্লাবিত করিয়া চন্দ্র উদয় হইল.
সেই জ্যোৎস্নালোকে শ্যামা পাপিয়া বুলবুল গাহিয়া উঠিল, ঝির
ঝির করিয়া বাতাস বহিতে বহিতে লাগিল, পিয়ারা সেই মর্ম্মর

প্রস্তর নির্ম্মিত আসনে বসিয়া বীণায় ঝঙ্কারে কণ্ঠ খুলিয়া গাহিতে লাগিল...)

কে বেসেছে আমায় ভাল
বলব নাক' তা
কে হেসে কাঁদায়ে গেল
চোখের জলে আঃ...
ফুল সে ফোটে বনে বনে
চেয়ে চেয়ে সেদিন গোণে
ঝরে পড়ে চরণ তলে
কেমন সুখে আঃ
আমি ফুটব ফুটে ঝরব পায়ে
তেম্‌নি সুখে আঃ
হাওয়ায় ভেসে ভেসে যাব
কেউ দেখ্‌বে নাক' তা—
আমি বলব নাক' তা...
কেউ জানবে নাক' তা...
কেমন সুখে আঃ...

(পিয়ারার গানে আর পাখীর তানে কানন মুখরিত হইয়া উঠিল, পিয়ারা আবার বীণায় ঝঙ্কার দিয়া উঠিল, পাপিয়া শ্যামাও তান তুলিতে লাগিল।...

পাখী লো এ জ্যোৎস্না হাসি
সোহাগ বাঁশী কে বাজায়
কে তোরে দেয়লো ভরে,
এমন সুরে, কেবা গায়
যদি তোর মত সোহাগ পাখা পাই
হাওয়ায় হাওয়ায় যাইলো উড়ে
চাঁদের চুমু খাই
মেঘেরে করি কোলে দুলে দুলে
স্বপন আঁকি এ জ্যোৎস্নায়

কার দেখা সে পেয়ে একা তাই
উধাও উধাও প্রাণ খুলে গাও
শুনে ভেসে যাই
টুটে এ স্বপন-কারা, আপন হারা,
কেমন ধারা সে কোথায়।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

অন্তঃপুর রাজোদ্যানমাঝে রাজ্ঞী মধুমালতী, চন্দ্রকরোজ্জ্বল নিশীথে অনন্যমনে বসিয়া,...দূরে তুঙ্গাভদ্রা নদীতে পূর্ণচন্দ্র-করে তরঙ্গশীর্ষ ফেনমুখ ও উজ্জ্বল।...রাজ্ঞী প্রস্তর আসনে বসিয়া চাঁদের পানে চাহিয়া রহিয়াছেন। পিয়ারার গানের দূরশ্রুত অস্পষ্ট সুর তাঁহার কানে ধ্বনিত হইতেছিল।

মধুমালতী। সবইত পদতলে, সবইত আছে...

এ ধরায়—নারী যাহা চায়, বিপুল এ
রত্নরাশি, মণিময়হর্ম্ম্যতল, দাস
দাসী রজত কাঞ্চন, সাগর মথিত
এই দীপ্ত শুক্তিচয়, পুষ্পবাস স্নিগ্ধ
চন্দ্রালোক, অভাব কিছুই নাই, আমি
রাণী, লক্ষ লক্ষ নরনারী উচ্চকণ্ঠে
গায় জয়ধ্বনি, সব সুখ কহে তারা
আমারি সে দান, তাহাদের দুঃখসুখ
লয়ে অবিরাম করি খেলা, ভাঙি গড়ি
পলকে প্রলয়, কপালের লিখা আমা
হতে মুছে যায়, আমা হতে ফুটে, আমি
সে অদৃষ্ট তার, কটাক্ষ ইঙ্গিতে মম

জীবন মরণ যেন নাচে তালে তালে
কিন্তু নিজের এ সুখদুঃখ লয়ে, নিজে
মরি আপন বাঁধনে, অদৃষ্টের লেখা
পারিনা মুছিতে মোর...রাণা আমি...রাণী
পদে পৃথ্বী শিরে চন্দ্রাতপ, লক্ষ্মীরূপা
আমি রাণী বিজয়নগরে—আমি রাণী...
দীনহীন পর্ণাবাসে যে অতুল সুখ
অযত্নে হেলায় পুষ্পসম উঠে ফুটে,
যদি সেটুকুও মিলিত আমার...রাণী
আমি...রাজকন্যা জন্মিলাম রাজপুরী
মাঝে, শিখিলাম, কত বিদ্যা, কত শ্লোক
কত রমণীয় গাথা, কত সুখে গেল
সে শৈশব, তারপর একদিন দুঃখ
দিল দেখা, হইলাম সম্রাট মহিষী...
তখন' সে বুঝি নাই, দুঃখ কিবা, সেই
আলোক উজ্জ্বল নিশিথিনী পুষ্পহারে
সঙ্গীতের মূর্চ্ছনায় সেই পৌরজন
কলকণ্ঠ-ভাষে উন্মাদ নিশির সনে
সুখোন্মাদ প্রাণ, আঁখিভরি হেরেছিল
মুখ, তারপর দিগ্বিজয়, তারপর রাজ
কার্য্য, তারপর শাস্ত্রালাপ, তারপর
ধর্ম্ম আলোচনা, যাগ যজ্ঞ, তারপর
আমি,...যদি কভু মনে পড়ে, তৃষিতা এ
চাতকীর মত সেই স্বাতি নক্ষত্রের
বারি-বিন্দু তরে হায়, রয়েছি উন্মুখ,
শুষ্ক প্রাণ জল বিনা মীনসম মরে,
অদৃষ্ট যে গড়ে এই সে অদৃষ্ট তার...

(কৃষ্ণরায়ের প্রবেশ)

(স্বগতঃ)...সম্মুখে যবন

চমু, ঘিরি ঘিরি পাকে পাকে ফিরে, ওই
তুঙ্গাভদ্রা উছলি উছলি পড়ে, দিন
শুধু কেটে যায়, রোল করি আসে দিন,
রোল করে যায়, এতদিন কেমনে যে
যায়, তাই ভাবি...
ছার এ বিগ্রহ ঝঞ্ঝা জীবন ব্যাপিনী
এই ঘোর রাজ্যলিপ্সা জীবনের ব্যাধি,
কতদিনে হবে মুক্ত—জর্জ্জরিত প্রাণ
ইচ্ছা হয় ভঙি কারা ধাই ধাই কুল নাই যেথা,
ভেসে যাই অকুলের পানে...

(প্রকাশ্যে) কে রাজ্ঞী, এখানে, ব্যস্ত বড় নানা কার্য্যে,
যাই আমি হবে দেখা ।

মধুমালতী। মহারাজ এখানেও রাজকার্য্য !

কৃষ্ণরায়। তিল-
মাত্র বিশ্রামের নাহি অবসর, যাই...
আমি (স্বগতঃ) ওই ওই যেন আসে সে সঙ্গীত...

মধুমালতী। মহারাজ ! আমি...

কৃষ্ণরায়। তুমি তুমি রাজ্ঞী, কিন্তু কি জানি সে
কেন, ছোটে প্রাণ কোন স্বপ্ন রূপপানে
কোথা সত্যরূপ, পরিপূর্ণ আনন্দের
ধারা কোথা যেন আছে, তাই ধাই, ছুটে
ধাই, নাহি জানি কেন, ওহো তিলমাত্র
বিশ্রাম না মিলে...

(কৃষ্ণরায় চলিয়া গেলেন)

মধুমালতী। নারী এখনও সাধ তোর, আশা
রাখ কিবা আর...ঢাক মুখ ওই অন্ধ-
তিমির গহ্বরে, এ আলোক তোর নহে!
রাজ-চিত্ত বিশ্রাম না চাহে, জাগিয়াছে
সুর, বংশীরবে মুগুধ সারঙ্গ ধায়..
আর তুই...পদতলে সুকোমল তৃণ
উর্দ্ধে নীল নভঃ, অগণ্য তারকা রাজে—
মাঝে বায়ু করে হাহা ধ্বনি ওই শোন... !

মেঘ চন্দ্রকে ঢাকিয়া ফেলিল। দু'চারিটা নক্ষত্রও নিভিয়া গেল।

তৃতীয় দৃশ্য।

রাজা কৃষ্ণরায় ভাব-ভারাক্রান্ত মনে উদ্যানের অপর পার্শ্ব দিয়া চলিয়াছেন...দ্রুতব্যস্তভাবে মন্ত্রী তিমীরায় প্রবেশ করিলেন।...তিমীরায় বৃদ্ধ।

তিমী। মহারাজ, শত্রুসৈন্য তুঙ্গাভদ্রা তীরে
সহস্র কামান লয়ে হতে যায় পার,

কৃষ্ণ। আঃ...যুদ্ধ, যুদ্ধ, জীবন-মরণ-ব্যাপি যুদ্ধ
লয়ে খেলা চিরদিন খেলিয়াছি, চায়
চিত্ত নূতন রাখ রাখ তব
মন্ত্রণা আরাব...

তিমী। কর্ম্মতরে অবসাদ,

কৃষ্ণ। কর্ম্ম...কর্ম্ম ..সাধিয়াছি বহু কর্ম্ম, আমি,
অকর্ম্ম কি সুকর্ম্ম কি, ভেদ নাহি বুঝি
যুদ্ধ, যুদ্ধ...রক্তক্ষয়, প্রাণ লয়, মত্ত
যেন কোন মহা প্লাবনের জলে ভেসে
যায়...

তিমী। যুদ্ধ কি অকর্ম্ম,

কৃষ্ণ। অবশ্য অকর্ম্ম।

তিমী। কতদিন এই ভমে ডুবিলে রাজন ?
শত্রুসৈন্য গৃহদ্বারে, যুদ্ধ সে অকর্ম্ম—

কৃষ্ণ। কেবা শত্রু, যবনেরা ?...মন্ত্রী! এ মুকুট
পরিহাস এ জীবনে...সত্য ইথে নাই
চাই সত্য, দিতে পার মন্ত্রণা তাহার
বল, কেবা শত্রু কেবা মিত্র, ভেদ কোথা
তার নাহি পার, তুঙ্গভদ্রা বহি চলে
যায়, জলস্রোতে সব ভেসে যাবে, তুমি
আমি সব স্বপ্নসম ভেঙে যাবে, যাও
চাই সত্য...যুদ্ধ নাহি চাই... যুদ্ধে নাহি
মিটে তৃষা, জীবন মরণ লয়ে ভাঙা
গড়া খেলা, কোথায় এ শেষ তার, কোথা
সেই অরূপ রহস্য, রূপে যারে পাই
না ধরিতে, চাই তাই, পার দিতে দাও
নহে কহিও না কোন কথা আর...যাও...

[রাজা কৃষ্ণরায় চলিয়া গেলেন ; মন্ত্রী তিমীরায় দুই হাত বুকের উপর রাখিয়া নিস্তব্ধভাবে দাঁড়াইয়া রহিলেন]

চতুর্থ দৃশ্য।

দৃশ্য পূর্ব্ববৎ উদ্যানের মাঝে বকুলবীথিকা তলে পিয়ারা... চন্দ্রালোকে সারা কানন পুলকিত।

পিয়ারা। না-না মানুষ না হ'য়ে যদি অম্‌নি ফুল হয়ে ফুটতুম্ যদি ফুল হতাম্ তাহলে আর এ সব ভাব্‌তে হোত না

আমি প্রাণ বিকায়ে ফুল হব সই
হব গলার হার
ভালবাসার গাঁথা মালা,
থাকব গলে তার

ফুলের মত এমনি ধারা
আপনি হব আপ্‌না হারা
ঢেলে দেব সুবাস ধারা
মাখিয়ে বুকে তার
ভাবে যখন উঠবে ফুলে বুক
মনে মনে হবে কত সুখ
সুখের দুখের নিশাস নিয়ে
তুলব বুকে তার
শুখিয়ে যখন হব বাসি
মুছে যাবে সুখের হাসি
বলবে না কেউ ভালবাসি
তবু আমি তার।

(পিয়ারা ক্লান্ত নয়নে চাঁদের পানে চাহিয়া চাহিয়া নিদ্রাতুর ঢুলু ঢুলু হইয়া বীণা কোলে লইয়া ঢলিয়া পড়িল, বাহু-ফাঁস শিথিল...ধীরে ধীরে চক্ষু মুদিত হইল...রাঙিয়া ধীরে ধীরে গাছের আড়ালে আসিয়া দাঁড়াইয়া দেখিতে লাগিল...

রাঙিয়া। (স্বগতঃ) গোলাপ ফোটে এও ফোটে, এও রূপ ও'ও রূপ দুনিয়াদার, এ পাপড়িই বা বাঁধ কেন, পাপড়িই বা ভাঙ কেন ?...

(অদূরে ছায়ালোক প্রতিফলিত পথ দিয়া কৃষ্ণরায় আসিতে-ছিলেন...ক্লান্ত নয়ন ভাবনা যুক্ত...

কৃষ্ণরায়। (স্বগতঃ) কর্ম্মস্রোতে চলেছে জগৎ, কহে লোকে
জন্ম মৃত্যু বিধাতার লেখা, তাই যদি
হবে, নিজকৃত কর্ম্ম তবে কিবা, সবি
যদি তাঁর লেখা তবে এ লিপি বা কার
কোথা মুক্তি মানবের, কোথা মুক্তি তবে
বাঁধনের উপর বাঁধন, পাকে পাকে রচে
মায়াফাঁস, আনে ঘোর তন্দ্রাচ্ছন্ন মোহ

মৃত্যু জাল, আবরি নয়ন পথ সব
ছেয়ে ফেলে, মুক্তি কোথা, বাঁধা আমি, বাঁধা
এ জগৎ, গ্রহতারা মহাসূর্য্য সোম
ব্যোমকুক্ষীতলে কেন্দ্র পথে সব ঘুরে
মরে, আমিও সে মরি ঘুরে সম্রাটত্ব
করিয়া অর্জ্জন, সিংহাসন মুকুটের
ভার, ফেলে দিয়ে সবহারা হতে, কোথা
মুক্তি পাব, মুক্তি না বন্ধন...

(সহসা সম্মুখে সেই মর্ম্মরপ্রস্তরাসনে নিদ্রিতা পিয়ারার প্রতি চকিতে দৃষ্টি পড়িয়া চমকিত হইলেন, একদৃষ্টে দেখিতে দেখিতে)

...কিন্তু একি
চন্দ্রমা মলিন হেরি ওরূপ মাধুরী
ঢল ঢল শতদল শতেক গোলাপ
জ্যোৎস্না ছানিয়া কেবা মুরতী গড়িল রে
আহা! রূপ! রূপ! ফোটে ফোটে অফুটন্ত
এরূপ কলিকা...কার রূপ, কার হাসি!
ওই অফুটন্ত গোলাপ কোরক আর
এই ফোট ফোট রূপের স্বরূপ, কেবা
সে সুন্দরতর, কার রূপে ফোটে ওই
ফুল কার রূপে মেলে ওই আঁখি, আহা!

পিয়ারা। (ঘুমঘোরে তন্দ্রাবিজড়িত সুরে আলস্যে) রাঙিয়া... রাঙিয়া...

কৃষ্ণরায়। (দাঁতে দাঁত দিয়া চাপিয়া)

কে! কি? রাঙিয়া! রাঙিয়া!

(পিয়ারা ঘুমঘোরে হাসিয়া উঠিল।...তাহার পরে তাহার হাসি যেন বেদনার ক্রন্দনে মিলাইয়া গেল...পিয়ারা হস্তপ্রসারণ করিল, বীণার তারের উপর হাত পড়িয়া বাণা ঝনঝনিয়া উঠিল। রাঙিয়া

চমকিয়া দেখিল সম্মুখে কৃষ্ণরায়, ত্রাড়িয়া সরিয়া গেল...পিয়ারা আবার হাসিয়া উঠিয়া গ্রীবা ঈষৎ বাঁকাইয়া ঘুমাইতে লাগিল... পূর্ণচন্দ্রের বিমল জ্যোৎস্না তাহার মুখের উপর হাসিতেছিল)

আহা নিদ্রা যাও বালা, ক্লান্ত ও নয়নে
তব মদির স্বপনরাশি ঢেলে দেয়
অমিয়া জ্যোছনা, অথবা রূপের ধ্যানে
হইয়া মগন ফুটাইছ ভাবরাশি
রূপ সৃষ্টি করি, সর্ব্বদেহে যৌবনের
অটুট চাঞ্চল্য রূপে রূপে তুলিতেছ
ভরি, আর আমি কৃষ্ণরায়-মুকুটের
কণ্টকিত ক্ষতে জর্জ্জরিত জ্বালা লয়ে
ফিরি...এই রূপ এও কি বন্ধন...না না—
তবে ব্যর্থ কিবা ইন্দ্রজাল সম সব
মোহিনী কল্পনা-ছবি রচি ফুলহারে
ভুলায় মানব মন ভুলায় জগৎ

(পিযারা ঘুমঘোরে কেমন যেন কাঁদিয়া উঠিল, আবার হাসিল)

পিয়ারা! পিয়ারা! হৃদয়ের অন্তঃস্থলে
একি তম ঢালা, বিচিত্র বাসনা কেন
রূপ হেরি জাগে...একি নব জাগরণ
মোর, ঘুমাইল অতীত আমার যেন
নূতন এ সাড়া জীবন আরম্ভ যেন
হ'ল এতদিনে, কিন্তু কেন মনে হয়
ফিরে, আপন মারণ-বীজ ক্রয় করি
রণে, নিজহাতে রোপিয়াছি তায়! হায়!
হায়! পিয়ারা! পিয়ারা!

(পিয়ারা ঘুমঘোরে উঠিয়া বসিয়া আঁখি কচলাইতে লাগিল...

দূরে শ্যামা ডাকিতেছিল...পিয়ারা ঘুমভাঙা আলস্যে চমকিত হইয়া দেখিল সম্রাট)

পিয়ারা। একি!

কৃষ্ণরায়। চাও চাও

ফিরে মেল ও কমল আঁখি, ওই চক্ষু
দীপিকায় বিশ্বের রহস্য উঠে ফুটে,
বুঝিতে কি পার তায় না না যেবা দেয়
আলো, সেকি কভু জানে আপনায়, যেবা
দেখে সেই হয় পুলকিত দিশেহারা,
পতঙ্গ-বৃত্তিতে শুধু ধায় বহ্নিমুখে—
বহ্নি জ্বলে কোন তাপে হ'য়ে আত্মহারা
কেবা জানে, জ্বলে পুড়ে মরে ছাই হ'লে
হয় কিবা সুখ, সে কথা পতঙ্গ জানে
বুঝিতে কি পার তায় কেন আঁখি মোর
উন্মুখ সতৃষ্ণ দিঠি চায় তোমা পানে—

পিয়ারা। বুঝিবার অবসর, কই কিছু ত বুঝি না,
বুঝিবার অবকাশ এ জীবনে পাই
নাই কভু,

কৃষ্ণরায়। পর্ব্বত বন্ধুর শীলা গড়া
তব প্রাণ, তাই...

পিয়ারা। পর্ব্বতসঙ্কুল দেশে
তিমির গহ্বরে জন্ম মম শুনিয়াছি
বটে, প্রস্তরে গঠিত দেহ, হ'তেওবা
পারে...

কৃষ্ণরায়। নহে দেহ, প্রাণ তব,

পিয়ারা। রহে মণি

লুক্কায়িত তিমির বিবরে, আভা তার
প্রকাশে আপন বিভা, প্রাণ দীপ্তি তার,
সেই দীপ জ্ঞানে কি অজ্ঞানে,—নাহি জানি—
তারি হাতে থাকে, যে বিরাট বক্ষ ভেদি
স্বচ্ছ স্ফটীকের মত এসেছে ঝেলাম,
সেই সে বিরাট শীলা জনক আমার

কৃষ্ণরায়। হায়রে মায়াবিনী রূপক রচিছ কত,
যারি রূপ আছে সেই কি করে এ খেলা
এত ছল কে শিখালে তোমা? নানা ছল
বুঝি রমণীর সৌন্দর্য্যের ভাষা, তাই
ছলে রচ ঐরূপ কর তাই কহ—তাই
কহ এ জীবনে অবকাশ পাও নাই
কভু...লোকে...

পিয়ারা। লোকে কহে ছল শুধু বল
রমণীর, কহে বটে, শুনি সে ছলনা
নারীর ভূষণ, কিন্তু হায় না ফুটিতে
কলিকা কিশোর, যে জানিল ফোটা তারে
মানা, যে জানিল পর-পরিচ্ছদ-সম
তোর সাজা এ জীবন, তার কিবা আছে
বলিবার...

কৃষ্ণরায়। কিছু নাই তবে এ জীবন
পর-পরিচ্ছদ-সম, আশৈশব তাই
পালিতেছি পরিচ্ছদ মত?

পিয়ারা। জীবনে যে
পায় নাই নিজের ভূষণ, পরমুখ
পানে চেয়ে কাটাতে সে জনম যাহার

তার কথা কেন ফিরে, সেজে-থাকা নহে
কি তাহার !

কৃষ্ণরায়। সেজে থাকে ? হের ওই ফোট
ফোট আরক্ত ও রূপ, কি সুন্দর কহ
কি হেরিছ, 'ও' ও কি আছে সেজে, কহ
'ও' ও পরিচ্ছদ...

পিয়ারা। কই ? ওই সে গোলাপ
ফুল...কার সাজে কেবা সাজে বুঝি

কৃষ্ণরায়। কহ কিবা কহে, ওই রক্ত অধরের
ফাঁকে কি সুধা মধুর রসে ভরা
'ও'ও পরিচ্ছদ সম, সেজে বসে আছে ?
নাহি কি জীবনে কিছু বলিবার তার

পিয়ারা। ফুলজন্ম পাই নাই প্রভু, ফুল হ'লে
বুঝিতাম ফুলের ও ভাষা, আমি তায়
কব সে কেমনে,

কৃষ্ণরায়। দেখ ভাল করে দেখ
কি হেরিছ কহ,

পিয়ারা। সেই ত' আরক্ত ফুল
গোলাপ কহে সে যারে, কাশ্মীরের বনে
বনে গিরিকটীতটে অজস্র সে ফোটে—
কেন ফোটে সেই জানে...

কৃষ্ণরায়। শুধু সে গোলাপ
আর কেহ নাই আশে পাশে,

পিয়ারা। আর কেহ ?
কই, ও ভ্রমর...

কৃষ্ণরায়। জান না কি প্রেমভরা
পুষ্পরাণী মোর কি কহে ভ্রমর ওই

অধরের পানে চেয়ে...জান নাকি মধু-
লোভে লুব্ধ অলি আশে, আশা পথ চেয়ে
ফুল দুলে দুলে ফুটে, আপন প্রাণের
ভাষা সৌরভের সাথে ঢেলে দেয় তায়।

পিয়ারা। হবে—নাহি জানি ভ্রমরের রীতি, নাহি
জানি ফুলের ও ভাষা, যে ফোটায় সেই
জানে কিবা তার কথা—

কৃষ্ণরায়। চাও দেখি ফিরে
মোর পানে...উদ্যান-পালক যথা দিন
দিন ধরি, নিত্য করে সে সিঞ্চন ওই
তরুমূলে, ফুটাতে অপূর্ব্ব রূপ, যথা
অলি মুখরিত গুন গুন রবে ধেয়ে
আসে ফুল পাশে করে সে চুম্বন, সেই
মত ঢালিতেছি স্নেহের আশার, নিত্য
নিত্য ভ্রমরের রূপ ধরি সদা আছি
চেয়ে, কবে সে ফুটিবে মোর, শত আশা
ভালবাসা-ঢালা পিয়ারা আমার সেই
আশে চেয়ে আছি!

পিয়ারা। একি কথা, প্রভু!

কৃষ্ণরায়। কেবা প্রভু কেবা দাস, কে করে নির্ণয়!
আর নাহি প্রভু, দাস আমি, রাজকার্য্যে
বিকৃত মস্তিষ্ক মোর, এতদিনে বুঝি
আমি কোন স্বরগের অমিয়ার ধারা
রুদ্ধ আজি আমার এ হৃদি-কুঞ্জবনে,
এত রূপ, এত রূপ ধরণী না ধরে
আর...

পিয়ারা। দাসী ক্রীতদাসী সেই চিরদিন
রূপের এ স্তবগানে, তার অধিকার
রূপ ত ধুলার ফুল লুটাবে ধুলায়
প্রভু! তারে কেন এ নির্ম্মম পরিহাস
রূপের কদর করা...জীবন জীবন
নহে যার, আলোক আলোক নয় যার
তারে প্রভু সাজে কি এ!

কৃষ্ণরায়। নহে পরিহাস
কহি সত্য বাণী, সম্রাটে না কহে মিথ্যা,
শক্তির প্রচুর ব্যয়ে করি দিগ্বিজয়
রক্তে রক্তে সিঞ্চিয়া মেদিনী, কিনিয়াছি
মরুভূম, রুক্ষ কঠোর এ তপ্তজ্বাল
উল্কাপিণ্ড কিম্বা নীহারিকা সম এই
আতপ্ত হৃদয়, জ্বলে জ্বলে অহর্নিশি
আপন উদ্বেগে, ধ্বক্ ধ্বক্ কোন স্বস্তি
হেতু,...ফিরি যবে যাই ওই ফুলবনে
ওই দূর চন্দ্রমার বিমল সুহাসে,
ফিরি যবে নেহারি ও বদন কমল,
চল চল লাবণ্যের জলে, কি মধুর
সে ভঙ্গিমা, মনমুগ্ধকরা কি উজ্জ্বল,
ভ্রমর চঞ্চল আঁখি, সলাজ নির্ম্মেঘ,
মনে হয় বিশ্ব থাক্ একদিকে পড়ে,
থাক্ স্তূপীকৃত দিগ্বিজয়, রাজছত্র
কলঙ্কিত অসি, যাগযজ্ঞ অশ্বমেধ
সাম্রাজ্য বিস্তার, থাক্ পড়ে রত্নাবাস
মুকুতার মালা, থাক্ যত মিথ্যাখ্যাতি
জনশ্রুতি রাশি, ইতিহাস-পৃষ্ঠাব্যাপী

কলঙ্ক শোণিমা, শুধু তোমাতে আমাতে
আজি জ্যোৎস্না মুখরা রজনী, হোক্ নব
পরিচয়, মুখোমুখি, আঁখি পানে চাহি,
চাহি শুধু কার রূপে ফুটিয়াছ তুমি,
কার রূপে ফুটিয়াছি আমি এ নির্ম্মম
পাষাণ বিকৃতশীলা বন্ধুর শৃঙ্খল
পদে পদে বন্ধনের লোহা...ওঃ পিয়ারা!
চাই শুধু শুনিবারে অপার্থিব সুর
শুনি শুনি প্রাণ মোর হবে যাহে ভোর
হবে নব নব উন্মেষ আমার, হবে
শান্তি, হবে তৃপ্তি, নরজন্ম হবে মুক্ত
রুদ্ধ ক্লিষ্ট পিঞ্জর আবদ্ধ প্রাণ
আর নাহি পারি...গাও! গাও, আন শান্তি...

(পিয়ারা একটু নীরবে হাসিয়া বীণায় ঝঙ্কার দিয়া তান তুলিল, পিয়ারা গাইতে লাগিল)

আমারে বল্‌ছে মানা,
ও প্রাণ সোনা,
শোন্‌লো বলি
কে জানে ফুটেছি কেন
কেনই হেন
ভুলে কেন, আসে অলি।
কাঁটার ঘায়ে ফুটেছি আমি
ফুটেছে গোলাপ ফুল,
রাঙা অধর হেরে আমার
হয় সবে আকুল
আমি ত প্রাণ জানি না,
মান জানি না
কিসের ছলে, পড়ি ঢলি —

প্রাণের মানা বুঝ্‌তে মানা—
কোন ভুলে সে কিবে বলি।
যতেক ব্যথা ফুট্‌ছে কথা
প্রাণের কথা ওই
সরম ভেঙে মরম রেঙে
থম্‌থমিয়ে রই—
ফুট্‌লে পরে অম্‌নি ঝরে
যায় সবে দলি
মানের মানা বুঝতে মানা
প্রাণের ভুলে কিবে বলি ..

কৃষ্ণরায়। জাননা জাননা তুমি রে রাক্ষসী! না না...
ঢাল ঢাল বর্ষ সুধা, পিয়ে পিয়ে হই
যাহে ভোর, হোক্, ভুল, তবু সেই ভুলে
রব বেঁচে, সেই ভুলে জাগাও আমারে
ডুবুক্ সাম্রাজ্য মোর বিতস্তা-অতলে
কর্ম্মকাণ্ড বেদ আস্ফালন মিথ্যা এই
মন্ত্র আবাহন বিসর্জ্জন শুধু, অস্ত্রে
অস্ত্রে ঝনৎকার সমর উল্লাস, ব্যোম
ভেদী সাগর গর্জ্জন সম গৌরবের
গান, মিথ্যা সব, শুধু তুমি সত্য, তুমি...
শুধু প্রাণে জাগে কিসের আভাস, শুধু
যেন চাহি চাহি মিটেনা তিয়াসা, পুনঃ
গাও...

(পিয়ারা আবার গাইতে লাগিল)

আপন মনে ফুটিয়ে কুসুম
আপনি তুলে গাঁথি মালা
আপনি হোর আপনা হাসি
আপন ভুলে হেসে ফেলা

আপনি হাসি রাঙিয়ে রঙন ফুল
আপনি কাঁদি ফুটিয়ে দিয়ে হুল
ভালবাসি তাই সে এত ভুল
(আবার) ছড়িয়ে নিশি কেশের রাশি
জড়িয়ে পরি তারার মালা
মায়া-জালে ছলে সে বাঁধি
আপনি কেটে আপান সে কাঁদি
কাঁদিয়ে তাবে কেঁদে সে সাধি
কেউ হাসে কেউ ভাসে জলে
ভেসে ভেসে করি খেলা...

কৃষ্ণরায়। পুনঃ কি রূপকছলে কহিছ কাহিনী
একি এ তরল সুরে গম্ভীর আলাপ,
গাও ফিরে, গাও গান, যাহে সুর ঝরে
পড়ে ফুলের মতন, সুরসাথে যেন
ভেসে আসে পরাণের সকল সুবাস
(পিয়ারা পুনর্ব্বার গাইতে লাগিল...

এমন চাঁদিমা জোছনা সজনি
যদিলো রজনী অমনি যায়,
মিছে এত আশা, মিছে ভালবাসা
কি ফল জীবন বিফল হায়।
ভেসে আসে ওই পাপিয়া তান,
শুনি যদি নাহি ভরে এ প্রাণ -
ওই মলয় পরশে শিহরি হরষে,
যদি না বঁধুয়া শিহরি চায়—
চোখে চোখে ভাষা, চোখে চোখে আশা
হিয়ায় হিয়ায় মিটায় তিয়াসা,
সকল পিয়াস হয় তাহে ভোর,
দোঁহা আঁখি শুধু দুহুঁরে চায়।

কৃষ্ণরায়। পিয়ারা! পিয়ারা! সুন্দর! সুন্দর! তুমি
আপনি ফুটায়ে ফুল আপনার হাসি
লয়ে, আপনি গাঁথিছ মালা দিবে বলে
আপনার গলে, তবে ফিরে বঁধু পানে
চায় কেন মন, আপনাতে হয় যদি
সব, তবে কেন বঁধু বিনে শিহরে না
মলয় পরশ, সব ভাষা ধায় আঁখি
পানে, আমি যে এ দিন দিন ওই আঁখি
'পরে রাখি প্রাণ, তার তরে কিবা দিবে
বল,...পিযারা লো! প্রিয়তম কি সুন্দর
বল বল তুমি ত আমার হবে, আসমুদ্র
হিমাচল পদতলে যার, ক্ষিতিপতি
কৃষ্ণরায় চরণে তোমার, সর্ব্বরিক্ত
হয়ে যাচি, বল প্রিয়ে বল একবার
তুমি ত আমার হবে সুন্দর আমার

পিযারা। আমি ত আমার নই প্রভু...জন্মিয়াছি
কাশ্মীরের উপত্যকা মাঝে ঝেলামের
তীরে, ভূর্জ্জবৃক্ষ বনচ্ছায়া-নীড়ে শুধু
আপনার বুলি গেয়ে ফিরিতাম বনে
বনে মানস-সরসতীরে, বিতস্তার
কোলে, বনে বনে বুন পাখী স্ব-ইচ্ছায
খোলাকাশে বেড়াতাম উড়ে; আজি কর
বিনিময়ে ক্রীতদাসীরূপে প্রভু! তব
প্রমোদ উদ্যান মাঝে, আওতার তৃণ-
রাশি সম, হরিৎ রঙের আভা নাই
এ দেহেতে, চলি, ফিরি, নাচি, গাই, শুধু

শেখা বুলি পড়ি পাখী সম, শুনে শুনে—
দিবার ত কিছু নাই...

কৃষ্ণরায়। জ্ঞান তুমি কার
ওই পূর্ণ বরাঙ্গ সম্পত্তি কার...জ্ঞান ?

পিয়ারা। অর্থ
যার দাসী তার...শাছে দেহ ক্রয় যেই
করিয়াছে মোরে, শাহি কর—কিন্তু প্রভু
প্রাণ কোথা মোর, কাটি দেহ কর খান
খান পাবে রক্ত পাবে মাংস, পাবে মল,
পাবে গন্ধ শিরা উপশিরা, সব পাবে,
শুধু মিলিবে না কভু বর্ণহীন সেই,
যা না হলে চলে না এ দেহ, এ সৌন্দর্য্য
নিমিষে মিলায়ে যায় স্বপনের মত
ক্রীত যেই প্রাণ কোথা তার...

কৃষ্ণরায়। বারবার
এক কথা, ক্রীতদাসী, না না শিখায়েছি
সর্ব্ববিদ্যা, ক্রীত যেই তারে কবে কহ
কে শিখায় এতেক যতনে, সুকুমার
সব কলাকলা, ভুলি আত্মপর ভুলি
নিজ স্বার্থ, ফুটায়ে তুলেছি রূপ ফুটে
যথা গোলাপ কোরক, আজি আমি তব
আশে, ভিখারীর মত মুখপানে আছি
চেয়ে, শান্তি দাও হে সুন্দরী, রাজকার্য্যে
চক্রান্তের ঘোরে, আলোড়িত সব, ঘোরে
যেন ঘূর্ণীবায়ে, আন শান্তি, বিদ্যুল্লতা
আলো করি বেড় মোর হৃদি, কর ভস্ম
নয় বর, দিব্যরূপে করহ বরণ !

পিয়াও ও সুধা তব পিয়ারা সুন্দরী!
নহে রূপ! রূপ! আলোকে আঁধার আন,
ডুবাও তিমিরে, সব স্পর্শ সব জ্ঞান
ঘুচুক্ আমার, নিভে যাক্ ওই রূপ!

পিয়ারা। শ্রান্তিহীন বিরামবিহান আজ্ঞামত
পালিয়াছি সব, শিখায়েছ যাহা প্রভু
সব শিখিয়াছি, শুধু শিখি নাই তাই
লুকাতে কেমনে হয়, শিখি নাই শুধু
আপনার কথা দিয়ে, জানাতে আপনা...
জানা কারে ব'লে বল, জানাতে কেমনে
হয; দেব কিবা আছে মোর, দেহ প্রাণ
রূপ মোর এ বর্ণতরঙ্গ লীলায়িত
গতি, নরপতি! সবি তব ক্রীত, তবে
স্বাধীনতা কোথা মোর; আমার ত, কিছু
নয় প্রভু হওয়া হয়...দেওয়া দেয়
কিবা আছে মোর, আমি ত আমার নই!

কৃষ্ণরায়। ক্রীত, ক্রীত, জানি আমি সব ক্রীত, জানি
আমি কাশ্মীর বিজয়ে, রাঙিয়া, পিয়ারা
মোর ধ্বজাঙ্কিত ক্রীত ক্রীতদাস, তবু
কহি আজ, নাহি চাই তুলিতে সে কথা,
অতীতের লেখা পৃষ্ঠা ফেলিয়াছি ছিঁড়ে
আজি হতে নব স্মৃতি লবে ইতিহাস...
চাই শুধু তোমা প্রিয়তমে, স্বপ্নময়
জীবনের গেহে, তোমারে হেরিব সত্য—
সত্য তুমি, রূপ তুমি, হৃদয়ে হৃদয়ে
তাই করি অনুভব, তোমার পরশ-
সুখ, বল ধনি, প্রাণমণি কমলিনী

মোর, তুমি, তুমি...তুমি ত আমার হবে!

পিয়ারা। একি কথা মগধ সম্রাট, রাজ রাজ-
চক্রবর্ত্তী গৌরব-গরিমা, ডুবাইবে
কালিন্দী অতল জলে মগ্ন তমশায়
হীন অস্পৃশ্যা সে ক্রীত, ক্রীতদাসী তরে!

কৃষ্ণরায়। আজি হতে মুক্ত তুমি, পিঞ্জর-আবদ্ধ
মোর হে বিহগী, খুড়ি বেড়া তোর আজ—
কিন্তু পুনঃ পরাইব প্রাণের শৃঙ্খল, রাখি
হৃদয় পিঞ্জরে জন্ম জন্ম তোরে তোয়
ক্রীতদাসী নহ তুমি আর মুক্ত...মুক্ত...

পিয়ারা। মুক্ত...মুক্ত...মুক্তি ..মুক্তি, কহ কিবা
হে সম্রাট, বীর তুমি বিখ্যাত জগতে,
নারীরে না ছলা সাজে প্রভু, একি প্রভু!
নারী কি অরণী কাষ্ঠ ইন্ধন কামের?
শুধু নর-হৃদে জ্বালে দাবানল, আর
কিছু নহে সেই? ক্ষম প্রভু—ক্ষম মোরে
বাঁধিয়াছ কত সূত্রে, পুনঃ মিথ্যার এ
স্বপ্ন-জালে কর না রঙিন মোরে আর।

কৃষ্ণরায়। বীর নাহি করে কভু ছল, পুনঃ কহি
সম্রাটে না কহে মিথ্যা কভু, এস সাথে
সাম্রাজ্ঞী আমার, নিজহাতে ছিন্ন করি
মুক্তিপত্র তব, দিব তোমা উপহার
সাম্রাজ্য আমার, সিংহাসন, রাজবংশ-
খ্যাতি, মণিমুক্তা কুবের সম্পদ, দিব
সর্ব্বজনপদ, সসাগরা ধরণীর
হবে অধিশ্বরী, দিব প্রাণ মম, দিব
ধর্ম্ম, দিব অর্থ, দিব মোক্ষ, সর্ব্বকাম

মিটাব তোমার ; কামনায় রচা গেছে
তুমি লো কামিনী মোর, কাম হতে জন্ম
তব, তাই সে কামিনা নাম নরে দেয়
তোমা, এস এস হবে তুমি কামনায়
পূর্ণ-মনরথা, এস মম জীবনের
নিঃসঙ্গ প্রেয়সী, দাবানল জ্বালি
হৃদে দহিছ সে অহঃরহ, অথবা সে
মহাসিন্ধু-বুকে বাড়বাগ্নি, জ্বলে যথা,
তেমনি এ জ্বলে প্রাণ, স্বাক্ষী ওই চাঁদ
স্বাক্ষী বনস্পতি...

পিয়ারা। স্বাক্ষী ওই পূর্ণিমার
চাঁদ, কালি কলা ক্ষয় হবে যার, নিতি
নিতি কমে বাড়ে সেহ, তার স্বাক্ষ্য !

কৃষ্ণরায়। স্বাক্ষী
আমি, পরাণ আমার, ওই হের ধ্রুব
তারা, ধ্রুব অংশে জন্ম মম, মিথ্যা নাহি
কহি, আদিবাণী মাতৃনামে করি দিব্য
সাম্রাজ্ঞী তুমি লো আজ, এস সাথে...

পিয়ারা। (স্বগতঃ) মুক্তি—মুক্তি...স্বপ্নে সত্যে কিবা সে প্রভেদ
কিন্তু কেবা চাহে সাম্রাজ্য তোমার...না না...

(কৃষ্ণরায় অগ্রসর হইয়া, যে গাছের আড়ালে রাঙিয়া দাঁড়াইয়া-ছিল সেই গাছের কাছে আসিতেই তাঁহার চক্ষুর সম্মুখে পড়িল কৃষ্ণরায় চমকিয়া উঠিলেন...রাঙিয়াও একটু সহাস্য মুখে দাঁড়াইয়া নতজানু হইয়া ভূমিষ্ঠ হইল)

কৃষ্ণরায়। কে ? রাঙিয়া, তুমি, তুমি হেথা এত রাত্রে ?

রাঙিয়া। আজ্ঞে এই রেতের বেলা মাকড়সায় এই ফুলের গাছে জাল বোনে, তার জন্যে এই ফুলের কুঁড়িগুলো ভাল করে

ফুট্‌তে পায় না, তাই জাল ছিঁড়ে দিতে এসেছি,...জালে জড়িয়ে গেলে ফুল আর ফুট্‌তে পায় না .ওদের ব্যথা লাগে .

কৃষ্ণরায়। ফুলের কি ব্যথা পায় তাহা বুঝিবারে ..
ব্যথা লাগে এই জ্ঞান কে তোমারে দিল ?
কি আশ্চর্য্য ! নিরক্ষর জড় সম খাট
দিনরাত, তবু আছে প্রাণ, আর এই
সর্ব্ববিদ্যা শিখালাম যারে, সে কহে যে
প্রাণ কোথা তার...ভাল ভাল, দেখ, শোন
কালি প্রাতে গৃহে মম হইবে উৎসব
হয়নি ধরায় যাহা, তোমা'পরে রল
এই ভার, ফুলসাজে সাজাইবে এরে,
গঠি সর্ব্ব অলঙ্কার মুকুট কাঁচলী
সিঁথা, চারুচন্দ্রহার, রচিবে গোলাপ
মালা, ফেলি কাঁটা তার ; না হতে প্রভাত
পাই যেন সব, আর পরিবর্ত্তে তার
মিলিবে সে বহু পুরস্কার স্বপনেও
ভাব নাই যাহা...

রাঙিয়া। পুরস্কার ..আমার আবার পুরস্কার...কায করতে হয় করি, করি মালীগিরি, তার আবার কারিকুরি, তার আবার আকার, তার পুরস্কার...আর স্বপোনের কথা যে প্রভু আদেশ করছেন...তা বড় দেখিনি...তার কথা ত ভাবিনি...

কৃষ্ণরায়। পাবে মুক্তি...

রাঙিয়া। মুক্তি...মুক্তি...মুক্তি কিসের ? আমার ত' কোন বাঁধন নেই—

কৃষ্ণরায়। নাহি চাও—

এই দাসত্বের হীন শৃঙ্খলের ভার
টুটাতে হয় না সাধ? নাহি কভু মনে
পড়ে, কাশ্মীরের উপত্যকাদেশ, সেই
সে নদীর তীর, সেই ভূর্জ্জবৃক্ষশ্রেণী,
তার কোলে, ফিরে যেতে নাহি হয় সাধ?

রাভিয়া। সাধ...সাধ...ওইখানেই আমার সব বাদ, ওসব আর কেন প্রভু...এই মালীগিরিই ত বেশ, কি হবে আমার দেশ, জল ঢালি মাটি কাটি মাটির সঙ্গে হয়ে আছি মাটি... এই দেখুন না তাকে খুঁড়ছি, মাড়াচ্ছি...ছেঁচছি, কুটছি, সে মাটি কথাই কয় না...আমারও তেমনি কেমন সব মনেই হয় না, ও কেবল ফুল ফোটায়, আর আমার মুখের দিকে তাকায়, কিছু বলে না, আমিও অমনি ফুল ফোটাই, আর ওর মুখের দিকে তাকাই, এই গোলাপ বলে আমি ইরাণের এ বলে আমি কাশ্মীরের, মাটি বলে আমি রাজার...আমি সব সয়েই যাই, আমিও তেমনি রাজার ওই মাটির মত সয়েই যাই...মাটি ফাটে গোলাপ ফোটে, আর কত ভোমরা সেথায় এসে জোটে, মাটি চুপমেরে থাকে, গোলাপ হাসে, মাটি চুপ, আমিও চুপ,...তখন আর কিছুই ঠাওর করতে পারিনি, ভাবি এই মাটি ফুঁড়েই এই হাসি দেখা দিলে.. না আমার এই বুকের মধ্যে থেকেই বেরিয়ে এল... ও মুক্তিও জানিনে, বাঁধনও বুঝিনে, এ বেশ সুখেই ত আছি প্রভু! কাশ্মীরে আর আছে কে, আমার জন্যে মরবে যে... ও সব কথা ধরাবেন না...

কৃষ্ণরায়। বটে, মাটি সাথে হ'য়ে আছ মাটি, জড়
সম অচল নীরব, তাই এ শৃঙ্খল
ভার নাহি লাগে তব...শুধু ফুটাইছ
ফুল, ঢালিতেছ জল, নীরবে চাহিয়া

আছ শুধু মাটি পানে...বুঝনা জীবন
কিবা, এ মনুষ্যজন্ম লভি কত আশা
জাগে নরহৃদে, কত স্বাধীনতা চায়
এ পরাণ, ভাল ভাল...কর কায জড়
সম রহ অচেতন...চাও না সে মুক্তি
তবে

রাঙিয়া। না প্রভু, এই ত আমার বেশ, কাট্‌ছি ঘাস, করছি ফুলের চাষ, এর চেয়ে আবার সুখের আশ, না প্রভু এইখানেই খতম, বাস্...

কৃষ্ণরায়। এস তবে পিয়ারা আমার আজি
আমি পূর্ণমনস্কাম, পূর্ণ হতে হব
পূর্ণতম, মিলিয়া তোমাকে, পূর্ণ হবে
এই বিশ্ব, এতদিন যেই আদর্শের
মায়ামৃগ পাছে ছুটিয়াছি পিছে পিছে
আজ তাহা মিলিয়াছে মোর, তোমা সনে
প্রাণের মিলনে, হবে সে দর্শন, মোর—
প্রত্যক্ষ প্রত্যক্ষ বন্ধ কাটিবে আমার...

পিয়ারা। (জনান্তিকে—রাঙিয়ার প্রতি চাহিয়া স্বগতঃ)
বাঁধন তোমার থাকবে কেন আর...
যার বাঁধনে পড়্‌বে বাঁধা
সেত নয় তোমার
মরণ বাঁচন আমার কেবল,
তোমার কেবল হাসি
তোমার বেলায় ফুলের ভূষণ
কিন্তু, আমার বেলায় ফাঁসি...

[প্রস্থান।

রাঙিয়া। সবাই পেলে সোণার হরিণ। সবাই ত বেশ ভরে

উঠ্‌ল, তোর ভোরও হয়ে আসছে, কেমন ফুটছিস্‌ বল্‌, তোর কাল সাজবার পালা, আমার এখন কিসের পালা...আমার কাঁটা, তোর ফোটা, বোঁটা থেকে খস্‌লেই তুইও বাঁচিস্‌ আমিও বাঁচি।...আমি মাটিতে বুক রগ্‌ড়ে রগ্‌ড়ে যাই...তুই সিংহাসন আলো কর, মাটি মাটিই থাক্‌বে তুই যে শুখিয়ে যাবি...(শ্যামা ঝঙ্কার দিয়া উঠিল) বা: বাঃ...ওই যে শ্যামা কি গায়...কে জানে...তুইও বাঁচলি আমিও বাঁচলুম...কেমন গোলাপ তোকে কাল বলেছিলুম যে তোর ভোর...হাহা...ঠিক্‌...(রাঙিয়া ফুল তুলিতে লাগিল)

ছিঁড়লে ব্যথা বাজে, বাজে না ?...বলে তোর ব্যথা কি করে বুঝি হা হা...ঠিক ঘাসগুলো ওই মাড়িয়ে যায় আমার বুকটা কর্‌কর্‌ করে ওঠে...বাজে না—তা বাজুক মায়া রাখিস্‌ নি, লো ! মায়া রাখিস্‌ নি...তোরও ফুল জন্মের ঘোর কাটুক...আমারও এ নেশার ভোর কাটুক বলে তোর কাঁটা ফেলে—ডাঁটা রাখ্‌তে, কাঁটা ফেলে দিলে যে তোর কদর যায় এ ত তারা বুঝে না...ওই যে শ্যামা কি বলে না...ওই একই কথা...গুল্‌ গুল্‌ পিয়া ! পিয়া ! ও সখি ফোট্‌ ফোট্‌...

পঞ্চম দৃশ্য ।

[কাননের এক প্রান্তে রাঙিয়ার কুটীর ..ঝুম্‌কোলতা ও মালতী গাছে কুটীরটি আচ্ছাদিত, থোকা থোকা ঝুম্‌কো ফুল ফুটিয়া দুলিতেছে, শুভ্র তুষারের মত মালতীর দল চন্দ্রালোকে হাসিতেছে...চারিদিকে নীরব, চন্দ্র তখন পশ্চিম দিগ্বলয়ের তীরে নামিতেছে, জ্যোৎস্না এখন রক্তরাগে পরিণত, শেষ মাধুর্য্য এখন ক্রন্দনের আভায় ভরিয়া উঠিতেছে...চারিদিক নিস্তব্ধ নিঝুম, শুধু বাতাসের সাড়ায় পাতা

নড়ার শব্দ মাঝে মাঝে উঠিতেছে...কুটীরের মধ্যে ঘর...মাটিতে বসিয়া রাঙিয়া তাহার চতুর্দ্দিকে শ্বেত রক্ত পীত কত বর্ণের ফুল পাতা, ছড়ান, রাঙিয়া ফুলের অলঙ্কার প্রস্তুত করিতেছে, মুকুট, সিঁথা, বাজুবন্ধ, হার সব হইয়া গেছে, এখন পায়ের নূপুর গড়িতেছে ....কেবল শ্বেত পদ্ম দুটি বসাইতে বাকী গৃহকোণে একটা দীপ জ্বলিতেছে, একটা প্রজাপতি উড়িয়া উড়িয়া সেই দীপালোকের উপর আসিয়া পড়িতেছে...রাঙিয়া নূপুর গড়িতেছে, আর হাসিতেছে...]

রাঙিয়া। তিনবার...তিন প্রহরে, তিনবার উলুকে হেঁকে গেছে... ঘুমিয়ো না, ঘুমিয়ো না, ঘুমিয়ো না—বুকের ভেতর দোল দিয়েছে।...আমার সব গড়া হয়ে গেছে বাকী শুধু এই ফুলের নূপুর, এ মঞ্জীরে কি সুর বাজবে তাই ভাবছি... এই যে তুই পুড়্‌তে এসেছিস্...পোড়্ পোড়্ পুড়ে মর্... রূপের আগুনে পুড়ে মরবি বৈকি...আগুনে আগুন টানে, তোর প্রাণে আগুন ত আছে...তখন টান পড়্‌বে বৈকি... পোড়্ পোড়্ পুড়ে মর্...দীপ জ্বলে না পতঙ্গ জ্বলে, না আমি জ্বলি, জ্বলে পোড়ে, না পুড়ে জ্বলে...এই যে নূপুর তুমি ত পায়ের পাতায় সাজ নেবে, তুমি তার তাপে জ্বল্‌বে, না সে তোমার তাপে জ্বল্‌বে...বল্‌তে পার... সবাই জ্বলে তুমিও জ্বল, তা তা বেশ...(একটা ফুল লইয়া) এই যে তোমার বড় ব্যথা লেগেছিল না...কি সুন্দরী! তুমি যে কি বল্‌বে বলে থমথমিয়ে রয়েছ...ঠোঁট আল্‌গা কর, তোমার আবার কি গোপন কথা আছে বল, বলে ফেল, বল্‌বে না, তবে বল্‌বে না, তার পায়ের পাতা না ছুঁলে, তোমার বোল বুঝি ফুট্‌বে না, তা তা বেশ, তার পা ছুঁলে আমার বোল ফুট্‌বে, তোমার বোলও ফুটবে, তা তা বেশ ..তোমার বলা হলেই তোমার মুক্তি, আমার

বন্দী হলেই আমার মুক্তি...বাকী—বাকী এই নূপুর...এই মঞ্জীর...তার শব্দ, আয় ঘুম আয়, আয় ঘুম আয়...কিন্তু গোলাপ কই, হেথায় ত আর কেউ নেই, তুই একটিবার মুখ খোল, শুধু আজ রাত্রিটার মত—শুধু তুমি আর আমি—ফোট গোলাপ ফোট, একটি একটি করে তোমার ওই রূপের পাপড়ি আলগা কর, খোল, আর সঙ্গে সঙ্গে আমার...আমার এই অন্ধকার হৃদয়ের স্মৃতির ঝরখাগুলো এক এক করে খুলে যাক্...সে আজ কতদিন গোলাপ... ... .মনে পড়ে...সেই...আঃ

(দূর হইতে বিলাসভবনের আলোকরশ্মি ও সঙ্গীতের সুরের সঙ্গে পাপিয়ার তান ভাসিয়া আসিতেছিল)

বাজে লো বাজে
ভ্রমরা গুন গুন চরণে মঞ্জীর
ঝুনুঝু রুনু রুনু বাজে।
পিয়ারা প্রেমভরে আঁপিয়া মিলায়ে যায়
প্রাণ নয়ন কাঁদে আকুল লুটায় পায়
দূরে পাপিয়া বোলে পিয়া পিয়া
কে জানে কোথা দূরে বাঁশরী বাজে
প্রাণ প্রাণে চাহে সে মধুমুখ চুমি
মন মনে গাহে হে বঁধু আমার তুমি,
আমার স্বপন তুমি আমার জীবন তুমি
এস হে বাঞ্ছিত এ হৃদি মাঝে...
যৌবন ফুলবনে তনুমন মধুরাশি
ঢালি দিনু পায় মুখপানে চেয়ে হাসি
হাসির লহর তুলি, আপনি আপনা ভুলি
বিসরি সরম তবু মরমে বাজে!

(রাণিয়া গান শুনিতে শুনিতে হাসিতেছিল...
ওই যে মরালের ডাক শুনছি, এই শ্বেতপদ্মই ঠিক...পদ্ম না

হলে মরালের কাহিনী ফোটে না...মরাল না হলে সাপের কাহিনীও ফোটে না...পায়ের পাতায় পদ্ম, আগে মরাল তার পরেই সর্প... বাঃ বাঃ...ঠিক্ ঠিক্...মরাল না হলে পদ্মের মুড়ি খায় কে...সাপ না হলে মরালের ডাক বন্ধ করে কে—বাঃ বাঃ ঠিক্...জাগলেই ঘুমুতে হয়, ঘুমুলেই জাগতে হয়...আয় ঘুম আয়...

(নেপথ্যে পিয়ারা গাহিতেছিল...

রেখেছি লুকিয়ে কথা
বল্‌ব তারে কেমন করে
আপন মনে আপনি আছে
শুন্‌লে সে যে পড়্‌বে ঝরে...
কার মানা মান্‌বে না
মুখ ফুটে সে বল্‌তে কভু পার্‌বে না লো···
পার্‌বে না
তার হৃদয়-ব্যথা, হৃদে গাঁথা রেখেছে সে কত করে...
আমি নয়ন তুলে সকল ভুলে
বল্‌ব তারে কি করে...

(এমন সময় বাহিরে কুটীরদ্বারে...'রাঙিয়া' ··'রাঙিয়া' বলিয়া কে ডাকিল...রুদ্ধ দুয়ারে কে আঘাত করিল, রাঙিয়া চমকিয়া উঠিল...তাহার হস্ত হইতে ফুলের মঞ্জীর পড়িয়া গেল রাঙিয়া চমকিয়া উঠিয়া তাহা তুলিয়া চুম্বন করিল...বাহিরে আবার কে ডাকিল)

রাঙিয়া। কে...কে...আঁ্যা কে...এতরাত্রে মরালের ডাক্ আঁ্যা... পদ্মবন ত উজাড় হ'য়ে গেছে তবু মরাল ডাকে কেন... না না নিশ্চয়ই ভোরের হাওয়ায় কিসের ডাক্ উঠ্‌ছে...

(বাহিরে আবার আঘাত করিল, ডাকিল .রাঙিয়া...রাঙিয়া...)

কি রকম হোল না...ও হাওয়ার ঝাপ্‌টা...নইলে এত রাত্রে কে...

(পুনর্ব্বার 'রাঙিয়া' 'রাঙিয়া' 'রাঙিয়া' শব্দ হইল)...না না... একি আমাকে কি...উঁহু (বুকে হাত রাখিয়া)...এ ডাক্

বাইরের না ভেতরের...না আমি কি উন্মাদ হলুম...উঁহুঁ! বল্‌না...বল্‌না...বল মুখ খোল্‌না—খুল্‌বে না...খুল্‌বে না... তবু খুল্‌বে না...কিন্তু না ওই আবার...আবার...না না এ মনে না...মনে...না বনে, না মনে না কানে, না কানে নয়...এ কি—না এ আমারই বুকের ভেতর থেকেই ডুকরে উঠেছে, বুকের মধ্যেই ত...বলনা গোলাপ, গোলাপ, মনের রূপ কি মন থেকে বেরিয়ে তোর মত কথা কয়। কই তবে আসে, কই তোর মত মাটি ফেটে —বুক ভরে ফুটে ওঠে...কই

(রাভিয়া একবার করিয়া সেই মঞ্জীব বুকে ধরিয়া একবার করিয়া দ্বারের কাছে গিয়া কান পেতে, আবার ফিরিয়া আসে, আবার মুখ হাঁ করিয়া চুপ্ করিয়া চাহিয়া থাকে.. বাহিরে আবার 'রাভিয়া'! 'রাভিয়া'! 'রাভিয়া'! বলিয়া ডাকিল...রাভিয়া দ্বার খুলিয়া দখিল পিয়ারা···পিয়ারা প্রবেশ করিল...বিবর্ণমুখ পাণ্ডুর, কেবল ভাব সঙ্গোপনের চেষ্টায় মুখ মাঝে মাঝে আরক্ত হইয়া উঠিতেছে)

পিয়ারা। ভোর না হ'তে নিবতে তারা
সারা নিশি জেগে সারা
দিশেহারা করছ কি সে ছাই...

রাভিয়া। অ্যাঁ! অ্যাঁ! তাই..তাই...আরো ফুল ত চাই.
পিয়ারা! পিয়ারা! উঁহুঁ না সাম্রাজ্ঞী

পিয়ারা। হা হা হা ঠিক বলেছ, ঠিক বলেছ

বল্‌বে নাক তা
মালীগিরির কারসাজীতে
আর কি আছে মাথা
এখন নিয়ে খোস্তা হাতা

মাটির সঙ্গে হচ্ছে মাটি—
ঠিক ব্যাঙের ছাতা...
জড়ের মত ভূতের মত
আঁখিটি তুলে দেখ্‌ছ কত
মাটি সে যত হচ্ছে মাটি
তোমার বুদ্ধি বাড়্‌ছে তত...
হায়রে ঝেলাম! হায়রে গোলাম
এই ক'দিনেই এত

রাঙিয়া। কত দিনেই কত, এই যে কত ফুল, কত ভুল, তা-তা...
তুমি এখন সাম্রাজ্ঞী...
এ চালে কি চলে ভাগাভাগি
এতে শুধু বুকের দগ্‌দগি
হাজার বছর ধরে শুধু
অনুরাগের ঘা
মলয় শুধু ফিরে ফিরে
জুড়িয়ে দেয় সে গা...
এই দেখনা ফুল কেমন হাসছে, তুমিও হাসছ আর আমি এই করছি কায—তোমার সাধের ফুলের সাজ, বাকী শুধু এই নূপুরটা...এই মঞ্জীরটা হলেই সব কায ফুরোয়...

পিয়ারা। ঠিক বলেছ, ঠিক বলেছ,
বলছ বঁধু কিসের তরে,
যার, অঙ্গে কখন পড়েনি ছুরি
দাগ দেখে সে হেসেই মরে,
ভাবি, বল্‌ব কি আর ছাই—
কথা শুনে ইচ্ছে করে
ডুবে মরে যাই,

কুটিয়ে তুলে ফুল,
জড় করলে হাজার ভুল,
এখন গেঁথে মালা
পরলে ভুলের তাজ,
এখন কি ফুরোয়নিক কায...

রাঙিয়া। কায কি কখন ফুরোয়, না সাধ কখন মেটে

পিয়ারা। সাধ, সাধ কার কার সাধ

রাঙিয়া। যার ভাঙেনি বাঁধ

পিয়ারা। বালির বাঁধে মনকে বেঁধে
বলছ কাযের ঢেউ
একি আর বুঝছে নাক কেউ...

রাঙিয়া। তা তা ..এই সব, এই সব ত পড়েই আছে...তা-তা কার সাধে সাধে বাদ, আমায় এখন দাও বাদ, ও সবই বালির বাঁধ...ও-তা-তা ..

পিয়ারা। তা-তা-তা-আর তোমার মাথা...
বলি শুনছ, ওগো! কাল যে আমার মুক্তি
বঁধু, কাল যে আমার মুক্তি
ভোর হলেই সে নতুন হব
হ'ল রাজার সঙ্গে চুক্তি
এখন তোমার যুক্তিটা কি শুনি
না শেষ করবে রক্তারক্তি
তোমার মতিগতি ত' জানি
একটা কিছু বল শুনি...

রাঙিয়া। তা...তা...তা বটে, মন না মতি, তবে কি জান বাকী কেবল তোমার পায়ের এই মঞ্জীর, সেইটেই আমার মস্ত নজীর...আমার আর যুক্তি মুক্তি, ভুক্তি...যে বাক্তিই নয় তার আবার কি তা-তা বেশত...এই যে গোলাপের

হাসি, তা-তা তুমি হাস্‌বে...হাস্‌বে প্রভু, আমি এখন জবুথবু...হাস্‌বে আকাশ, হাস্‌বে ফুল, ভুলের ওপর জম্‌বে ভুল, হাস্‌বে জগৎ, হাস্‌বে তারা, নতুন প্রেমের এম্‌নি ধারা...

পিয়ারা। আর তুমি কেবল হাসিয়ে সারা
ঢেউ দিয়ে সে দেখ্‌ছ কেবল
তরী ভাসে কেমন ধারা...

রাঙিয়া। তা কেউ ফোটে, কেউ ফোটায়...কেউ লোটে কেউ লোটায়, তার কি আসে যায়, আসে যায় পায় পায়...

পিয়ারা। বটে; কার আর কি আসে যায়
যার যায় তারি যায়...
লোকে হেরে হেসে মরে
থাক্‌লে যৌবন বিকোয় দরে...
দেখ...প্রথম হোল মনে সাধ
বিধি রচ্‌লে ফুল,
তায় ঘট্‌ল পরমাদ
কাঁটায় ভর্‌ল মূল—
আগে অরুণ, পরে তরুণ
জীবন হোল তার
ফুট্‌তে ফুট্‌তে দুল্‌ল ফুল
ভাবলে কি বাহার!
হোল অঘটন মায়ার রচন
যৌবনে দিলে ডাক্,
মন দিয়ে মন বাঁধ্‌লে মনে
সাতটা পাকে পাক্।
পাপড়ি বেঁধে ঢেউ দিয়ে সেই
তুললে রূপের ঢেউ

আকাশ পানে চাইতে ফুল
দেখ্‌লে নেইক কেউ !
গন্ধ নিয়ে এল বয়ে
আনলে চোখের জল
আজ কি সাধে বিষাদে ভাসে
তার প্রেমে এত ছল !
আমি কি ছিলেম, কি হলেম
আর কিবে হই,
এখন সরম রেখে ধরম রেখে
ঝরতে পারি কই !
এখন কি করি কি বলি
রাত যে গেল বয়ে,
এতদিন যে ছিলেম বঁধু
তোমারি ও মুখ চেয়ে
এখন রাঙিয়ে তুল্‌লে হৃদয়-পুর—
গন্ধে হোল ভুর্‌ ভুর
ওই ধেয়ে যে আসে অলি
বল তারেই বা কি বলি...

রাঙিয়া। তা ভোমরার বুলি ত শিখিনি ..আমিই বা কি বলি...
আমি ত জড় অচল মাটি
মাটির সঙ্গে হ'য়ে খাঁটী
শুধুই জল ঢালি—
ফুরিয়েছে সব বলাবলি—

পিয়ারা। ওঃ...

(পিয়ারার চক্ষু দিয়া টপ্‌ টপ্‌ করিয়া জল পড়িতে লাগিল। পিয়ারা একবার মুখ তুলিয়া তাকাইয়া আবার আঁখি নত করিয়া চলিয়া গেল)

রাঙিয়া। চল্‌রে রাঙিয়া নূপুর বেঁধে দিবি চল্‌, তোর আর কি কাষ আছে বল্‌...ওই যে গোলাপী আলোর ওড়না উড়িয়ে আসছে...

(বৃক্ষে বৃক্ষে পাপিয়া ঝঙ্কার করিয়া উঠিল, প্রভাত আগমনের জাগরণ পাপীর রবে কানন মুখরিত হইয়া উঠিল...রাঙিয়া সেই ফুলের নূপুর বক্ষে ধরিয়া পিয়ারার প্রস্থানের পথে নীরবে তাকাইয়া রহিল)...

ষষ্ঠ দৃশ্য।

[কৃষ্ণরায়ের বিলাসকক্ষ...তখন ভোর হয় নাই, অন্ধকারকে ঠেলিয়া আলোক যেন বাহির হইবার বিরাট যুদ্ধ করিতেছে... অরুণ আসিয়া প্রভাতী তারাকে যেন বুকের ভিতর টানিয়া লইতেছে... বিলাসকক্ষ তখন দীপালোকেও যেন ম্রিয়মান—দীপ জ্বলিতেছে কিন্তু তাহার সে দীপ্তি নাই মর্ম্মের চিত্রিত হর্ম্ম্যতলে স্বর্ণাসনে... সম্মুখে বসিয়া পিয়ারা গাহিতেছিল...পার্শ্বে স্ফাটীক নির্ম্মিত পুষ্পাধার ও স্বর্ণমরকত খচিত পুষ্পপাত্র..প্রভাত অরুণালোক তখনও গৃহমধ্যে প্রবেশ করে নাই...

প্রেম এমনি ধারা
ঝরে নয়ন তারা,
যে জন বাসিবে ভাল হবে সে সারা।
ভাল বাসিনু যারে
সারা জীবন ধরে
সে গুণের পিয়া মোর কেলি গেল রে—
আজি সকলি হারা
শুধু চোখের ধারা
মুছাতে কেহ ত নাহি আঁধার কারা।
আজি মরিতে চাহি
শুধু মরণ নাহি

নিমেষে পিয়ারে যদি পরাণে পাহি
ফুল যেমন করে
বনে ফুটে সে ঝরে
তেমনি ফুটিয়া তবে হয় সে ঝরা।
(গান থামিল, কৃষ্ণরায় প্রবেশ করিলেন)

কৃষ্ণরায়। ছিন্ন করি দুই হাতে মোহমৃত্যু-ফাঁস
খুলি হৈমদ্বার হের উদে লো ভাস্বর
জগজন মনোহর, আনন্দ কারণ,
কারণ সলিল হতে, তিমির বাঁধনে
যথা রাখিতে না পারে তারে আর, সেই
মত এই তব বন্ধনের ফাঁস, নিজ
রূপে কাটিতেছ নিজে, গুটীকা যেমতি
কাটি প্রকাশয়ে নিজ অপরূপ রূপ,
হিরণ্ময় পাখা মেলি উড়ে মুক্তপ্রাণ
নীলাকাশে সর্ব্ববন্ধ করিয়া মোচন...

পিয়ারা। গুটীকা আপন মায়া রচি নিজহাতে
নিজে কাটে আপনার জাল, পরকৃত
এ বন্ধন নিজহাতে কাটিব কেমনে
তায় স্বভাবে অবলা আমি বল শুধু
ওই চেয়ে থাকা, পিঞ্জর-আবদ্ধ পাখা
নীলাকাশ পানে যথা চায় চঞ্চু দিয়া
লোহজালে চায় কাটিবারে, ব্যর্থ হয়ে
ঝরে রক্ত, পক্ষ ঝাপটিয়া ছাড়ে ঘন
দীর্ঘ সজল নিশ্বাস, আর কিবা পারে...

কৃষ্ণরায়। বটে বটে লও, লও, এই তব মুক্তি-
পত্র, ভাঙিয়া পিঞ্জর ছাড়ি দিনু তোরে...
হের, আজি তুমি রাজরাজেশ্বরী, ওকি

ছল ছল ও কমল আঁখি, পিয়ারা লো...
সিংহাসন রাজৈশ্বর্য্য কনক-মুকুট
সব তব পায় করি সমর্পণ, রব
শুধু তোমারি সে ধ্যানে, শুধু রব ওই
মুখপানে চাহি...চাহি চাহি...কথা কও
কথা কও...লাজনতা ম্লান শুকতারা
প্রভাত অরুণে হেরি চমকিত কেন...

পিয়ারা। রাজরাজ ক্ষম এ দাসীরে, ক্ষম মোরে
সাম্রাজ্য চাহে না নারী, মুক্তি বিনিময়ে
সাম্রাজ্য না চায় নারী, বিনিময় লেখা
নয় নারীর পরাণে, আজি যদি পুনঃ
স্বাধীনা সে আমি, শুন তবে এ সম্রাট
ফুল যথা ফুটে উঠে জানায় আপনা
ঢালিয়া সুবাস তার প্রাণের মরম,
মরম ভাঙিয়া ঝরে প্রিয়তম পদে,
তেমনি সে নারীজাতি উঠে ফুটে চির
আপন মহিমা লয়ে আপন মরমে,
আঁখি পালটিতে ডারে সে চরণ তলে...
নদী যথা সঙ্গোপনে আনে মণিজাল
অর্পিতে সাগরজলে, চরম তাহার...
সেই তার সার্থকতা, সেই মুক্তি তার—
নহে তব রাজৈশ্বর্য্য যশ খ্যাতি মান
নহে তব বীরত্ব গৌরবগাথা বিশ্ব-
বিজয়িনী, নহে কাম কামানল ভোগ
হব্য-যাগে ঘৃতাহুতি ইন্ধন পুরুষ,
নারী চায় ধর্ম্ম, নহে তাহা রাজধর্ম্ম
তব, প্রাণ ধর্ম্মে ধর্ম্মিণী সে, ভাল যারে

নাহি বাসে, পারে নাক দিতে সে পরাণ

কৃষ্ণরায়। ভালবাসা, ভালবাসা, বল প্রিয়ে ভাল
কি বাসিবে মোরে, হৃদয় উন্মুখ, চিত্ত
পদ্ম কর প্রস্ফুটিত, বল প্রিয়ে বল
আমি ত বেসেছি ভাল, এর চেয়ে কভু
মানুষে কি পারে...পিয়ারা লো! বল তুমি
কারে ভালবাস

পিয়ারা। স্বাধীনা যে জিজ্ঞাসার
অধিকার তারে...নারী ভালবাসে কারে
এ কথা কি বলে কার, বলিতে কি তায়
শুনিয়াছ কভু

(দ্বারের সম্মুখে ধীরে ধীরে পুষ্প অলঙ্কার লইয়া রাঙিয়া আসিয়া দাঁড়াইল, কেহই দেখিল না...)

কৃষ্ণরায়। শুনি নাই, শুনি নাই
তাই চাই শুনিবারে, কহ একবার
কহ বল ভালবাস,

পিয়ারা। ভালবাসিনাক
আমি

কৃষ্ণরায়। আরেরে রাক্ষসী! মায়াবিনা প্রাণ
মনোহরা, ছলে ভুলাইয়ে লহ মুক্তি
আরে নাহি ভালবাস মোরে, আরে...

পিয়ারা। এত
নহে অস্ত্র ঝনৎকার দিগ্বিজয়
প্রমত্ত বারণ সম, পর্ব্বতে আঘাত
এযে দরী প্রস্রবণ ক্ষীণ ধারা বয়
পশুতে কি পারে রোধে কি শকতি তার

কৃষ্ণরায়। সত্য কহ কে চাহে রূপক নাহি ক্ষমা
বল ভালবাস কিনা বাস...

পিয়ারা। ভাল নাহি
বাসি...

কৃষ্ণরায়। মিথ্যা, মিথ্যা, মিথ্যা তব বাণী, আরে...

পিয়ারা। নহে মিথ্যা, ভাল নাহি বাসি, এই লও
মুক্তিপত্র তব, কেবা চাহে, ছার এই
কজ্জ্বল-শোভিত লিপি, শুষ্ক ভূর্জ্জপাতা
অর্থহীন যাহা, একবার কহে মুক্ত
আরবার স্বার্থ আশে রচে মিথ্যা বাণী
প্রলুব্ধ তরঙ্কু সম হরে স্বাধীনতা...
ত্রিভুবন সাম্রাজ্য রতন দলি পায়...
...কিন্তু জানি
ভালবাসা বলে কারে, সে আমার আছে
জীবনে মরণে ধ্যানে শয়নে স্বপনে...
ভালবাসা ভালবাসা, নাম নাই তার
মন্ত্র কভু বলে কহে, হাহা—

কৃষ্ণরায়। তবে তবে বাসিয়েনা ভাল, লহ লহ
চির মুক্তি তবে...
...বুঝিয়াছি বুঝিয়াছি সেই জড় মাটি
হতে মাটি ওই জড় করেছে আশ্রয়

(কৃষ্ণরায় পিয়ারার বক্ষ লক্ষ করিয়া ছুরিকা তুলিলেন, সহসা রাঙিয়া আসিয়া বক্ষ পাতিয়া দিল। কৃষ্ণরায়ের ছুরিকা রাঙিয়ার বক্ষ দীর্ণ করিয়া আমূল বিদ্ধ হইল···রাঙিয়া সেই সমস্ত পুষ্প-অলঙ্কার ও ফুলসম্ভার লইয়া পিয়ারার চরণতলে লুটাইয়া পড়িল... পিয়ারা তাহাকে বাহুবেষ্টনে জড়াইয়া ধরিল...

...আরে আরে জড়মূক
পাষাণ প্রাচীর কি করিলি...

ও দিকে রাজ্ঞী মধুমালতী দ্রুত আসিতেছিলেন—দ্বারের সম্মুখে আসিয়াই চমকিয়া উঠিলেন, কহিলেন

মধুমালতী। রক্ত, রক্ত......মহারাজ, এই তব রাজকার্য্য!

রাঙিয়া। হাহা, বোল্ ফুটেছে, জড়েরও প্রাণ আছে, তাই জড় জড়ো করে ঝড় ওঠে...জড় মাটিতেই ফুল ফোটে, ফল ধরে, তাই বোঁটা থেকে আল্‌গা হয়ে ঝরে...ওই যে শ্যামা কি বলে না গুল্ গুল্ পিয়া! পিয়া! ও সখি ফোট্ ফোট্ ...না—না—আয় ঘুম আয়, অনেক দিন ধরে বুকের ভেতর দোলাচ্ছিলি—এই আয় ঘুম আয়...

(রাঙিয়া চক্ষু মুদ্রিত করিল)

কৃষ্ণরায়। রাঙিয়া! রাঙিয়া!...

কি কি? মুহূর্ত্তেকে কিসের এ যবনিকা
ধরা পরে ছায়, ঝাঙ্কৃত ঝিল্লীকা গীতি
নিস্তব্ধ নীরব, সব স্বর গেল থেমে—
জীবনের এই পরিণতি,—থেমে গেল
কাল, অনন্ত আরম্ভ হোল. জন্মমৃত্যু
স্বাদ পেলে, তুমি মুক্ত! জন্মমৃত্যু হাতে
যার বাঁধা...

(হঠাৎ একটা জোর বাতাস আসিয়া প্রদীপ নিভাইয়া দিল, দূর কানন-রাজীর বৃক্ষপত্র মধ্য হইতে আরক্ত সূর্য্য উঠিয়া তাকাইল... পিয়ারা নিশ্বাস ফেলিয়া অবশ হইয়া পড়িল...কৃষ্ণরায় দেখিলেন.. মঞ্জীরের রক্তমাখা পদ্ম আপ্‌নি আপ্‌নি পাপড়ি মেলিতেছে...)

বাহিরে তখন কামানের ঘোর ঘর্ঘর ধ্বনি গর্জ্জিয়া উঠিতেছিল... প্রভাতালোকে দেখা গেল বিজয়নগরের দুর্গপ্রাচীরে জ্বলন্ত গোলা আসিয়া পড়িতেছে।...

(যবনিকা পতন।)

শ্রীসত্যেন্দ্রকৃষ্ণ গুপ্ত।

কিশোর-কিশোরী

সে দিন নাহি গো আর যবে ভালবাসিতাম
শুধু মোর হৃদয়ের ভালবাসারে!
ভালবাসি, ভালবাসি, মনে মনে কহিতাম!
কারে ভালবাসি আমি নিজে নাহি জানিতাম!
হাসিতাম, কাঁদিতাম, শুধু ভালবাসিতাম
আপনারই হৃদয়ের ভালবাসারে!

কল্পনা-গগনালোকে উড়ে উড়ে ভাসিতাম!
সত্য বলে ধরিতাম সেই কল্পনারে—
মেঘের আড়ালে মোর মায়ানীড় বাঁধিতাম,
স্বপন মন্থন করা ফুলে ফুলে সাজাতাম,
কত দীপ জ্বালিতাম, কত গীত গাহিতাম,—
মেঘের আড়ালে মোর সেই মায়া-আগারে!

কেহ ভালবাসে নাই! তবু ভালবাসিতাম,
শুধু মোর হৃদয়ের ভালবাসারে!
ভালবাসা ভালবাসা, বলে শুধু কাঁদিতাম,
কারে কহে ভালবাসা তাও নাহি জানিতাম,
মধুর প্রেমের মূর্ত্তি মনে মনে গড়িতাম—
পূজিতাম দেহহীন সেই দেবতারে!

সেই প্রেম নিরাকার কতদিন থাকে আর ?
সব শূন্য হয়ে গেল জীবন-ভাণ্ডারে !—
নিভিল সে দীপাবলী, ছিঁড়িল সে ফুলহার,
নির্জ্জন পরাণ ভ'রে উঠিল রে হাহাকার !—
সে দিন বহিয়া গেল, যবে ভালবাসিতাম
শুধু মোর হৃদয়ের ভালবাসারে !
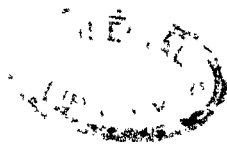
নারায়ণ

২য় বর্ষ, ২য় খণ্ড, ৪র্থ সংখ্যা] [ভাদ্র, ১৩২৩ সাল

মহাপ্রভু-সার্ব্বভৌম সংবাদ

মাঘ শুক্লপক্ষে প্রভু করিল সন্ন্যাস।
ফাল্গুনে আসিয়া কৈল নীলাচলে বাস॥
চৈত্র রহি কৈল সার্ব্বভৌম বিমোচন।
বৈশাখ প্রথমে দক্ষিণ যাইতে হৈল মন॥

চৈ, চ, মধ্যঃ ষষ্ঠ—

ইচ্ছা এক; ঘটনা আর। চৈতন্যদেব দেখিলেন দেশে ধর্ম্মের দুর্ভিক্ষ, নীতির মহামারী, কৃপার অনাবৃষ্টি, সমাজনেতৃগণ অধিকাংশই উৎপথগামী, গৃহস্থেরা সংসারাসক্ত, সন্ন্যাসীগণ মর্কটবৈরাগ্যে অনুরক্ত, সুতরাং জগতের জীবনিবহের দশা অতীব শোচনীয়। অতএব এরূপক্ষেত্রে স্বার্থসঙ্কীর্ণতা-ত্যাগ এবং ধর্ম্মনীতির আদানপ্রদানে উদারতা একান্ত প্রয়োজন হইয়া উঠিয়াছে। এই নিমিত্ত তিনি শ্রীনবদ্বীপ মহানগরীতে জাতি-বর্ণ-নির্ব্বিশেষে অযাচিতভাবে শ্রীকর-পল্লবহিল্লোলে কলিহতমর্ত্ত্যদলে ডাকিয়া ডাকিয়া শ্রীভগবানের নাম-প্রেম বিতরণ করিতে আরম্ভ করিলেন। কিন্তু হইল কি? সম্পূর্ণ বিপরীত। নদীয়ার "ভূদেবগণ" একবারে বিরূপ হইয়া উঠিলেন। বিরূপ হইবেন না কেন? এদিকে যে দেবেন্দ্রগণের নন্দনকাননে

পারিজাত-হরণ আরম্ভ হইয়া গিয়াছে—তাঁহাদের বড় সাধের প্রমোদ-উদ্যানে যে দুর্দ্দান্ত দানব প্রবেশ করিয়াছে। এখন দ্বিজেন্দ্রদলের যে ইন্দ্রজালের কুহক ভাঙ্গিয়া যায়, নামপ্রেমের প্রবাহে তাহাদের কাঠ পাথর-মাটির সেতু যে নিঃশেষ ভাসিয়া চলে। তাঁহাদের নদীয়াচলের বারিভধার মন্দির-কন্দরের সুখময় তিমিররাজ্যে যে অকস্মাৎ মধ্য-দিনের মিহির উদয় হইয়া পড়িয়াছে। যাহাই হউক, ব্রাহ্মণগণ অজ্ঞতা এবং স্বার্থান্ধতাবশতঃ চৈতন্যদেবের উদার ধর্ম্ম-নীতির প্রচার কার্য্যে বিশেষ বাধা উৎপাদন করিতে লাগিলেন। সে বাধা শুদ্ধ "ঘটত্ব পটত্ব" বা "স্যাৎ ন স্যাৎ" লইয়া তর্কযুক্তি বাদবিতণ্ডার রণ-যাত্রা নহে, সে এক বিষম ভীষণ ব্যাপার। নবদ্বীপের "ভূদেবগণ" এখন যেন দেব-দেহ মায়াচ্ছন্ন করিয়া ইতর-জীবকলেবর ধারণ-পূর্ব্বক চপেট বিটপী লইয়া প্রাণপণ প্রযত্নে তাঁহাদের সুখের রাজ্য রক্ষা করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। বাবাজীরা টোল ছাড়িয়া কাজী সাহেবের দরবার পর্য্যন্ত দৌড়াইলেন! ঘটত্বপটত্বাদি ত্যাগ করিয়া লাঠি লইয়া শ্রীগৌরাঙ্গের সঙ্কীর্ত্তনের মৃদঙ্গ ভাঙিতে ছুটিলেন! সর্ব্বনাশ! ইচ্ছা এক ঘটনা অন্য।

এইবার মহাপ্রভু স্থির করিলেন, সমাজের নিগড়ে বদ্ধ থাকিয়া, সামাজিকগণের সহিত ব্যবহারিক সম্পর্ক রাখিয়া, কেবলমাত্র নবদ্বীপ-নগরকেন্দ্রে দাঁড়াইয়া প্রচার-কর্ম্ম আর চলিবে না। এখন সন্ন্যাস করিয়া সকল পাশবিমুক্ত মুক্ত-গগনের বিহঙ্গ হইয়া পক্ষ-বিস্তার-পূর্ব্বক অন্তরীক্ষ আলোড়িত করিয়া বেড়াইতে হইবে, নচেৎ কিছুতেই জগতের হিতসাধন হইবে না। এইজন্যই শ্রীচৈতন্যের সন্ন্যাস গ্রহণ।

এইভাবে শ্রীশ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু মাঘমাসের শুক্লপক্ষে কণ্টকনগরে ভারতীস্বামীপাদের নিকট সন্ন্যাস-মন্ত্রে দীক্ষিত হইলেন। মহাপ্রভুর মনের সাধ মিটিল, পাশমুক্ত বিহঙ্গ অসীম আকাশে আশ্রয় গ্রহণ করিল, নদীয়ার দ্বিজগণের পূর্ব্ব-পক্ষ বা পক্ষান্তর আর

সেদিকে চলিল না। তাঁহাদের "চড়চাপড় মুষ্ট্যাঘাতের" দুরভি-সন্ধিময় বীভৎস-যুদ্ধযাত্রা কন্দীর ন্যায় নবদ্বীপ-দ্বীপান্তরেই রহিয়া গেল। মহাপ্রভু সন্ন্যাস লইয়া নীলাচলে উপনীত হইলেন। তখন ফাল্গুন মাস—ভক্তবৃন্দ-পরিবৃত হইয়া আচার-প্রচারে তিনি পুরী-ধামেই রহিয়া গেলেন। চৈত্র মাস হইতে মহাপ্রভুর অভিনব প্রেম-ধর্ম্মের বিচিত্র প্রচার আরম্ভ। এখানে তাঁহার প্রথম সঙ্গ এবং প্রসঙ্গ বাণীবরপুত্র বাসুদেব সার্ব্বভৌমের সহিত।

বাসুদেব অনুদারনীতি অথচ অদ্বৈতবাদী মহিমাময় মহাপণ্ডিত। তাঁহার যশোগৌরব তৎকালে বঙ্গদেশ বিশ্রুত ছিল; ভারত-বিশ্রুত বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। লক্ষ লক্ষ লোক তাঁহার মতানুবর্ত্তী। মহাপ্রভুকে তিনি সামান্য সন্ন্যাসী জ্ঞানে সন্ন্যাসভঙ্গের বিবিধ ভয়প্রদর্শন এবং বেদান্ত-শ্রবণাদির বহুবিধ উপদেশ প্রদান-অনন্তর নিজগৃহে শাঙ্কর-ভাষ্য শ্রবণের নিমিত্ত সাগ্রহ আহ্বান জানাইলেন। মহাপ্রভুও আপনার মূর্খতা অযোগ্যতা প্রভৃতি নানাপ্রকার দৈন্যোক্তি প্রকাশের পর সার্ব্বভৌমের নিকট বেদান্ত-শ্রবণে সম্মতিপ্রদান করিয়া তদীয় আহ্বান গ্রহণ-পূর্ব্বক সার্ব্বভৌমের অনুগমন করিলেন। সার্ব্বভৌম শাঙ্কর-ভাষ্য সহিত ব্রহ্মসূত্র শ্রবণ করাইতে আরম্ভ করিলেন। মহাপ্রভুও নীরবে সপ্তাহকাল তথায় শারীরক-ভাষ্য শ্রবণ করিলেন। কিন্তু এক্ষণে সার্ব্বভৌমের মনে সন্দেহ হইল, মহাপ্রভু তাঁহার ব্যাখ্যাত শারীরক-ভাষ্য বুঝিতে পারিতেছেন না। তিনি ভাবিলেন, চৈতন্য প্রথমেই যখন আপনার মূর্খতা এবং অযোগ্যতা সর্ব্বজন সমক্ষে স্বীকার করিয়াছেন, তখন নিশ্চয়ই তিনি এ দুরূহ শাঙ্করভাষ্য বুঝিতেছেন না। বুঝিলে এরূপ নীরবে বসিয়া থাকিবেন কেন? বাস্তবিকই মহাপ্রভু প্রেমোচ্ছ্বাসপূর্ণ স্বাভাবিক দৈন্যবশতঃ ইতঃপূর্ব্বে সার্ব্বভৌম সমীপে যে অজ্ঞতা এবং অযোগ্যতা জ্ঞাপন করিয়াছিলেন, সার্ব্বভৌম তাহাই সত্য বলিয়া বিবেচনা করিয়াছিলেন। সুতরাং এক্ষণে পণ্ডিত-সভায় সহসা একটি বিশেষ কৌতূহলময় চমৎকার ঘটনা সংঘটিত

হইল। সহস্র সহস্র লোক অস্থিকে দূরে বসিয়া দাঁড়াইয়া সন্ন্যাসী সার্ব্বভৌমের কথোপকথন শ্রবণে নির্ভর-বিস্ময়বিমূঢ় হইয়া পড়িতে লাগিল। সার্ব্বভৌম মহাপ্রভুকে যাহা বলিলেন, কৃষ্ণদাস কবিরাজ চরিতামৃতে তাহার এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন ;—

অষ্টম দিবসে তাঁরে পুছে সার্ব্বভৌম।
সাত দিন কর তুমি বেদান্ত শ্রবণ॥
ভালমন্দ নাহি কহ রহ মৌন ধরি।
বুঝ কি না বুঝ ইহা জানিতে না পারি॥
প্রভু বলে মূর্খ আমি নাহি অধ্যয়ন।
তোমার আজ্ঞায় মাত্র করি যে শ্রবণ॥
সন্ন্যাসীর ধর্ম্ম লাগি শ্রবণ মাত্র করি।
তুমি যেই অর্থ কর বুঝিতে না পারি॥
ভট্টাচার্য্য কহে, না বুঝি হেন জ্ঞান যার।
বুঝিবার লাগি সেই পুছে পুনর্ব্বার॥
তুমি শুনি শুনি রহ মৌনমাত্র ধরি।
হৃদয়ে কি আছে তোমার বুঝিতে না পারি॥
প্রভু কহে সূত্রের অর্থ বুঝি যে নির্ম্মল।
তোমার ব্যাখ্যা শুনি মন হয়ত বিকল॥
সূত্রের অর্থ ভাষ্য কহে প্রকাশিয়া।
ভাষ্য কহ তুমি সূত্রের অর্থ আচ্ছাদিয়া॥
সূত্রের মুখ্য অর্থ না কর ব্যাখ্যান।
কল্পার্থে তুমি তাহা কর আচ্ছাদন॥
উপনিষদ শব্দের যে মুখ্য অর্থ হয়।
সেই অর্থ মুখ্য ব্যাসসূত্রে সব কয়॥
মুখ্যার্থ ছাড়িয়া কর গৌণার্থ কল্পনা।
অভিধাবৃত্তি ছাড়ি শব্দের কর লক্ষণা॥

প্রমাণের মধ্যে শ্রুতি প্রমাণ প্রধান।
শ্রুতি যে মুখ্যার্থ কহে সেই সে প্রমাণ॥
স্বতঃ-প্রমাণ বেদ সত্য যেই কহে।
লক্ষণা করিলে স্বতঃ-প্রামাণ্য হানি হয়ে॥
ব্যাসের সূত্রের অর্থ সূর্য্যের কিরণ।
স্বকল্পিত ভাষ্য-মেঘে করে আচ্ছাদন॥
বেদ পুরাণে কহে ব্রহ্ম নিরূপণ।
সেই ব্রহ্ম বৃহৎ বস্তু ঈশ্বর লক্ষণ॥
ষড়ৈশ্বর্য্য পরিপূর্ণ স্বয়ং ভগবান্।
তাঁরে নিরাকার করি করহ প্রমাণ॥
ষড়ৈশ্বর্য্য পূর্ণানন্দ বিগ্রহ যাঁহার।
হেন ভগবানে তুমি কর নিরাকার॥
স্বাভাবিক তিন শক্তি যেই ব্রহ্মে হয়।
নিঃশক্তি করিয়া তাবে করহ নিশ্চয়॥
সৎচিৎ আনন্দময় ঈশ্বর স্বরূপ।
তিন অংশে চিৎশক্তি হয় তিন রূপ॥
আনন্দাংশে হ্লাদিনী, সদংশে সন্ধিনী।
চিদংশে সম্বিৎ যারে জ্ঞান করি মানি॥
অন্তরঙ্গ চিচ্ছক্তি—তটস্থা জীবশক্তি।
বহিরঙ্গ মায়া তিনে করে প্রেম ভক্তি॥
প্রণব যে মহাবাক্য ঈশ্বরের মূর্ত্তি।
প্রণব হইতে সর্ব্ববেদ জগতে উৎপত্তি॥
তত্ত্বমসি জীব হেতু প্রাদেশিক বাক্য।
প্রণব না মানি তারে কহে মহাবাক্য॥
এই মত কল্পনা-ভাষ্যে শত দোষ দিল।
ভট্টাচার্য্য পূর্ব্বপক্ষ অপার করিল॥

বিতণ্ডা ছল নিগ্রহাদি অনেক উঠাল।
সব খণ্ডি প্রভু নিজমত সে স্থাপিল॥
চৈ, চ, মধ্যঃ ষষ্ঠ।

কবিরাজ-বর্ণিত পয়ার কতিপয়ের স্থূলমর্ম্মে ইহা প্রকাশ পায় যে—বেদের তাৎপর্য্য গ্রহণের গোলযোগে ভীষণ গণ্ডযোগ উপস্থিত হইয়া এই সময় বিদ্বদ্মণ্ডলীর বুদ্ধিবৃত্তি পর্য্যন্ত আমূল কলুষিত করিয়া তুলিয়াছিল। সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য মহাশয়ও সেই মোহ-কূপে পতিত হইয়াছিলেন। শঙ্করাচার্য্য বৌদ্ধগণকে বিমোহিত করিবার উদ্যমে একবারে সমগ্র সমাজকেই অভিভূত করিয়া ফেলিয়াছিলেন। যে সময় শঙ্কর স্বকপোল কল্পিত ভাষ্যের প্রচার-কার্য্য আরম্ভ করেন তখন দেশে প্রায় সকলেই বৌদ্ধভাবাপন্ন, সুতরাং প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ-মত মায়াবাদ প্রচারে শঙ্কর সহজেই কৃতকার্য্য হইতে পারিয়াছিলেন। আজ সার্ব্বভৌমের সঙ্গে মহাপ্রভুর সেই মায়াবাদ লইয়াই আলাপ।

সার্ব্বভৌম শাঙ্কর-ভাষ্যের সাহায্যে সকলকে বুঝাইলেন,—বেদ ব্রহ্মকে নিরাকার নিরৈশ্বর্য্য অর্থাৎ একবারে দেহবিভূতি প্রভৃতি শূন্য বলিয়াছেন, তিনি চিন্মাত্র নিরীহ। ব্রহ্মের উপরেই এই বহুধা বিচিত্র জগতের ভাণ হইয়াও রজ্জুসর্প শুক্তিরজত বা মণিবহ্নিবৎ অলীক এবং অপ্রমাণ। ইহা বিবর্ত্তমাত্র, সত্য নহে।

তারপর ভট্টাচার্য্য "তত্ত্বমসি", "সোঽহং" "ব্রহ্মাস্মি" "প্রজ্ঞানং ব্রহ্ম" ইত্যাদি কল্পিত জীব ব্রহ্মের অভেদ প্রতিপাদক বাক্যার্থে সাধারণকে মোহিত করিয়া শঙ্করের প্রচারিত তত্ত্বকে জয়যুক্ত করিয়া তুলিতেছিলেন। যে-সকল স্থলে বেদে ব্রহ্মের জগৎ-কর্ত্তৃত্বাদি বর্ণিত হইয়াছে, পণ্ডিতপ্রবর শঙ্করের ভাষাবলে তাহাতেও লক্ষণার কল্পনা করিয়া সকলকে পরিতুষ্ট করিতে লাগিলেন। সকলের ইহা ভাল লাগিতে পারে, কিন্তু মহাপ্রভুর লাগিবে কেন?

শ্রীমন্মহাপ্রভু মৌনভঙ্গ করিয়া ভট্টাচার্য্যের বাক্যের প্রতিবাদ আরম্ভ করিলেন। মহাপ্রভু যাহা বলিলেন তাহার মর্ম্মে সকলে

বুঝিল মহাপ্রভু মূর্খ নহেন—জ্ঞানী, বোধ হয় ভাষ্যকর্ত্তা শঙ্কর অপেক্ষাও প্রতিভাসম্পন্ন মহাপুরুষ। সূত্রকর্ত্তা-বেদব্যাসের উদ্দেশ্যের সহিত শারীরক ভাষ্যের তাৎপর্য্যের সামঞ্জস্য নাই। উপনিষদ এবং ব্যাস-সূত্রের লক্ষ্য এবং মর্ম্ম একই, কেবল ভাষ্যের সঙ্গেই তাহার সঙ্গতির অভাব। মহাপ্রভুর বাক্যে সকলে বুদ্ধিস্থ হইতে লাগিল, সত্য সত্যই ব্যাসসূত্র এবং উপনিষদের অর্থের গতি সরল পথে, কিন্তু শঙ্করের ভাষ্যের গতি কুটিল বর্ত্মে। বাস্তবিকই সূত্র যেন প্রোজ্জ্বল সূর্য্যালোকে আলোকিত, পরন্তু শারীরক ভাষ্য নিবিড় ঘনঘটা, সে যেন সেই সূর্য্যালোক আবৃত করিয়া রাখিতে চাহিতেছে। সকলে বুঝিতে পারিল ব্যাসদেব এবং উপনিষদের ঋষিগণের * ভ্রম, প্রমাদ, বিপ্রলিপ্সা (false assertion), করণাপাটব দোষ নাই। কিন্তু শঙ্করের পদে পদে প্রতি পঙক্তিতে সম্পূর্ণ বিপ্রলিপ্সা পরিলক্ষিত। বৌদ্ধ-বুদ্ধিবিমোহন শঙ্করের ভাষ্যে বিপ্রলিপ্সার পরিচয় বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীমুখ হইতে সিদ্ধান্ত হইতে লাগিল ;—বেদ-জ্ঞান-বিশ্বজীবের স্বরূপানুভূতি—ব্রহ্মার হৃদয়েতে (Universal mindএ) ইহার প্রকাশ। যাহা অনুভূতি তাহা অনুভাবক এবং অনুভব্যের সহিত যে নিত্যসম্বন্ধে সম্বন্ধ তাহাতে আর কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। যেহেতু অনুভাবক না থাকিলে অনুভব্যের প্রমাণ নাই, অনুভব্য না থাকিলে অনুভাবকের প্রমাণাভাব। পক্ষান্তরে অনুভূতি থাকিতে গেলে, অনুভব্য

ভ্রম—মানবের অজ্ঞতাদিজনিত একে অন্যথা-বুদ্ধি।

প্রমাদ—বিজ্ঞতাসত্ত্বেও আকস্মিক একান্যথা ভাব।

বিপ্রলিপ্সা—কোন সিদ্ধান্ত বিশেষ প্রতিষ্ঠা-নিমিত্ত ইচ্ছা-ভ্রান্তি।

করণাপাটব দর্শনিবৎ ভ্রম—ইন্দ্রিয়দোষজনিত শঙ্খে পীতবর্ণ করণের অপটুতানিবন্ধন।

এই চতুর্ব্বিধ ভ্রম ব্যতীত মানবের অন্য কোন ভ্রম নাই।

এবং অনুভাবক না থাকিলে চলিতেই পারে না। যেহেতু সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে যে সে-বেদ সে-জ্ঞান সে-অনুভূতি সে-প্রকাশ নিরাত্মকপ্রায় নিরালম্ব চিন্মাত্র বস্তুবিশেষ নহে। তাহা স্বগত ব্যাপ্য বৃত্তির প্রভাবে অনুভাবক অনুভব্য উভয় কোটির উপর অবাধ-প্রতিষ্ঠিত নিত্যসত্য। এই গেল মহাপ্রভুর বেদ সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত মতবাদ।

সার্ব্বভৌম শঙ্কর-মত অবলম্বনে "তত্ত্বমসিকে" মহাবাক্য বলিয়া সাধারণকে বুঝাইয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন, তৎ পদে ব্রহ্ম, ত্বং পদে জীব, অসি পদে অদ্বৈত ভাব-বোধক একক্রিয়াম্বয়। জীবব্রহ্মে আপাত দৃষ্টিতে যাহা ভেদ তাহা অলীক এবং অপ্রমাণ। জীবের সহিত ব্রহ্মের মুখ্য অর্থে একত্ববাদ হইলেও শব্দের লক্ষণা অর্থাৎ গৌণ অর্থে কিছুমাত্র সে বাধার সম্ভাবনা নাই। বৃহৎ স্বার্থ লক্ষণা দ্বারা অভেদত্ব প্রতিপাদিত হইতে পারে। কিন্তু মহাপ্রভু তত্ত্বমসির মহাবাক্যতা অস্বীকার করিলেন।

তিনি বলিলেন, তত্ত্বমসি প্রভৃতি কোনটিই মহাবাক্য নহে,—মহাবাক্য প্রণব—ওঁকার, সেই অনুভব্য-অনুভাবক-অনুভূতিময় নিত্য-পদার্থটি। যাহাতে অচিন্ত্য বক্তৃবোদ্ধব্য-বাক্যের নিত্যসমাবেশ, তাহাই মহাবাক্য, তাহা সর্ব্ববিশ্বধাম ঈশ্বর। বিশ্বসখ্য, বিশ্ব-বাৎসল্য, বিশ্বদাস্য, বিশ্বমাধুর্য্য, বিশ্বশান্ত্যাদি, সেই অনন্ত অসীমে, ভূমা স্বরাট্ পরম পুরুষে শাশ্বৎসম্বন্ধে বর্ত্তমান, সে সখ্যদাস্যবাৎসল্যাদির মহাবাক্যরস ত ভক্ত-হৃদয়ের আস্বাদনের সামগ্রী।

সেই অনিরুক্ত-বক্তৃ-বোদ্ধব্য-বাক্যনিষ্ঠ প্রণব মহাবাক্য মুখে বলিবার বুঝাইবার পদার্থ নহে। "গঙ্গায়াং ঘোষঃ" বলিয়া লক্ষণার সপ্তকোটি-কুল আহ্বান করিয়া আনিলেও সে ঘোষকে বুঝিতে পারা যায় না। সেটি সেই নন্দ-ঘোষ-পল্লীর, আমার প্রাণধন পরমব্রহ্মের মন্ত্রমুরলীর কোমল-কান্ত-ললিত কল-গীতির মধুর সংঘোষ। তাহাই ত কাম-মণ্ডলের সেই—"বামদৃশাং মনোহরং" ফলসঙ্গত। ফলতঃ তত্ত্বমসি

প্রভৃতি মহাবাক্য নহে, প্রণবই মহাবাক্য, ইহাই মহাপ্রভুর উক্তি। মহাপ্রভুর মতে তত্ত্বমসি প্রণবের অনুবাক্—তৎপদে বুঝায় সেই অনুভব্যকে, ত্বং পদে সূচনা করে অনুভাবকের, অসি পদে প্রমাণিত করে উহাদের অচিন্ত্য প্রেমসম্বন্ধটীকে; সুতরাং অনুবাক্যগুলি মহাবাক্যের অর্থেই অর্থযুক্ত।

অনন্তর মহাপ্রভু বলিলেন;—মহাবাক্য ওঁকারের অ উ এবং মকার লইয়া যে তান্ত্রিকী ব্যাখ্যা আছে, তাহা ত বিপ্রলিপ্সা বিশেষ। উহার অর্থ অকারে অসীম অনন্ত, অনিরুক্ত, অব্যপদেশ্য ইত্যাদি নঞর্থক অকারাদিক শব্দ বাচ্য ভূমা; উকারে তদীয় উপলব্ধি; মকারে উপলব্ধা মনুজনিবহ। ইহা ভিন্ন অন্য কিছুই হইতে পারে না। মহাপ্রভুর মতে মহাবাক্য যাহা স্বপ্রকাশানন্দ-চিন্ময় সমূহালম্বমাত্মক রসস্বরূপ পরমপদার্থ—তাহার সম্বন্ধে মুখ্যবৃত্তি ভিন্ন লক্ষণাবৃত্তির অবসর কোথায়?

এতক্ষণে সার্ব্বভৌমের সঙ্গে সঙ্গে সভামণ্ডলীও দেখিল, শ্রীগৌরাঙ্গের চমৎকার বেদান্তবাদ, অপূর্ব্ব প্রেমতত্ত্ব, মধুর শাস্ত্রসিদ্ধান্ত অনর্পিত ভক্তিশ্রী আসিয়া আজ নীলাচল আলোকিত করিয়া তুলিয়াছে। সকলের এতদিনের মূঢ়তায় গূঢ় রহস্য প্রকাশিত হইয়া পড়িয়াছে। আজ যেন বেদান্তের প্রাণপ্রতিষ্ঠা এবং ব্রহ্মসূত্রের কলঙ্কভঞ্জন হইয়া গেল। আজ ভট্টাচার্য্য দিব্যচক্ষে দেখিলেন—সত্য, সকলই সত্য। ব্রহ্ম সত্য, জীব সত্য, জগৎ সত্য। আজ বুদ্ধের মায়ার স্বপ্ন গৌরাঙ্গ সমূলে ভগ্ন করিয়া দিয়াছেন।

চৈতন্যদেব সার্ব্বভৌমের অবস্থা দেখিয়া বুঝিলেন,—ভট্টাচার্য্য আজ প্রকৃতিস্থ। পণ্ডিতপ্রবর এখন শঙ্করের শ্মশান-পথ ছাড়িয়া তাঁহারই নিকুঞ্জ-পথে চলিয়াছেন। দেখিলেন—এখন তিনি মায়াবাদের মিথ্যাত্ব উপলাভ করিয়া জগৎকে সত্যে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। এখন চাই তর্কশ্রান্ত ক্লান্ত অতিথির প্রীতিপরিচর্য্যা। চৈতন্যদেব স্পষ্টাক্ষরে বুঝাইলেন পরমব্রহ্ম ও শ্রীভগবান্ সচ্চিদানন্দস্বরূপ—সন্ধিনী-

সম্বিৎহ্লাদিনী—তাঁহার চিৎশক্তি,—সদংশে সন্ধিনী—চিদংশে সম্বিৎ এবং আনন্দাংশে হ্লাদিনী—এই ত্রিশক্তি মিলিয়া তাঁহার অন্তরঙ্গ প্রেমলীলা ; এবং এই প্রেমলীলারই বিবর্ত্ত বহিরঙ্গ রতিলীলা, ইহাকে সাধারণ বিবর্ত্ত-সংজ্ঞা না দিয়া প্রেমবিলাস-বিবর্ত্ত সংজ্ঞা দেওয়াই সুসঙ্গত। ভট্টাচার্য্য সংকৃত হইলেন, বুঝিলেন জীব ভগবানের তটস্থা শক্তি—ভগবানের রসলীলা এবং রতিলীলার কুঞ্জমঞ্জরী—সুনিপুণ অভিনেত্রী, বহিরঙ্গীয় তাহার নেপথ্য বিধি, অন্তরঙ্গীয় তাহার অভিনয়। লীলা দুইটি পৃথক্ নহে, এক রঙ্গেরই অন্তর বাহির বিভাগ মাত্র। দুই' সত্য, দুই' নিত্য। একটি প্রবাহ—একটি পয়োধি। প্রবাহের গতি পয়োধি—পয়োধির গতি প্রবাহ। সার্ব্বভৌম একেবারে বিস্ময়সাগরে ডুবিয়া গেলেন।

তখন—

প্রভু কহে ভট্টাচার্য্য না কর বিস্ময়।
ভগবানে ভক্তি পরমপুরুষার্থ হয়।
আত্মারাম পর্য্যন্ত করে ঈশ্বর ভজন।
ঐছে অচিন্ত্য ভগবানের গুণ।

শ্রীঅবিনাশচন্দ্র কাব্যপুরাণতীর্থ।

বংশী-সাধনে

ওরে, বাঁশীস্বর শুনি আসিল হরিণী
এল না এল না শ্যাম।
আমি, নির্জনে বসিয়া বাঁশরী সাধিয়া
একি সিদ্ধি লভিলাম!
এ ধীর সমীরে যমুনার তীরে,
মোরে, মুরলী সঁপিয়া শঠ!—
কোন্ রন্ধ্রে কোথা, বাজে কোন্ ব্যথা,
শুধু, না শিখাবে সে কপট!—
যে রন্ধ্রে চাপিলে তার দেখা মিলে
কোন্ রন্ধ্রপথে আসে।
সে, বঙ্কিম ভঙ্গিম অধর রঙ্গিম
সুশোভিত মৃদুহাসে।
বাঁশীটি অর্পিয়া মোরে ভুলাইয়া পিয়া!
গেছে ত্যজি ব্রজধাম,
ওরে, আমি কি মোহে ভুলিয়ে তারে ছেড়ে দিয়ে
বাঁশী নিয়ে রহিলাম।
স্ফুট বনপ্রান্ত, এসেছে বসন্ত,
সেই যমুনাপুলিন ওই!—
বিহগকূজন -মুখরিত বন,
মোর পুলিনবিহারী কই?
যত কিছু সুর শিখালে মধুর
সবই, সাধিলাম বসে একা,

সমাগত মধু তুমি কোথা বঁধু!—
এখনো না দিলে দেখা।
তবে যাই চলি রাখিয়া মুরলী
লুকি ওই কদম্বের তলে,
যদি অভ্যাসের বশে এসে, নিশিশেষে—
ডাকে, রাধা রাধা বলে।

শ্রীগিরীন্দ্রমোহিনী দাসী।

সাহিত্য ও সুনীতি *

[প্রতিবাদ]

পরমশ্রদ্ধাস্পদ স্বনামধন্য শ্রীযুক্ত অরবিন্দ ঘোষ মহাশয় জ্যৈষ্ঠ মাসের "নারায়ণে" আর্ট ও আধ্যাত্মিকতার সম্বন্ধে বিচার করিয়াছেন। সাহিত্যের আদর্শ ও ব্যবহার সম্বন্ধে কয়েকমাস ধরিয়া যে বাদপ্রতিবাদ চলিতেছে, অরবিন্দবাবুর লেখাটা তাহার মীমাংসা করিবার চেষ্টা করিয়াছে।

সাহিত্যের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে আলোচনা করিতে যাইয়া লেখক বলিয়াছেন, "আর্ট দেশকালের অতীত। শিল্পী দেখেন শুধু চিরন্তন সত্য। উদাসীন ভাবে ধ্যান করেন পাপ পুণ্যে, ক্ষুদ্রে বৃহতে,

---

* ভ্রমবশতঃ গত জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় 'আর্টের আধ্যাত্মিকতা' প্রবন্ধটি শ্রীযুত অরবিন্দ ঘোষ মহাশয়ের নামে বাহির হইয়াছিল। আমরা পরে জানিলাম যে ঐ প্রবন্ধের লেখক শ্রীযুত নলিনীকান্ত গুপ্ত।—"নারায়ণ"-সম্পাদক।

অন্তের মধ্যে কল্যের মধ্যে ভগবানের বিচিত্র সত্তা তাহাই তিনি ফলাইয়া লোকের নয়নগোচর করেন।” তাঁহার মতে আর্ট কোন আদর্শ প্রতিষ্ঠাকল্পে নিয়োজিত হয় না, কোন মঙ্গল উদ্দেশ্য সাধন-কল্পে আর্ট নিয়োজিত হইলে মানুষের জ্ঞান সীমাবদ্ধই থাকিবে, জগতের অনেক রহস্য আবরিত থাকিয়া যাইবে।

ভগবান পূর্ণরসের আধার। মানুষের অধ্যাত্মজীবন, মানুষের উদারতা, মহত্বের মধ্যে যেমন ভগবানের প্রকাশ, সেরূপ মানুষের নীচতা, সঙ্কীর্ণতা ও হীনতার মধ্যেও ভগবান রহিয়াছেন।

অরবিন্দবাবু বলিয়াছেন, সাধু শুধু শুচির মধ্যে, ত্যাগের মধ্যে, সাধুতার মধ্যে ভগবানের খোঁজ করেন, শিল্পীও তাহা করেন, উপ-রন্তু তিনি তাঁহাকে অশুচির মধ্যে, হীনতার মধ্যে ইন্দ্রিয়পরতার মধ্যেও খুঁজিয়া বেড়ান। সাধু ও শিল্পীর এই প্রভেদ-করণ নির-র্থক। অরবিন্দবাবু সাধু অর্থে কি বুঝেন? বুদ্ধদেব কাশীর বার-নারীকে, যীশুখৃষ্ট Woman of Samariaকে, চৈতন্যদেব জগাই-মাধাইকে উদ্ধার করিয়াছিলেন, অশুচির মধ্যে ইন্দ্রিয়তৎপরতার মধ্যে তাঁহারা ভগবানের সত্তার অনুসন্ধান করিয়াছিলেন। তাঁহারা পাপের প্রতি অন্ধদৃষ্টি ছিলেন না। পাপের প্রতি উদাসীন অথবা ঘৃণাপূর্ণ দৃষ্টি বর্ত্তমান যুগে সাধুতার বৈপরীত্যই প্রমাণ করে।

অরবিন্দবাবু শিল্পীকে ঋষিকল্প, সিদ্ধপুরুষ বলিয়াছেন। শিল্পীও যেমন সাধুও তেমন। উভয়ই সাধক। উভয়েরই পূর্ণ সত্যানুভূতি হয় নাই, উভয়েরই সাধনাবস্থা—সুতরাং উভয়েরই আচার নিয়ম আছে। এই কথাটুকু মানিলে সব গোল চুকিয়া যায়। বিষয় নির্ব্বাচনের প্রয়োজন নাই। ভগবান সুন্দরের সহিত অসুন্দরের সৃষ্টি করিয়াছেন, মহতের সহিত হীনেরও সৃষ্টি করিয়াছেন। শ্রেষ্ঠ সাধু ও শ্রেষ্ঠ শিল্পী শুধু সুন্দর মহতের ভিতর নহে, অসুন্দর হীন নিকৃষ্টের মধ্যেও ভগবানের রসমূর্ত্তিটি ফুটাইয়া তুলেন।

কিন্তু হয় কি অনেক সময়—পাপ, হীনতা, নিকৃষ্টতাকে দেখাইতে

যাইয়া—পূর্ণ রস বা পূর্ণ সৌন্দর্য্য ফুটিয়া উঠে না—বেশীর ভাগই বিকৃত রস বা বিকৃত ছায়া মাত্র ফুটিয়া উঠে। নগ্ননারীর ছবি আর্টিষ্ট ফুটাইয়া তুলিলেন, কিন্তু নগ্নত্বের মধ্যে যে দেবত্ব আছে তাহার আভাস পাওয়া গেল না, সে নগ্ননারীত্বে ভগবতীর দর্শন-লাভ হইল না। এখানে আমি বলিব, বিকৃত রসের সৃষ্টি হইয়াছে, সত্য রসের ছবি ফুটিয়া উঠে নাই। শুধু রক্তমাংস, বিষয়-সম্ভোগ, ইন্দ্রিয়পরতার ছবি দিলে খণ্ড রসের সৃষ্টি হয়। আর্টের মাপকাঠিতেও তাহার স্থান অতি নীচে। আধুনিক কালে অনেক বাঙালী লেখক ও ঔপন্যাসিক এইরূপ খণ্ডরসের অবতারণা করিতেছেন। আজকাল একটা fashionই দাঁড়াইয়াছে ইউরোপীয়ের অনুকরণে বারনারীর ছবি অঙ্কিত করা। পাপ, হীনতার ছবি আঁকিতে যাইয়া যদি শুধু রক্তমাংস, ইন্দ্রিয়-পরতাকে ফুটাইয়া তুলি তাহা হইলে তাহা বিকৃত রসসৃষ্টি হইবে। তাহা অশুদ্ধ, তাহা অসুন্দর, ও তাহাতে অমঙ্গল। পাপের ছবি আঁকিতে গেলে পাপের ব্যাখ্যা চাই। এজগতে পাপ হঠাৎ একবারে খাপছাড়াভাবে মাথা তুলিয়া দাঁড়ায় নাই। পাপের একটা ক্রমপরিণতি—"কেন", "কি", "কোথায়", "কোন দিকে" তাহা বুঝান চাই। তাহা না করিলে অখণ্ড রসসৃষ্টি, প্রকৃত সত্যানুভূতি হইবে না,—প্রকৃত সৌন্দর্য্য সৃষ্টি হইবে না। সাহিত্যে যে রসের সৃষ্টি করে তাহা পূর্ণ অখণ্ড রস। ক্ষণিক, সাময়িক রসসৃষ্টি সাহিত্যের বিকার। পাপ যে রস-সৃষ্টির আধার তাহা অত্যন্ত ক্ষণিক,—তাহাতে শান্তি নাই, তৃপ্তি নাই। একটা অখণ্ড রসবোধের অভাব স্বতঃই জাগরিত হইয়া উঠে। অখণ্ড রসসৃষ্টিতেই পূর্ণ সত্যের প্রকাশ। খণ্ডরস অখণ্ডে পরিণত না হইলে গরলই থাকিয়া যায়। খণ্ডরসের সঙ্গে সঙ্গে যে সত্যের প্রকাশ হয় তাহার মূল্য সার্ব্বজনীন নহে, চিরন্তন নহে।

বড় কবি, বড় সাহিত্যিক পার্থিব জীবনের পঙ্কিল স্রোতের মধ্যেও অখণ্ড রস খুঁজিয়া পাইয়াছেন। পাপ ও হীনতার মধ্যেও

ভগবানের মহিমা ও সৌন্দর্য্য তিনি ফুটাইয়া তুলিয়াছেন, কেননা তাঁহার পূর্ণ জ্ঞান, অখণ্ড রসবোধ হইয়াছে। শ্রীরামচন্দ্রের নির্ব্বাসনে ও খৃষ্টের ক্রুশারোহণে ভগবানেরই ঐশ্বর্য্য পরিস্ফুট করিয়াছেন। বড় সাধুর মত বড় শিল্পী পাপের একটা ব্যাখ্যা দিয়াছেন, সয়তান অথবা রাবণের চিন্তা ও কর্ম্মের একটা ক্রমপরিণতি ও পরিণাম দেখাইয়াছেন। বারনারী উর্ব্বশীর চিত্রকেও একটা পূর্ণজ্ঞান ও অখণ্ড রসবোধের মহিমায় অঙ্কিত করিয়াছেন। তবেই পাপের অন্তর্নিহিত যে সত্য ও সৌন্দর্য্য আছে তাহা পরিস্ফুট হইয়াছে। তবেই চিরন্তন অনন্ত সত্যের প্রকাশ হইয়াছে, তবেই অখণ্ড পূর্ণ রসের সৃষ্টি হইয়াছে। শিল্পীর পক্ষে এই সত্য-প্রকাশ, এই রস-সৃষ্টি সাধনা-সাপেক্ষ, এবং সে সাধনা তাহার পক্ষে Conscious এমন কি Superconscious, সজ্ঞানে এমন কি তুরীয় জ্ঞানে হয়।

এতক্ষণ যে রসের দিক দিয়া সাহিত্যের আলোচনা করিলাম শুধু তাহাই সাহিত্যের উপকরণ নহে। সাহিত্যের উদ্দেশ্য রস-সৃষ্টি—ইহা বলিলে ঠিক বলা হইল না। সাহিত্যের উদ্দেশ্য জীবন-সৃষ্টি—আত্ম-স্ফূর্ত্তি। রস—খণ্ডই হউক বা পূর্ণই হইক—জীবন-সৃষ্টির একটা অঙ্গমাত্র। নানা বিভিন্ন ভাবের পশ্চাতে যেমন একটা ব্যক্তিত্ব আছে—যে ব্যক্তিত্বের মাপকাঠিতে এক একটি বিভিন্ন ভাব নিয়ন্ত্রিত ও বিচারিত হয়, সেইরূপ সাহিত্যের এক একটি রস যে সমগ্র জীবন-স্ফূর্ত্তির উপকরণ যোগাইতেছে তাহা সেই সমগ্র জীবনের আদর্শের দ্বারা বিচার করিতে হইবে। সমগ্র জীবনের দিক দিয়া দেখিতে গেলে রস কেবল অঙ্গমাত্র, অঙ্গী নহে। আর্ট যতই অঙ্গের স্বাতন্ত্র্যকে নিয়মিত করিয়া সমগ্র জীবনের সামঞ্জস্য-লক্ষ্যের নিকট পৌঁছায় ততই তাহার প্রকৃত চরিতার্থতা। এইজন্য ক্রমশঃ মোহের আবেশ, ক্ষণিক উত্তেজনা, সাময়িক প্রবৃত্তিনিচয়কে সংযত করিয়া আর্ট সজ্ঞানে, উন্মুক্ত ও সত্য দৃষ্টিতে নিজের উপকরণগুলিকে সজ্জিত করে। এইরূপে আর্ট সমগ্রতাকে খুঁজে ও

তাহাকে প্রকাশ করে। ইহাই হইতেছে আর্টের ক্রমপরিণতির স্তরবিভাগ।

শ্রীরাধাকমল মুখোপাধ্যায়।

মহিস্থর-ভ্রমণ

রামেশ্বরম্, মাদুরা, শ্রীরঙ্গম্, তাঞ্জোর, চিদম্বরম্, কাঞ্চী, মহাবলিপুরম্ প্রভৃতি দাক্ষিণাত্যের প্রসিদ্ধ স্থানগুলি দর্শন করিয়া ও শিল্প ও স্থাপত্যের অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়া মাদ্রাজ রামকৃষ্ণাশ্রমে ফিরিয়া আসিলাম,—উদ্দেশ্য মহিস্থর রাজ্যে ভ্রমণ করিয়া চালুক্য ও হৈসনদিগের শিল্পকলার পরিচয় লাভ ও তৎপরে তথা হইতে দাক্ষিণাত্যের সমস্ত হিন্দুরাজত্বগ্রাসী বিজয়নগরের ধ্বংসাবশেষ সন্দর্শন। বিজয়নগরে যাইবার সুবিধার জন্য হস্‌পেটস্থ শিক্ষাবিভাগের অবসরপ্রাপ্ত একজন মারাঠা কর্ম্মচারীর নিকট পরিচয়-পত্র মাদ্রাজমঠের "রামু" বা শ্রীরামস্বামী আয়েঙ্গার মহাশয় সংগ্রহ করিয়া দিয়াছিলেন।

"রামু" মাদ্রাজ রামকৃষ্ণাশ্রমের দক্ষিণহস্তস্বরূপ; ইনি একজন মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিধারী ও রাজকর্ম্মচারী এবং "রামকৃষ্ণ হোমের" সম্পাদক। দরিদ্র বালকদের মাদ্রাজের কলেজে ও স্কুলে অধ্যয়ন করিবার সুবিধার জন্য এই "হোমের" সৃষ্টি হইয়াছে; এখানে ছাত্রেরা বিনাব্যয়ে থাকিতে ও আহার করিতে পায়। ইহার জন্য "রামু" স্বয়ং প্রতিমাসে তিন চারি শত টাকা ভিক্ষা করিয়া সংগ্রহ করেন; এই প্রকারে প্রায় ত্রিশ চল্লিশজন দরিদ্র ছাত্র মাদ্রাজে থাকিয়া

উচ্চ শিক্ষা লাভ করে। "রামু"র অবিচলিত অধ্যবসায় দেখিলে বিস্মিত হইতে হয়; ইনি সংসারী হইয়াও ব্রহ্মচারীর জীবন যাপন করিতেছেন; ছাত্রেরাই ইঁহার পুত্রস্থানীয় এবং রাত্রে তাঁহাদের সহিত "হোমে"ই থাকেন। তাঁহার মুখমণ্ডল কৃতকর্ম্মতা ও পুণ্য-ভাবের যে দীপ্তিতে উদ্ভাসিত দেখিয়াছি তাহা ভুলিবার নহে। মান্দ্রাজে অবস্থানকালে যে কয়দিন আমি মান্দ্রাজ মিউজিয়াম সংরক্ষিত প্রস্তরাবলি হইতে অমরাবতী শিল্পের তথ্য সংগ্রহ করিতে গিয়াছি, প্রত্যহই ইঁহার আত্মীয়ের শকট-সাহায্যে নগরের একান্তেস্থিত মিউ-জিয়ামে যাইবার সুবিধা করিয়া দিতেন। ইনি বেশ বুদ্ধিমান বলিয়া অমরাবতী শিল্প নিজে অধ্যয়ন করিয়া বুঝাইয়া দিতে আমার বেশ আনন্দ হইত। ভিঃ স্মিথ্ প্রভৃতি পণ্ডিতেরা অমরাবতী শিল্পে গ্রীক্ শিল্পের যে প্রভাবের কথা বলিয়াছেন * আমি তাহা একেবারেই অমূলক বুঝাইয়া দেওয়াতে তিনি বিশেষ আনন্দিত হইলেন এবং এ ভ্রান্ত বিশ্বাসগুলি কিপ্রকারে পণ্ডিতেরা ও তৎসহ আমাদের স্বদেশীয় উপাসকেরা এতদিন পোষণ করিতেছেন তাহা চিন্তা করিয়া বিস্মিত হইলেন। প্রায় দুই সহস্র বৎসর পূর্ব্বে আমাদের দেশে Perspective বা পরিপ্রেক্ষিত বিদ্যার কিরূপ উন্মেষ হইতেছিল তাহা কতকগুলি চিত্র বা relief হইতে বুঝাইয়া দিলাম। এই সকল চিত্রে অঙ্কিত স্তম্ভগুলিতে প্রাচীন আসিরীয় ও পারসিক প্রভাব বর্ত্তমান দেখাইলাম; কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় যে দাক্ষিণাত্যের কৃষ্ণা নদী-তীরস্থ অন্ধ্রশিল্পের মধ্যে আর্য্যাবর্ত্ত সম্রাট্ অশোক ও অধস্তন সময়ের কেমন সুন্দর সামঞ্জস্য রহিয়াছে। এই Pan-Indian বা সমগ্র ভারত-ব্যাপী সাম্য-ব্যাপার কতদিন হইতে সংঘটিত হইতেছিল তাহা কে বলিতে পারে?

* A History of Fine Art in India and Ceylon by V. Smith, P. 123.

সমগ্র ভারতের মধ্যে মাদ্রাজ মিউজিয়মেই অমরাবতী শিল্পের যাহা কিছু সংরক্ষিত আছে। কৃষ্ণানদীতীরস্থ বেজওয়াডার মিউজিয়মে যাহা আছে তাহা অতি সামান্য, আমি ইহা কিছুদিন পূর্ব্বে মাদ্রাজ যাইবার পথে দেখিয়া আসিয়াছি; কলিকাতার যাদুঘরে কিছুই নাই বলিলেও চলে। প্রায় সমস্তই বিলাতের ব্রিটিস মিউজিয়মে প্রেরণ করা হইয়াছে। ভারতে থাকিয়া অমরাবতী শিল্প অধ্যয়ন করিতে হইলে মাদ্রাজ মিউজিয়াম ভিন্ন উপায়ান্তর নাই।

"রামু" মিউজিয়ামের Asst. Supdt. মহোদয়ের সহিত আলাপ করিয়াছিলেন। মৎপ্রণীত উড়িষ্যা-স্থাপত্য সম্বন্ধীয় পুস্তক মিউজিয়াম-সংলগ্ন পুস্তকাগারে দেখিলাম। Asst. Supdt. মহাশয় আমার সিদ্ধান্তগুলি গ্রহণ করিলেন ও বলিলেন যে তিনি শিলালিপির পাঠোদ্ধার দ্বারা ইতিহাস সঙ্কলন করিতে চেষ্টা করিতেছেন, কিন্তু শিল্প ও স্থাপত্যের দ্বারাও যে এ উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতে পারে তাহা দেখিয়া আনন্দিত হইলেন। রামু মিষ্ট হাস্য করিয়া বলিলেন, "মিঃ গাঙ্গুলি, এগুলি আমাদের নগরে রহিয়াছে, আমরা ইহার কোন সংবাদ রাখি না, আর আপনি সহস্রাধিক মাইল দূর হইতে আসিয়া এগুলি যে এত চিত্তাকর্ষক তাহা বুঝাইয়া দিলেন।" আমি বলিলাম, "আমার যত্ন ও অধ্যবসায় ত নগণ্য, তুচ্ছ। কত সহস্র মাইল দূর হইতে ইউরোপীয় পণ্ডিত মহোদয়েরা আমাদের ভারতবর্ষ সম্বন্ধে এত আলোচনা ও গবেষণা করিতেছেন যে তাঁহাদের এ ঋণ আমরা কখনই পরিশোধ করিতে পারিব না। তাঁহাদের আবিষ্কৃত সত্যগুলি যাহাই হউক না, তাঁহাদের পদ্ধতিগুলি অনুশীলনযোগ্য। এই দেখুননা প্রায় শত বর্ষ পূর্ব্বে কর্ণেল মেকেঞ্জি (Col. Mackenzie) যদি অমরাবতী স্তূপগাত্রস্থ চিত্রগুলি না অঙ্কিত করিয়া রাখিতেন, তাহা হইলে অনেক গুলির বিষয় লোকে ত জানিতেই পারিত না, কেননা স্থানীয় কোন জমিদার মহাশয় সেই অমূল্য মার্ব্বল প্রস্তরগুলি পোড়াইয়া চূণ প্রস্তুত করিয়াছেন; অনেক-

গুলি প্রস্তরে তাঁহার গৃহভিত্তিও নির্ম্মিত হইয়াছে।” পূর্ব্বে বলিয়াছি দাক্ষিণাত্য ভ্রমণ কারণ “রামু” আমার পরিচয়-পত্র সংগ্রহ করিয়া দিয়া অনেক সুবিধা করিয়া দিতেন, কিন্তু দুই একটি ভিন্ন কোনও পরিচয়-পত্র আমি ব্যবহার করি নাই এবং পূর্ব্বোক্ত দুই একটির দ্বারাও কখন কাহারও অতিথি হই নাই; ইহাতে আমার আত্মসম্মানজ্ঞানের মূলে আঘাত পড়িত। সে সব পত্রগুলি এখনও যত্নে রাখিয়া দিয়াছি; রামু মাদ্রাজ হাইকোর্টের জজ, এড্ভোকেট জেনারেল প্রভৃতির পত্র সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছিল; কিন্তু কোনটিই ব্যবহার করি নাই। রামেশ্বরম্ যাইবার সময় রামনদের রাজার উপর পত্র ছিল যাহাতে তাঁহার অতিথি হই; কিন্তু রাজার অফিস বা কাছারী বাটী কোন্ দিকে তাহার সংবাদও লই নাই। বরাবর ধর্ম্মশালায় বা ছত্রে উঠিতাম ও তাহাতে বিশেষ আনন্দ লাভ করিতাম। কত লোকের সহিত মিশিয়া তাহাদের আচার ব্যবহার বুঝিতে চেষ্টা করিতাম; এইখানেই আমাদের বিরাট জাতির আত্মার সন্ধান পাওয়া যাইত; আমার সদাসর্ব্বদা স্বর্গীয়া ভগ্নী নিবেদিতার (Sister Nivedita)র একটি কথা মনে পড়িত। তিনি বলিতেন, “তোমরা স্বদেশ বুঝিবার জন্য এত লালায়িত, অথচ তৃতীয় শ্রেণীতে ভ্রমণ করিতে বা দরিদ্রের সহিত মিশিতে লজ্জা বোধ কর। তৃতীয় শ্রেণীতে না ভ্রমণ করিলে নিম্নস্তরবাসী নিজের দেশবাসীর—যাহারা দেশের প্রাণস্বরূপ—তাহাদের বুঝিবে কি প্রকারে?” ধর্ম্মশালায় থাকিবার ইহাও এক কারণ। এখানে একটা কথা বলিয়া রাখি; দাক্ষিণাত্যের ধর্ম্মশালাগুলি বলিলে যেন পাঠকেরা উত্তর ভারতের ধর্ম্মশালার কথা না ভাবেন। এখানকার ধর্ম্মশালা বা ছত্রগুলি বিশেষ পরিষ্কার, পরিচ্ছন্ন, প্রশস্ত এবং বিশেষ ধনী ব্যক্তিরা পর্য্যন্ত Travellers' Bunglowতে (ডাক বাঙলা এখানে এই নামে চলিত) না গিয়া এইখানে আসেন। তাঞ্জোর রাজার ধর্ম্মশালার কথা আমি ইহজন্মে ভুলিব না; ইহা এমনই মনোহর।

পরিচয়পত্রগুলি ব্যবহার করিতাম না বলিয়া রামুর বড় অভিমান হইত; এবার মহিসুর-যাত্রাকালে একটু মিষ্ট ভর্ৎসনা করিয়া বলিলেন যেন মহিসুর হইয়া বিজয়নগর যাইবার পথে হসুপেটস্থ পূর্ব্বোক্ত অবসরপ্রাপ্ত রাজকর্ম্মচারীর আতিথ্য গ্রহণ করি, এবং তাহাতে পাপ নাই।

পূর্ব্বেই ব্যাঙ্গালোরস্থ রামকৃষ্ণমঠে চিঠী লেখা ও তার করা হইয়াছিল। মাদ্রাজমঠাধ্যক্ষ স্বামী সর্ব্বানন্দ আমাকে স্নেহপাশে বদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন ও আজ কাল করিয়া বিলম্ব করিয়া দিতেছেন, বলিতেছেন যে এত ভ্রমণ করিয়া আসিয়াছেন, শরীরটা একটু সুস্থ করুন। তাঁহার বিশেষ যত্ন ও আপ্যায়নে এত মুগ্ধ হইয়াছিলাম যে আমারও যাইতে তত ইচ্ছা হইতেছিল না। তাঁহার সহিত কথাবার্ত্তায় যে intellectual pleasure বা সুখ পাইয়াছি তাহা অল্প স্থানেই মিলিয়াছে। সেই কৃশ অথচ সুদৃঢ় চম্পকদাম গৌর মুণ্ডিতমস্তক যুবা সন্ন্যাসীর স্নেহপ্রদীপ্ত অথচ তেজোময় মুখকান্তি কখনই ভুলিব না। আমি যখন বিদায় লইলাম তখন দেখিলাম যে তিনি একটু মায়াভিভূত হইয়া পড়িয়াছেন; আমাকে স্নেহালিঙ্গন দিলেন, আমি প্রণামাদি করিয়া যাত্রা করিলাম।

আমার সঙ্গে আমার সহচর আমার বিশ্বাসী উড়িয়া ভৃত্য রুশিয়া। মহিসুরের জঙ্গলে বৃষ্টি, রৌদ্র ও ঝঞ্ঝায় ভ্রমণকালে ইহারই সহিত কথাবার্ত্তায় আনন্দ লাভ করিতাম। আমি কলিকাতা হইতে আমার চিত্রাঙ্কন সহকারী বন্ধু জী—বাবুকে আনিয়াছিলাম। উড়িষ্যাবিষয়ক পুস্তক প্রণয়ন করিবার সময় ভ্রমণকালে ও বুদ্ধগয়ার তথ্য সংগ্রহ করণে ইনি আমাকে বিশেষ সাহায্য করিয়াছেন; কিন্তু এবার দেখি চিত্রাঙ্কন অপেক্ষা ইহার দেব ও দেশ দর্শন স্পৃহাটা বিশেষ বলবতী; আমার উদ্দেশ্যের দিকে দৃষ্টি অল্প; কিন্তু আমি ত দেব বা দেশদর্শন, বা প্রকৃতির শোভা সন্দর্শন করিতে আসি নাই। আমি মস্তকে একটা বিশেষ কর্ত্তব্যের বোঝা বহন করিয়া আনিয়াছি; আমার

দৃঢ় সঙ্কল্প, আমাকে দেশের শিল্প স্থাপত্যের ইতিহাস সংগ্রহ করিতেই হইবে। এ প্রতিজ্ঞা আমাকে উন্মত্তের স্থায় অস্থির করিয়াছিল; আমার স্নায়ুগুলি এই চিন্তায় সর্ব্বদা উত্তেজিত থাকিত। তাহা না হইলে কোন কোন দিন উপবাস সহ্য করিয়াও মহিসুরস্থ পার্ব্বত্য প্রদেশে গোযানে মাঝে মাঝে সামান্য বিশ্রাম লইয়া ক্রমান্বয়ে প্রায় দুই শত মাইল ভ্রমণ করিতে পারিতাম না। মহিসুর নগর মহিসুর রাজ্যের রাজধানী হইলেও সমস্ত প্রধান প্রধান অফিস, কাছারী ব্যাঙ্গালোরে। এইখানে রেসিডেন্ট থাকেন। মাদ্রাজ এবং সাদার্ন্ মার্হাট্টা রেলওয়ে লাইনে মাদ্রাজ হইতে ব্যাঙ্গালোর যাইতে হয়; ব্যাঙ্গালোর পর্য্যন্ত রেল লাইন ব্রডগেজ, পরে তথা হইতে মহিসুরের দিকে মিটর গেজ। মাদ্রাজ হইতে ব্যাঙ্গালোরের দূরত্ব ২১৯ মাইল। নর্থ আরকট জেলাস্থ গুড়ুপল্লী ষ্টেসনের প্রায় দুই মাইল দূর হইতে মহিসুর রাজ্য আরম্ভ; ইহার দূরত্ব মাদ্রাজ হইতে প্রায় ১৬২ মাইল। ইহার প্রায় ৩০ মাইল দূরে জলারপেট নামক ষ্টেসন হইতেই বেশ শীত অনুভব হয়; সেইজন্য সকলেই জলারপেট ষ্টেসন হইতে উষ্ণ বস্ত্র ব্যবহার করেন। আমি কিছুই করিলাম না, কেননা আমার সঙ্গে শীতবস্ত্র ছিল না; আগষ্ট মাসে যে শৈত্যানুভব করিতে হইবে এ জ্ঞান আমার ছিল না। প্রভাতেই আমরা Bangalor Cantonment (ব্যাঙ্গালোর ক্যাণ্টনমেণ্ট) ষ্টেসন পৌঁছিলাম; এইখানে প্রায় সমস্ত ইংরাজ যাত্রী নামিয়া গেলেন; আমার টিকিট ছিল ব্যাঙ্গালোর-সিটি ষ্টেসনের। ক্যাণ্টনমেণ্ট ষ্টেসন হইতে আমার মনটা একটু চঞ্চল হইল; নিজামের রাজ্যে পুলিস যেরূপ বিরক্ত করিয়াছে তাহার পুনরাবৃত্তির আশঙ্কায় একটু উৎকণ্ঠিত হইলাম; ষ্টেসনে কিন্তু সেসব কিছুই দেখিলাম না।

ব্যাঙ্গালোর সিটি ষ্টেসন পৌঁছিবার পূর্ব্বে আমি পাঠকদিগকে মহিসুর রাজ্যের একটা সংক্ষিপ্ত ভৌগোলিক, ঐতিহাসিক, রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক ইতিবৃত্ত দেওয়া উচিত মনে করি; ইহা হইতে আমার

ভ্রমণ-কাহিনীর মধ্যে যে সমস্ত পারিভাষিক সংজ্ঞা ও ঐতিহাসিক বৃত্তান্তের উল্লেখ করিয়াছি তাহা বুঝিবার সুবিধা হইবে।

মহিসুর একটি মিত্ররাজ্য এবং সমগ্র ভারতের মধ্যে হায়দ্রাবাদ রাজ্যের পরেই ইহার সম্মান ও প্রাধান্য সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। মহিসুর শব্দের ব্যুৎপত্তি সম্বন্ধে নানা মত প্রচলিত; এখানকার প্রচলিত কানারী ভাষার মহিষ বাচক "মৈস" শব্দ এবং নগর বা দেশবাচক "উরু" শব্দ হইতে মহিসুর শব্দ উৎপন্ন। ইহার অর্থ মহিষ বা মহিষদেহধারী মহিষাসুরের নগরী। সকলেই অবগত আছেন যে দুর্গা চামুণ্ডী বা মহিষাসুরমর্দ্দিনীরূপে মহিষাসুরকে নিহত করেন। মহিসুর রাজ্যের রাজধানী মহিসুর নগরের উপকণ্ঠস্থিত "চামুণ্ডা" বলিয়া যে পর্ব্বত আছে তাহাতে এখনও মহিসুররাজের গৃহাধিষ্ঠাত্রীরূপে চামুণ্ডী পূজিতা হয়েন।

১১°৩৮′ ও ১৫°২′ অক্ষাংশ এবং ৭৪°১২′ ও ৭৮°৩৬′ দ্রাঘিমাংশের মধ্যে মহিসুর রাজ্য অবস্থিত। ইহার পরিমাণ ২৯,৩০৫ বর্গ মাইল, অর্থাৎ আমাদের বঙ্গদেশস্থ নিম্নলিখিত জেলাগুলি একত্র করিলে মহিসুরের সমান হয়,—নদিয়া, যশোহর, খুলনা, ২৪-পরগণা, মুরসিদাবাদ, বর্দ্ধমান, বাঁকুড়া, বীরভূম, হুগলি, হাওড়া, মেদিনীপুর এবং ঢাকা।

মহিসুর ও সমগ্র ভারতের মানচিত্র পাশাপাশি রাখিয়া তুলনা করিলে আমরা আকৃতির অনেকটা সৌসাদৃশ্য দেখি। উভয়েই দেখিতে অনেকটা ত্রিভুজ বা "ব"এর ন্যায়।

মহিসুর প্রদেশ পর্ব্বতসঙ্কুল; ইহার চারি দিকেই পর্ব্বত; তবে উত্তর দিকে কিছু অল্প; পূর্ব্বে ও পশ্চিমে পূর্ব্ব-ঘাট ও পশ্চিম-ঘাট পর্ব্বতমালা এবং দক্ষিণে এতদুভয়ের যোজক স্বরূপ নীলগিরি পর্ব্বত অবস্থিত। এ প্রদেশের পর্ব্বতগুলি প্রায়শঃই উত্তর হইতে দক্ষিণে বিস্তৃত; মাঝে মাঝে গিরিশৃঙ্গ দৃষ্ট হয়; এগুলিকে স্থানীয় ভাষায় "দ্রুগ্" বলে। মহিসুরের সর্ব্বোচ্চ গিরিশৃঙ্গের নাম মুলৈনা

গিরি; ইহা পশ্চিমঘাট পর্ব্বতমালার অন্তর্গত এবং সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ইহার উচ্চতা ৬৩১৭ ফিট। ইহার নিম্নেই "বাবাবুদন গিরি" ইহা উচ্চতায় ৬২১৪ ফিট; ইহাও পশ্চিমঘাট পর্ব্বতমালা হইতে উঠিয়াছে। দ্বাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে হৈসন নরপতি বিষ্ণুবর্দ্ধন কর্ত্তৃক স্থাপিত চেন্নকেশবের মন্দির দেখিবার জন্য যখন বেলুড়ের ডাকবাঙ্গলায় অবস্থান করিতেছিলাম সেই সময় বাঙ্গলার বারাণ্ডা হইতে বনৈশ্বর্য্য-গর্ব্বিত কুহেলিকাচ্ছন্ন বাবাবুদনগিরি দেখিয়া বিস্মিত ও মুগ্ধ হইতাম।

মহিসুরের পশ্চিমদিকের বন ও পর্ব্বতশোভা চিত্তকে বিশেষ দ্রব করে; ইহার পশ্চিমদিকের যে অংশের নাম "মাল্‌নাড়্" সেখানে প্রকৃতিদেবী যেন বনশোভায় উদ্ভাসিতা; এখানে প্রচুর পরিমাণে বৃষ্টি হয় এবং তজ্জন্য ম্যালেরিয়ার প্রাদুর্ভাব বেশী। ইহাকে মহিসুরের "টেরাই" বলা যাইতে পারে।

এখানকার নদীগুলি প্রায়শঃই বঙ্গোপসাগরে প্রবাহিতা; উত্তর পশ্চিমাংশের কয়েকটি নদী আরব সাগরে মিশিয়াছে। নদীগুলির মধ্যে নিম্নলিখিত কয়টিই প্রসিদ্ধ—কৃষ্ণা, কাবেরী, পালার ও পেন্নার। আমি এখানকার কোন নদীতেই নৌকা দেখি নাই।

মোটামুটি বলিতে গেলে মহিসুর প্রদেশে তিনটি ঋতু বর্ত্তমান—বর্ষা, শীত ও গ্রীষ্ম। মে মাসের শেষে বা জুনের প্রারম্ভে বর্ষার আরম্ভ; বর্ষা এই সময় দক্ষিণ-পশ্চিম দিক হইতে আরম্ভ হয়; মাঝে আগষ্ট ও সেপ্টেম্বর মাসে সামান্য বিরাম হইয়া বর্ষা নবেম্বর মাসের মধ্য পর্য্যন্ত বিরাজ করে; এই শেষ বর্ষা উত্তর-পূর্ব্ব দিক হইতে আরম্ভ হয়। ইহার পরেই শীত; ফেব্রুয়ারি মাসের শেষ পর্য্যন্ত শীত ঋতু বর্ত্তমান থাকে। গ্রীষ্ম মার্চ্চ হইতে আরম্ভ হইয়া মের শেষ পর্য্যন্ত। আমি ব্যাঙ্গালোরস্থ Meteorological Office এ (আবহবিদ্যা সংক্রান্ত অফিসে) যাইয়া যাহা শিখিয়াছি এবং তথা হইতে প্রকাশিত ১৯১৩ অব্দের বার্ষিক বিবরণীতে যাহা পাঠ করিয়াছি

তাহা পাদটীকায় * দেওয়া গেল। তাহার পার্শ্বে গত ২৪শে জুন তারিখের কলিকাতার আবহ-বিবরণ দেখিয়া তুলনায় সমালোচনা করিয়া বিশেষজ্ঞ পাঠকের মহিসুরের ঋতুসম্বন্ধে অনেকটা ধারণা হইবে আশা করি। এস্থলে বলিয়া রাখি যে এই বৎসর ইহারই মধ্যে কলিকাতায় বর্ষা পড়িয়াছিল এবং গতকল্য বৃষ্টি হইয়াছিল; ১৯১৩ সালের ঐ দিনে ব্যাঙ্গালোরে বৃষ্টি হয় নাই এবং আকাশ মেঘাচ্ছন্নও ছিল না।

মহিসুর রাজ্যের বৃষ্টির হারের সাম্য দৃষ্ট হয় না; পশ্চিমাংশে বৎসরে প্রায় ২০০ ইঞ্চি বৃষ্টিপাত হয়; উত্তরাংশের এক স্থানের পরিমাণ ১০ ইঞ্চি মাত্র। মহিসুর জেলার বৃষ্টির হার বৎসরে ৩০ হইতে ৩৬ ইঞ্চি। পাঠকদিগের অবগতির জন্য আমি কলিকাতায় গত পাঁচ বৎসরের বৃষ্টির হারের গড়পড়তা করিয়া দেখিয়াছি যে ইহা কিঞ্চিদধিক ৬০ ইঞ্চি।

মহিসুর রাজ্যের লোকসংখ্যা প্রায় ৫০ লক্ষ; দক্ষিণ ভারতের অন্তর্গত বলিয়া এখানে ব্রাহ্মণের অতিশয় সম্মান ও প্রাধান্য। এখানে দ্রাবিড় ব্রাহ্মণের পঞ্চ শাখাই † দৃষ্ট হয়; পঞ্চ গৌড়ের মধ্যে কেবলমাত্র কান্যকুব্জ, সারস্বত ও গৌড় শাখান্তর্গত ব্রাহ্মণ দৃষ্ট হয়। গৌড়ীয় ব্রাহ্মণদিগের ন্যায় দ্রাবিড় ব্রাহ্মণদের মধ্যে যে সকল গোত্র প্রচলিত আছে তন্মধ্যে নিম্নলিখিত গুলিই প্রধান ও উল্লেখযোগ্য:—ভরদ্বাজ, কাশ্যপ, বিশ্বামিত্র, বশিষ্ঠ, শ্রীবৎস, আত্রেয়,

* ব্যাঙ্গালোর ২৩শে জুন—১৯১৩।	কলিকাতা ২৩শে জুন, ১৯১৬।
Barometrie reading—29·699	Barometric reading—29·367
Maximum temp.—85·4.	Maximum temp.—86·00
Minimum temp.—66·8·	Minimnm temp.—78·00
Humidity (mean)—53	Humidity—84

† পঞ্চ দ্রাবিড়—কর্ণাটক বা কানাড়া, অন্ধ্র বা তেলেগু, দ্রাবিড় বা তামিল, মহারাষ্ট্র ও গুর্জ্জর।

কৌশিক, হারিত। ঋক্, যজু ও সাম ভেদে তিন শাখারই ব্রাহ্মণ দৃষ্ট হয়; ইহার মধ্যে ঋক্ শাখার অন্তর্গত ব্রাহ্মণের সংখ্যাই অধিক; তন্নিম্নে যজু ও সাম।

ব্রাহ্মণদের সাধারণ প্রচলিত শাখা তিনটি—স্মার্ত্ত, মাধ্ব ও শ্রীবৈষ্ণব। স্মার্ত্তের সংখ্যা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক; ইঁহারা বেদান্তবাদী ও শৈব। এবং শ্রীশঙ্করাচার্য্যের মতাবলম্বী। স্মার্ত্ত ব্রাহ্মণেরা ভালদেশ তিনটি সমান্তরাল চন্দনরেখায় অঙ্কিত করেন; এই তিনটি রেখার মধ্যে রক্তবর্ণের একটি চিহ্ন থাকে। শ্রীমধ্ব্যাচার্য্য হইতে মাধ্ব শাখার উৎপত্তি; ইনি দক্ষিণ কানাড়ায় ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে জন্ম গ্রহণ করেন। ইঁহারা বিষ্ণু ও শিব উভয়েরই উপাসনা করেন; ইঁহাদের মধ্যে বিষ্ণূপাসকের সংখ্যাই অধিক। ইঁহারা দ্বৈতবাদী ও দুই শাখায় বিভক্ত—ব্যাসকূট ও দাসকূট। ব্যাসকূটেরা আচার্য্যলিখিত সংস্কৃত শাস্ত্রোক্ত মত বিশ্বাস করেন; দাসকূটেরা স্থানীয় ভাষায় লিখিত গাথা ও পুস্তকবর্ণিত মত বিশ্বাস করেন। মাধ্ব ব্রাহ্মণের ভালদেশের মধ্যস্থলে একটি কৃষ্ণবর্ণ লম্বমান রেখা দৃষ্ট হয় ও তন্মধ্যে একটি বিন্দু থাকে। শ্রীবৈষ্ণবেরা বিষ্ণুর উপাসক। ইঁহারা শ্রীদেবীরও উপাসনা করেন। শ্রীরামানুজাচার্য্য এই শাখার প্রবর্ত্তক; ইনি দ্বাদশ শতাব্দীতে কাঞ্চীর নিকটে জন্মগ্রহণ করেন; এই শাখান্তর্গত লোকেরা বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী। শ্রীবৈষ্ণবেরা তেঙ্গলে ও ভডগেলে নামক দুই শাখায় বিভক্ত; এবং ইহাদের মধ্যে বিশেষ মনোমালিন্য দৃষ্ট হয়। তেঙ্গলেদিগের গুরুর নাম মনবাড় মহামুনি, ভডগেলেদিগের গুরুর নাম বেদান্ত দেশিক। ভালদেশস্থ "নাম" চিহ্ন দেখিয়া কোন ব্যক্তি তেঙ্গলে কি ভডগেলে শাখাভুক্ত অনায়াসেই নির্দ্ধারণ করা যাইতে পারে। ইংরাজী অক্ষর Uর স্থায় নামধারিদিগের নাম ভডগেলে এবং Yর ন্যায় নামধারিদিগের নাম তেঙ্গলে।

মহিস্থরের প্রাচীন ইতিহাস অন্ধতমসাচ্ছন্ন; রামায়ণোক্ত কিস্কিন্ধ্যার দক্ষিণাংশ মহিস্থর বলিয়া বোধ হয়। মহাভারতোক্ত সভাপর্ব্বে

যুধিষ্ঠির কর্ত্তৃক রাজসূয় যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হইবার পূর্ব্বে তদীয় কনিষ্ঠ সহোদর সহদেব কর্ত্তৃক মহিসুর বা মহিষ্মতী বিজয়ের উল্লেখ পাওয়া যায়। জৈন মতানুসারে মৌর্য্য সম্রাট চন্দ্রগুপ্ত জৈন ছিলেন এবং জীবনের শেষ দ্বাদশ বৎসর মহিসুরান্তর্গত শ্রবণবেলগোলায় তপশ্চরণে অতিবাহিত করেন। অত্রস্থ চন্দ্রগিরি পর্ব্বতে চন্দ্রগুপ্তের সমাধি নির্দ্দেশক মন্দির দৃষ্ট হয়। আমি এখানে কয়েক দিন বাস করিয়াছিলাম; আমার ধারণা যে মন্দিরটি দশম কি একাদশ শতাব্দীতে নির্ম্মিত। মহিসুরে আবিষ্কৃত সম্রাট অশোকের শিলালিপি হইতে ঐতিহাসিক পণ্ডিতেরা স্থির করিয়াছেন যে মহিসুর প্রদেশ, অন্ততঃ ইহার উত্তরাংশ মৌর্য্য সম্রাট অশোকের বিশাল সাম্রাজ্যের অন্তর্গত ছিল। শিলালিপি * পাঠে স্থির হইয়াছে যে খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীতে মহিসুরের উত্তর-পশ্চিমাংশে সাতকর্ণী নামধেয় রাজারা রাজত্ব করিতেন। ইঁহাদের পর কদম্ববংশীয় রাজারা এই অংশের রাজা হয়েন। এই সময় মহিসুরের উত্তরাংশে রাষ্ট্রকূটেরা, পূর্ব্বাংশে পল্লবেরা, মধ্য ও দক্ষিণাংশে গঙ্গাবংশীয়েরা রাজত্ব করিতেন। খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীতে চালুক্যবংশীয় রাজারা কদম্ব ও রাষ্ট্রকূটদিগকে পরাভূত করিলেন এবং গঙ্গাদিগকর্ত্তৃক বিপর্য্যস্ত পল্লবদিগকে আক্রমণ করেন। নবম শতাব্দীর প্রারম্ভে রাষ্ট্রকূটেরা চালুক্যদিগকে পরাভূত করেন এবং কিয়দ্দিনের জন্য গঙ্গারাজ্য অধিকার করেন ও পরে প্রত্যর্পণ করেন। দশম শতাব্দীর শেষাংশে চালুক্যেরা রাষ্ট্রকূটদিগকে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত করিয়া মহিসুর রাজ্যে অধিকার বিস্তার করেন। একাদশ শতাব্দীতে কোলরাজারা গঙ্গা ও পল্লবদিগকে সম্পূর্ণরূপে পরাভূত করিলেন; এদিকে গঙ্গাবংশীয় রাজাদিগের ধ্বংসাবশেষ হইতে আর এক বংশের অভ্যুদয় হইল, ইহার নাম হৈসন বল্লাল বংশ; ইঁহারা কোলদিগকে মহিসুর হইতে সম্পূর্ণরূপে বিতাড়িত

* Epigraphic India, Vol. III, p. 140.

করিয়া রাজ্য সংস্থাপন করেন। চালুক্যদিগের সিংহাসনে হৈহয়বংশীয় নরপতিরা অধিষ্ঠিত ছিলেন। হৈসন ও যাদববংশীয়-দিগকর্ত্তৃক হৈহয়েরা পরাভূত হওয়াতে মহিসুর রাজ্যের উত্তরাংশ যাদবদিগের ও দক্ষিণাংশ হৈসনদিগের করতলগত হইল। চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে মুসলমানেরা এই দুই বংশীয় রাজাদিগকে পরাভূত করিয়া মহিসুর জয় করেন। এদিকে হৈসন ও যাদব বংশের ধ্বংস হইয়া বিজয়নগর রাজ্যের অভ্যুদয় হইল; ইহাও কালের কুটিল চক্রে ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগে মুসলমানকর্ত্তৃক বিধ্বস্ত হওয়াতে বিজাপুর রাজ্যের অধীনে আসে; ক্রমশঃ সপ্তদশ শতাব্দীতে মোগল-দিগকর্ত্তৃক বিজাপুর রাজ্যের পতন হওয়ায় মহিসুর রাজ্যের উত্তর ও পূর্ব্বাংশ মোগলদিগের অধিকারে আইসে। এদিকে মহারাষ্ট্র ও মোগলদিগের চিরশক্রতার সাহায্যে ধীরে ধীরে দক্ষিণ মহিসুরের উদৈয়ারগণ ও উত্তরাংশের নায়কগণ শ্রীরঙ্গপত্তনের দুর্গ আক্রমণ ও জয় করায় মহিসুরে উদৈয়ার বংশের প্রতিষ্ঠা হয়। ইঁহারাই বর্ত্তমান রাজবংশের পূর্ব্বপুরুষ। এই উদৈয়ারগণ ১৭৬৩ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। এই সময় চিক্ককৃষ্ণ রাজের রাজত্বকালে হায়দর আলি বেদনুর যুদ্ধে মহিসুর জয় করেন; ১৭৯৯ অব্দে তৎপুত্র টিপুসুলতান শ্রীরঙ্গপত্তনম্ অবরোধকালে ইংরাজদিগের হস্তে পরাভূত ও নিহত হয়েন। ইংরাজরাজ পূর্ব্ব হিন্দুরাজ্যের একজন বংশধরকে সিংহাসনে অভিষিক্ত করেন। রাজ্যে বিশৃঙ্খলা হেতু ১৮৩১ অব্দে শাসনকার্য্য নিজ হস্তে লইয়া দুইজন কমিশনরের সাহায্যে রাজ্য চালাইতে থাকেন; পুনরায় ১৮৮১ অব্দে রাজ্যভার মহারাজ চামরাজেন্দ্র উদৈয়ারের হস্তে প্রত্যার্পিত হয়; ইনিই বর্ত্তমান মহারাজের পিতা।

যখন ব্যাঙ্গালোর সিটি ষ্টেসনে পৌঁছিলাম তখনও সূর্য্যোদয় হয় নাই; ব্যাঙ্গালোর সহর তখন সবেমাত্র সুপ্তি হইতে জাগরিত হইতেছে এবং পথে ঘাটে লোকজন তত চলিতেছে না। আমার গন্তব্য স্থান সহরের একান্তেস্থিত বাসোয়ান গুডির অন্তর্গত বুল্-

টেম্পল্ রোডস্থিত রামকৃষ্ণাশ্রম। কানারী ভাষায় বাসোয়া শব্দের অর্থ বৃষ; এখানে একটি বৃষের মন্দির আছে; এই জন্যই এই স্থানের এই প্রকার নামকরণ হইয়াছে। আমি কলিকাতা হইতে ১৪ই জুলাই যাত্রা করিয়া নানাদেশ ভ্রমণ করিয়া আগষ্ট মাসের শেষে এখানে আসিয়া পৌঁছিয়াছি। বিষুবরেখার সান্নিধ্যেস্থিত বলিয়া আমার ধারণা ছিল দাক্ষিণাত্যে বঙ্গদেশ অপেক্ষা উষ্ণতার আধিক্য; এইজন্যই শীতকালোপযোগী পরিচ্ছদ আনি নাই; পথে বেশ শীত বোধ হইতেছিল। এদিকে শকট-চালক পথ ভুলিয়া অন্য দিকে প্রসিদ্ধ পারসী ব্যবসায়ী টাটা কোম্পানীর রেশম-কারখানার নিকটে আসিয়া উপস্থিত। সে আমার কথা বুঝিতে পারে নাই; আমার বেশ-ভূষায় আমাকে বোম্বাইবাসী স্থির করিয়া আমার গন্তব্য স্থান টাটাদিগের কারখানা স্থির করিয়াছিল। অত প্রত্যূষে পথে তেমন লোকজন ছিলনা বলিয়া একটু ঘুরিয়া আশ্রমে আসিতে হইল।

আশ্রম বা মঠ দূর হইতে বেশ উচ্চ স্থানে স্থিত বাংলো ধরণের মত বলিয়া বোধ হইতেছিল। মঠে পৌঁছিলে সন্ন্যাসী মহোদয়েরা আমাকে বেশ আদর আপ্যায়নে তৃপ্ত করিলেন। আমি আশ্রমের শোভায় এতদূর মুগ্ধ হইলাম যে তখনই ক্লান্ত দেহে তাহার চতুঃপার্শ্বস্থ উদ্যান দেখিবার জন্য বাহির হইলাম।

মঠটি একটি ক্রমনিম্ন পার্ব্বত্যস্থানের উপর স্থাপিত; ইহার পিছনে একটি ক্রমনিম্ন পার্ব্বত্যময় স্থান আছে; ইহা গ্রাণাইট (Granite) এর। বাটীটির কার্ণিসের মধ্যস্থলে "ততো হংসঃ প্রচোদয়াৎ" জ্ঞাপক ছবি আছে, তাহার উপর বৈদ্যুতিক আলো রহিয়াছে।

মঠটি একটি উদ্যানের মধ্যে অবস্থিত; ইহাকে উদ্যান-বাটিকা বলা যাইতে পারে। এই উদ্যানে নানাবিধ বৃক্ষের সমাবেশ আছে; নিম্নলিখিতগুলিই উল্লেখযোগ্য :—আপেল, পিয়ার, বেদানা, আঙ্গুর, পিচ্, লকেট, আম্র (অনেক প্রকারের), পেয়ারা, আতা, কাঁটাল

বিল্ব, শিশু, কর্পূর, চন্দন, কর্ক, রবার, বাতাপি লেবু, নেভাল অরেঞ্জ ও আরও কত প্রকারের লেবু, সাইপ্রেস (Cypress) প্রভৃতি। নানাবিধ ফুলের গাছও রহিয়াছে,—কত প্রকারের গোলাপ, চামেলী, বেল, জবা, কলিকা, টগর, গন্ধরাজ, চন্দ্রমল্লিকা, লিলি, দোপাটি, কাঞ্চন, হনিসাকল্, নানাবিধ সিজন্ ফ্লাওয়ার ইত্যাদি।

উদ্যানটি অতি সুন্দর; দ্বারদেশ হইতে একটি পথ কিয়দ্দূর যাইয়া বিভক্ত হইয়া বৃত্তাভাসে পরিণত হইয়াছে।

এই বৃত্তাভাসের মধ্যে নানাবিধ বৃক্ষশ্রেণী, জলাধার ও সর্ব্বমধ্যে বৈদ্যুতিক আর্কল্যাম্পের স্তম্ভ রহিয়াছে। সদাশয় মহিসুর গবর্ণমেণ্ট বিনাব্যয়ে উদ্যানটিকে আলোকিত করেন; কিন্তু আশ্রমের জন্য সাধারণের ন্যায় মূল্য দিতে হয়।

স্থানীয় লোকেরা মঠের সম্মুখের প্রকোষ্ঠটিকে টেম্পেল temple নামে অভিহিত করে, কেননা এই ঘরে পরমহংস মহাশয় ও স্বামী বিবেকানন্দের প্রকাণ্ড প্রতিকৃতি রহিয়াছে; সাধারণ লোকে ঠাকুর ঘরে না যাইয়া এই ঘরেই তাঁহাদের ছবিকে প্রণাম ও দর্শন করে; রবিবার দিন এখানে ধর্ম্মসম্বন্ধীয় বক্তৃতা বা কথোপকথন হয় ও রামনাম কীর্ত্তন হয়। সে অতি সুন্দর ব্যাপার; কয়েকটি শ্লোকের মধ্যে সমস্ত রামচরিত্র সংক্ষেপে নিবদ্ধ করিয়া সপ্তকাণ্ড রামায়ণ বর্ণনা করা হইয়াছে। ইহা দাক্ষিণাত্যের অনেকস্থলে প্রচলিত দেখিয়াছি।

আমি যে সময় যাই তখন মঠে তিনজন সন্ন্যাসী ও একজন ব্রহ্মচারী বাস করিতেছিলেন; তাঁহাদের প্রত্যেকের জন্য বিভিন্ন প্রকোষ্ঠ নির্দ্দিষ্ট; ঘরগুলিতে আড়ম্বর না থাকিলেও স্বচ্ছন্দে থাকিয়া পাঠ ও ধ্যান ধারণা করিবার বিশেষ বন্দোবস্ত। প্রত্যেক ঘরে টেবিল চেয়ার ইলেক্‌ট্রিক আলো রহিয়াছে; ইঁহারা বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। মঠের লাইব্রেরিটি সামান্য হইলেও প্রধান প্রধান অবশ্য পঠিতব্য পুস্তকগুলি আছে। তন্মধ্যে নিম্নলিখিত গ্রন্থকার-

গুলির পুস্তকই উল্লেখযোগ্য :—হার্ব্বার্ট স্পেন্‌সার, হাক্‌সলি, জন্ ষ্টুয়ার্ট মিল্, ইমারসন্, কার্লাইল, সেক্‌স্‌পিয়র, ফ্রিমান্, সিলি ইত্যাদি ; আর সংস্কৃত পুস্তকের মধ্যে উপনিষদ্, নিরুক্ত, বেদ, বেদান্ত ধাতুবৃত্তি ইত্যাদি। পুস্তক-গৌরবে মাদ্রাজ মঠটি ব্যাঙ্গালোর মঠ অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর।

মঠের পিছনের দিকের বারাণ্ডায় বসিয়া কফিপান ও কথাবার্ত্তা কহা হয়। এই বারাণ্ডার সম্মুখে যেন গোলাপের মেলা বসিয়াছে ; এমন সুন্দর ও সুবৃহৎ পুষ্প আমি দার্জ্জিলিঙ্গ ভিন্ন অন্য কোথায়ও দেখি নাই।

এখানকার আশ্রমাধ্যক্ষ স্বামী নির্ম্মলানন্দের উদ্যান স্থাপন ও সংরক্ষণের দিকে বিশেষ দৃষ্টি। ইনি প্রায় সমস্তদিনই নিড়েন, খোন্তা লইয়া পুত্রসদৃশ প্রিয়তম বৃক্ষগুলির তলদেশ খনন করিতেছেন বা কোন না কোন পরিচর্য্যা করিতেছেন। ইহাতে তাঁহার বিশেষ আনন্দ। ইনি প্রায় দশ বার বৎসর পূর্ব্বে আমেরিকায় বেদান্ত প্রচারে গিয়াছিলেন ; সেখান হইতে এবিদ্যা শিখিয়া আসিয়াছেন। অনেক সুন্দর সুন্দর কলম প্রস্তুত করিয়াছেন ; শুনিয়াছি এখানকার বোটানিকাল গার্ডেনের অধ্যক্ষেরা পর্য্যন্ত ইঁহার এবিদ্যার প্রশংসা করেন। আমাকে মাঝে মাঝে ধরিয়া লইয়া গিয়া বাডিং (Budding), কাটিং (Cutting), লেয়ারিং (Layering) প্রভৃতি কলম করিবার নানাবিধ পদ্ধতি শিখাইতেন।

আশ্রমের একজন সন্ন্যাসীর প্রতি আমি বিশেষ আকৃষ্ট হইলাম ; দেখিতে ঠিক বৌদ্ধশ্রমণের ন্যায়, কিন্তু মস্তক মুণ্ডিত নহে ; ইঁহার মুখকান্তিও দিব্যজ্যোতিতে প্রদীপ্ত ; তাঁহার হৃদয় যেন মমতায় নির্ম্মিত। ইঁহার নাম স্বামী বিশুদ্ধানন্দ। আমার শীতবস্ত্র নাই দেখিয়া নিজের একমাত্র ফ্লানেলের জামাটি আমায় পরাইয়া দিলেন ; আমেরিক মহিলা দেবমাতা যখন মাদ্রাজে ছিলেন, তাঁহার জন্য দুটি জামা তৈয়ার করিয়া দিয়াছিলেন ; একটি ইনি পূর্ব্বেই বিতরণ

করিয়া দিয়াছিলেন; আর একটি যাহা নিজের ব্যবহারের জন্ত ছিল আমায় পরিতে দিলেন। এই জামাটি না থাকিলে মহিস্থরের পার্ব্বত্য প্রদেশে উন্মুক্ত আকাশতলে বা খোলা গোযানে প্রায় দুই শত মাইল পথ ভ্রমণ করিতে পারিতাম না। স্বামীজি তাঁহার উক্ত শীতবস্ত্রও আমায় দিলেন। মানুষ এত উচ্চ স্তরে পৌঁছায় দেখিয়া বিশেষ অভিভূত হইলাম; আরও অনেক বিষয়ে আমি ইঁহার নিকট ঋণী; ইঁহার উপদেশ ও সাহায্য না পাইলে মহিস্থরের অনেক স্থল আমার দেখা ঘটিত না।

আশ্রমে আর একটি সন্ন্যাসী ছিলেন; ইনি একজন চিত্রশিল্পী ও সঙ্গীতজ্ঞ। ইনি সুন্দর তৈলচিত্র অঙ্কিত করিতে পারেন; সঙ্গীত ইনি রীতিমত চর্চ্চা করিয়াছেন; ইঁহার মত সুমিষ্ট কণ্ঠস্বর আমি অল্পই শুনিয়াছি। ইঁহার পিতা পরমহংস মহাশয়ের বিশেষ ভক্ত ছিলেন, নাম ৺নবগোপাল ঘোষ। ইঁহার শরীর অসুস্থ বলিয়া ব্যাঙ্গালোরে আসিয়াছেন; কিন্তু টেম্পেল্ গৃহে কয়েক ঘণ্টা ধরিয়া প্রত্যহ প্রাতে তানপুরা সংযোগে সুরদাস প্রভৃতির ভজন-গান করিতেন। আশ্রমের রন্ধন-কার্য্যের জন্য যে ব্রাহ্মণটি রহিয়াছে, সে বড় চমৎকার লোক। আশ্রমের বৎসতরী তাহার এমনই অনুরক্ত যে যত দূরেই থাকুক না কেন তাহার কণ্ঠস্বর শুনিলেই ছুটিয়া আসিবে। এ লোকটির বাটী হিমালয়ের নিকটস্থ চম্বাভেলি—কোথায় চম্বা উপত্যকা আর কোথায় ব্যাঙ্গালোর! চম্বাভেলির রাজা আশ্রমাধ্যক্ষ স্বামী নির্ম্মলানন্দের ভক্ত ও বন্ধু বলিয়া ব্রাহ্মণটি এত দূর হইতে আসিয়াছে। সে প্রত্যহ মধ্যাহ্নে যখন প্রকাণ্ড পাঞ্জাবী উষ্ণীষ পরিধান করিয়া ভ্রমণে বহির্গত হইত তখন তাহার এরিষ্টক্রেটিক বা বড় ঘরের চাল দেখিয়া আমি হাস্য সম্বরণ করিতে পারিতাম না। তখন সে প্রায়ই আমার ভৃত্যটিকে সঙ্গে লইত না, যদি বা কখন লইত, তাহা হইলে তাহাকে ভৃত্যের ব্যবধানে রাখিত, অন্য সময় কিন্তু তাহারা একসঙ্গে এক ঘরে থাকিত।

আমি কলিকাতা হইতে আসিবার সময় মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত লাট-সাহেবের চিঠী আনিয়াছি; তাহাতে অনুরোধ করা আছে যে সাধারণে যেন আমার সাহায্যের প্রয়োজন হইলে সাহায্য করে। সেখানি লইয়া মহিসুর রাজ্যের রেসিডেন্ট কর্ণেল ডেলি (The Hon'ble Col. Sir Hugh Daly) সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইলাম—উদ্দেশ্য মহিসুর প্রদেশের পার্ব্বত্য ও অরণ্যসঙ্কুল স্থানে ভ্রমণ করিবার সময় রাজসরকারের সাহায্যপ্রাপ্তি। এদেশের লোকের ভাষা কানারী; আমাদের ভাষা বা সংস্কৃতের সহিত বিন্দুমাত্রও সাদৃশ্য নাই, ইঁহাদের আচার ব্যবহার আমাদের মত আদৌ নহে; আমার চিন্তা হইতেছিল কি প্রকারে পর্য্যটন-ব্যাপার নিষ্পন্ন করিব।

রেসিডেন্সিতে যাইবার সময় আমার সঙ্গে স্বামী বিশুদ্ধানন্দ চলিলেন; ইহা এক প্রকাণ্ড উদ্যানের মধ্যে অবস্থিত; "ঝটকা" বা অশ্বযান দ্বারদেশে পৌঁছিলে আমরা পদব্রজে চলিলাম; গৈরিক বস্ত্র পরিহিত বলিয়া স্বামীজির ভিতরে যাইতে অনিচ্ছা প্রকাশ করিতেছিলেন; আমি তাঁহাকে জোর করিয়া উদ্যানের মধ্যে লইয়া গেলাম, বলিলাম, "গৈরিক বস্ত্রের সম্মান মণিমুক্তা বা রাজবেশ অপেক্ষা অনেক অধিক।" রেসিডেন্সির সম্মুখে যে গাড়ী-বারাণ্ডা আছে তথায় উপস্থিত হইলে, শসস্ত্র প্রহরীরা আমাকে বসিবার আসন দিল; একখানি মোটরকার অপেক্ষা করিতেছে; অনুসন্ধানে জানিলাম মহারাজার প্রাইভেট সেক্রেটারী ক্যাম্বেল সাহেব রেসিডেণ্ট মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছেন; ইনি একজন সিবিলিয়ান; আমি আমার কার্ড পাঠাইয়া দিলাম; ক্যাম্বেল সাহেবেরও কার্য্য শেষ হইয়াছিল; তিনি চলিয়া গেলেন। রেসিডেন্ট মহাশয় বাহির পর্য্যন্ত আসিয়া আমায় করমর্দ্দন করিয়া ভিতরে লইয়া গেলেন। তিনি দণ্ডায়মান রহিলেন ও আমায় বসিতে অনুরোধ করিলেন; আমি সৌজন্যের সহিত এ সম্মান প্রত্যাখ্যান করিয়া বলিলাম,

"আপনি অগ্রে বসুন, আমি বসিতেছি।" তিনি বলিলেন, "তাহাতে কিছু আসিয়া যায় না; আপনি বসুন।" অগত্যা আমায় অগ্রে বসিতে হইল। লোকটি কৃশ ও শ্মশ্রুগুম্ফবিহীন; মস্তকে কেশ নাই বলিয়া পরচুলা ব্যবহার করেন; সহজে ধরিতে পারা যায় না। তাঁহাকে আমার আগমনের কারণ সংক্ষেপে বুঝাইয়া দিয়া চিফ্ সেক্রেটারী কার্ সাহেবের সহিযুক্ত লাটসাহেবের চিঠীখানি দিলাম; তাহা পাঠ করিয়া বলিলেন, "মিঃ গাঙ্গুলি, মহিসুর রাজ্য ত ইংরাজের অধীন নহে; আমি আপনার কি সাহায্য করিতে পারি বলুন? আপনি মহিসুর রাজ্যের প্রধান অমাত্যের (Dewan) সহিত দেখা করুন না।" আমি বলিলাম, "আইনানুসারে আপনাকে ডিঙ্গাইয়া আমি ত তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে পারি না।" তিনি তৎক্ষণাৎ দেওয়ান মহাশয়কে কি লিখিয়া লাটসাহেবের চিঠীখানি তাহার সঙ্গে দিয়া পত্রখানি বন্ধ করিয়া আমার হস্তে দিলেন। আমি দেখিতে পাইলাম না তিনি কি লিখিলেন? প্রধান অমাত্য মহাশয় সে সময় ব্যাঙ্গালোর নগরে ছিলেন না। আমি বলিলাম, প্রধান অমাত্য মহাশয় যদি শীঘ্র ব্যাঙ্গালোরে ফিরিয়া না আসেন তাহা হইলে আমার ত বিলম্ব হইয়া যাইবে, অতএব এ চিঠীখানি যাহাতে চিফ্ সেক্রেটারী মহোদয় খুলিতে পারেন ও আমার ভ্রমণের বন্দোবস্ত করিয়া দিতে পারেন লিখিয়া দিন; ইনি তৎক্ষণাৎ তাহাই করিয়া দিলেন। উঠিবার সময় তাঁহাকে বিশেষ ধন্যবাদ জানাইলাম; তিনিও করমর্দ্দন করিলেন। বাস্তবিক রেসিডেন্ট মহোদয় যেরূপ সৌজন্য-পূর্ণ ব্যবহার করিয়াছিলেন তাহাতে তাঁহার প্রতি আমার বিশেষ ভক্তি হইল। আমার বিশ্বাস সামরিক বিভাগের লোক বলিয়াই এতদূর ভদ্র ব্যবহার করিলেন।

স্বামীজি বাহিরে অপেক্ষা করিতেছিলেন; তাঁহাকে সমস্ত বলিলাম; তিনি বিশেষ আনন্দিত হইলেন। সংবাদ পাইলাম যে দেওয়ান বাহাদুর তখনও ব্যাঙ্গালোরে ফিরেন নাই; অগত্যা সেক্রেটেরী-

য়েট আফিসে যাইয়া চিফ্ সেক্রেটারী মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিলাম। তিনি বিশেষ সম্মান করিলেন ; জিজ্ঞাসা করিলেন যে যেখানে যেখানে যাইব সেখানে সরকার বাহাদুরের অতিথি হইব, না ডাকবাঙ্গলায় থাকিব ? আমি বলিলাম যে আমি নিজব্যয়ে ডাকবাঙ্গলায় থাকিব, শুধু আমার স্নান ও আহারের যাহাতে অসুবিধা না হয় তাহার বন্দোবস্ত করিয়া দিলেই হইবে ; আমি মূল্য দিতে স্বীকৃত হইলাম। তিনি আমার "প্রোগ্রাম" দেখিতে চাহিলেন, কেননা সেই মত বন্দোবস্ত করিয়া দিবেন। কলিকাতা হইতে আমার এক মাইসোরী বন্ধুর নিকট এক খস্ড়া "প্রোগ্রাম" ঠিক করিয়া আনিয়াছিলাম ; তাহা দেখাইলে তিনি মহিসুর রাজ্যের সমস্ত ডেপুটি কমিশনার বা জেলার ম্যাজিষ্ট্রেটদের উপর তৎক্ষণাৎ পরওয়ানা বাহির করাইয়া দিলেন ও সেই দিনই তাহা প্রেরণ করিবার বন্দোবস্ত করিলেন। চলিয়া আসিবার সময় দুই একটি উপদেশ দিয়া দিলেন, এবং অতদূর হইতে আসিয়া যে মহিসুরের বন পর্ব্বত অরণ্যে বেড়াইতে যাইতেছি চিন্তা করিয়া বেশ আনন্দ অনুভব করিলেন।

সেক্রেটেরীয়েট আফিসটি দেখিতে বেশ সুন্দর ; ইহা দৈর্ঘ্যে কলিকাতার রাইটার্স্ বিল্ডিং অপেক্ষা কিছু অল্প হইবে। যে ঘরে রাষ্ট্রীয় সভা হয় বা যাহা Council Chamber নামে কথিত তাহা বেশ প্রকাণ্ড ও মনোহর ; চিফ্ সেক্রেটারীর ঘরে যাইতে হইলে ইহার ভিতর দিয়া যাইতে হয়। প্রধান অমাত্য বা দেওয়ান মহাশয়ের আফিসও এই বাটীতে। রাষ্ট্রসংক্রান্ত কোন কার্য্যের জন্য তিনি নগরে ছিলেন না বলিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ হইল না। ইঁহার বিষয় অবগত হইয়া বুঝিলাম যে ইনি একজন অসাধারণ লোক। ইঁহার নাম সার এম্ বিশ্বেশ্বরাইয়া। ইনি পুনা এঞ্জিনিয়ারিং কলেজ হইতে এম্, সি, ই, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া বোম্বাই প্রদেশে গবর্ণমেন্টের পূর্ত্তবিভাগে কর্ম্ম করিতেন ; নিজ প্রতিভাবলে সুপারিন্-

ষ্টেশিং এঞ্জিনিয়ার পদে উন্নীত হইয়াছিলেন। লর্ড কার্জ্জন তাঁহার প্রতিভার বিষয় অবগত হইয়া যখন সিমলায় পূর্ত্তবিভাগের সভা আহ্বান করেন, তখন তাঁহাকে সভ্য মনোনীত করিয়াছিলেন। ইনি বোম্বাই গবর্ণমেণ্টের কর্ম্ম হইতে অবসর লইয়া ইউরোপ গমন করেন। সেই স্থান হইতে তারযোগে সংবাদ পান যে মহিসুর গবর্ণমেণ্টের চিফ্ এঞ্জিনিয়ার নিযুক্ত হইয়াছেন; পরে দুই তিন বৎসর হইল মহিসুর রাজ্যের দেওয়ান বা প্রধান অমাত্য নিযুক্ত হন। লোকটি যেন প্রতিভার অবতার; ইনি প্রত্যেক বিষয় তলাইয়া বুঝিবার চেষ্টা করেন এবং অত্যন্ত দৃঢ়চেতা ও কর্ম্মঠ। ১৮৮১ খৃঃ অব্দের পর মহিসুর রাজ্য ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক বর্ত্তমান রাজবংশকে প্রত্য-র্পিত হইলে সার শেষাদ্রি আয়ার মহাশয়কে দেওয়ান নিযুক্ত করা হয়; ইনি কূটনীতি-বিশারদ ছিলেন বলিয়া বিশেষ খ্যাতি আছে। সার বিশ্বেশ্বরাইয়া মহাশয় এরূপ নহেন; ইনি কড়াক্রান্তির হিসাব রাখেন এবং প্রকৃত এঞ্জিনিয়ারের ন্যায় রাজ্যের সামান্য সামান্য অতি তুচ্ছ তথ্যগুলিও তাঁহার দৃষ্টি এড়াইতে পারে না।

ভ্রমণের সমস্ত বন্দোবস্ত করিয়া আমরা ব্যাঙ্গালোর মিউজিয়াম দেখিতে যাইলাম। মিউজিয়াম বাটীটি দেখিতে ক্ষুদ্র ও সুন্দর; ইহাতে দর্শনযোগ্য বিশেষ কিছুই নাই; তবে মহিসুর রাজ্যের খনিজ ও ভূতত্ত্ব সম্বন্ধীয় স্পেসিমেন (Specimen) গুলি দেখিবার জিনিস। আমার ভূতত্ত্ব ও খনিজতত্ত্ব পড়া ছিল বলিয়া স্বামীজিকে সব বুঝাইতে পারিলাম; তিনিও বিশেষ আনন্দিত হইলেন। এখান হইতে সার শেষাদ্রি আয়ার মেমোরিয়াল লাইব্রেরীর পার্শ্ব দিয়া আমরা চলিলাম, গন্তব্য—ভাতার সায়ান্স ইন্‌ষ্টিটিউট্। বোম্বাই প্রদেশের প্রসিদ্ধ ব্যবসায়ী স্বনামধন্য সার জেমসেৎজি তাতা মহাশয় ভারতবর্ষে বৈজ্ঞানিক গবেষণার জন্য ত্রিশ লক্ষ টাকা দান করিয়া গিয়াছেন। তাহা হইতে এই বিজ্ঞানাগার সৃষ্টি হইয়াছে। ব্যাঙ্গা-

লোরের জলবায়ু বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার অনুকূল বলিয়া বিলাত হইতে র্যাম্‌সে প্রমুখ যে সকল বিশেষজ্ঞ ব্যক্তি আসিয়াছিলেন তাঁহারা ভারতের মধ্যে এস্থানই পরীক্ষাগারের উপযোগী স্থির করিয়াছিলেন। এখানে ভারতের নানাস্থান হইতে উপাধিধারী ছাত্রেরা আসিয়া বৈজ্ঞানিক গবেষণা করেন; ইহার বর্ত্তমান অবস্থা শোচনীয়। আমি যে প্রতিপত্তি শুনিয়াছিলাম, দেখিয়া বিশেষ নিরাশ হইলাম। এখানে সবেমাত্র দশবারটি ছাত্র রহিয়াছেন। তাঁহারা কেহই বিশেষ উচ্চ-শিক্ষিত বোধ হইল না; সবেমাত্র বি, এ, বা বি, এস, সি, উপাধিধারী।

ল্যাবরেটরীগুলির বিশেষত্ব কিছুই দেখিলাম না। আমাদের কলিকাতাস্থ প্রেসিডেন্সি কলেজের বা শিবপুর এঞ্জিনিয়ারিং কলেজের পরীক্ষাগারগুলি ইহা অপেক্ষা কোন অংশে নিকৃষ্ট নহে। এখানে ফিজিক্স্ (Physics) বা ভূতত্ত্বের কোন পরীক্ষাগার নাই; শুদ্ধ রসায়ন ও তড়িৎবিষয়ক এঞ্জিনিয়ারিং বিদ্যার চর্চ্চা হয়। আমি শিবপুর কলেজের পরীক্ষাগারে যেরূপ উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট তুলাযন্ত্র বা ব্যালান্স্ দেখিয়াছি এখানে তেমন কিছু দেখিলাম না। এখানকার বৈদ্যুতিক পরীক্ষাগারও মোটামুটি ধরণের। এখানে গবেষণার জন্য কোন বাঙ্গালী ছাত্রকে দেখিলাম না; তাহাতে দুঃখের কোন কারণও নাই, কেননা বঙ্গদেশে থাকিয়া বিজ্ঞানচর্চ্চা করিবার এখান হইতে অনেক বেশী সুবিধা আছে। সমস্ত ইন্‌ষ্টিটিউটের মধ্যে বৈদ্যুতিক পরীক্ষাগারটিই আমার মন আকৃষ্ট করিল; ষ্টোরেজ্ ব্যাটারির ঘরটিও বেশ। শিবপুরে আমরা যাহা দেখিয়াছি তাহা অপেক্ষা বেশী কিছুই দেখিলাম না। একজন পারসী ছাত্র আমাদের বৈদ্যুতিক পরীক্ষাগার সমস্ত দেখাইল এবং একজন সিন্ধুদেশবাসী ছাত্র রাসায়নিক পরীক্ষাগার সমূহ আমাদের দেখাইতে লাগিল।

এখানকার ইকনমিক্ বিভাগে দেখিলাম একজন বাঙ্গালী ভদ্রলোক সাবান সম্বন্ধে গবেষণা করিতেছেন। ইনি ফ্রান্স দেশে রসায়ন শিক্ষা করিতে গিয়াছিলেন। তাঁহার নাম মিঃ চক্রবর্ত্তী, পূরা নাম

স্মরণ নাই। ইনি মহিসুর গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক এখানে সাবান সম্বন্ধে পরীক্ষা করিতে প্রেরিত হইয়াছেন; ইন্‌ষ্টিটিউটের ছাত্র হিসাবে আসেন নাই। মহিসুর গবর্ণমেণ্ট দেখিতেছেন যে এখানে দেশী সাবান প্রস্তুত করিয়া চালাইতে পারা যায় কিনা। আমি একখণ্ড সাবান ক্রয় করিলাম; আমার স্বদেশবাসী বাঙ্গালীর উদ্যমের ফল বলিয়া। তিনি সাবান প্রস্তুত প্রণালী বেশ যত্নের সহিত বুঝাইয়া দিলেন। উচ্চ মঞ্চের উপর দাঁড়াইয়া তিনি প্রকাণ্ড কটাহে সাবান জ্বাল দিতেছেন, এবং তুলিয়া এক একবার দেখিতেছেন। যে ডিগ্রী উত্তাপে জ্বাল দেওয়া উচিত, তাপমান যন্ত্রসাহায্যে তাহা ঠিক করিয়া রাখিয়াছেন। আমি যে সাবানটি কিনিলাম তাহা নর্থ-ওয়েষ্ট কোম্পানীর সাবানের মত উত্তম বোধ হইল না; বেশ নরম। মিঃ চক্রবর্ত্তী আমায় বুঝাইলেন যে ইহা নর্থ-ওয়েষ্ট কোম্পানীর সাবান অপেক্ষা কোন অংশে নিকৃষ্ট নহে। আমি ইহাকে আমার বাক্সের এক কোণে রাখিয়া দিলাম; দুঃখের বিষয় ইহা নরম হইয়া ঈষৎ গলিয়া আমার অনেকগুলি পরিধেয় বস্ত্র নষ্ট করিয়া দিয়াছিল।

ইকনমিক্ ল্যাবরেটরীর এক অংশে পেন্সিল প্রস্তুত করিবার পরীক্ষা চলিতেছে। কপিইং পেন্সিলও পরীক্ষা হইতেছে। পেন্সিল-গুলি তত ভাল বোধ হইল না। চক্ষু মুদ্রিত করিয়া স্বদেশী দ্রব্য মাত্রই যে ভাল এ মত প্রকাশ করিয়া আমাদের অনেক অনিষ্ট হইয়াছে। আমি উহার আদৌ পক্ষপাতী নহি। পরীক্ষার উপর পরীক্ষা করিয়া আমাদিগকে কৃতকার্য্য হইতে হইবে; মিথ্যা প্রশংসার স্তোকবাক্যে আত্মবিস্মৃত হওয়া বুদ্ধিমানের কার্য্য নহে। পেন্সিলের উপযোগী কাষ্ঠের জন্য মহিসুর গবর্ণমেণ্টকে বড়ই চিন্তিত হইতে হইয়াছিল; শুনিতেছি যে উপযুক্ত কাষ্ঠ মিলিয়াছে। শুনিয়া সুখী হইলাম মহিসুর গবর্ণমেণ্ট সাবান প্রস্তুতের জন্য মিঃ চক্রবর্ত্তীকে নিযুক্ত করিয়াছেন এবং ইহার সমস্ত আয়োজন ঠিক হইয়া গিয়াছে; ইহা পরে সংবাদপত্রে পড়িয়াছিলাম; কতদূর সত্য

জানি না। ইকনমিক ল্যাবরেটরীর আর একটি প্রকোষ্ঠে চন্দনতৈল প্রস্তুত হইতেছে। ইহা চোয়াইয়া তৈয়ার করা হইতেছে। মহিসুর রাজ্যে প্রচুর পরিমাণে চন্দন বৃক্ষ জন্মে।

ইন্‌ষ্টিটিউটের একটি জিনিষ উল্লেখযোগ্য। এখানকার লাইব্রেরী বা গ্রন্থশালায় নানা ভাষায় লিখিত অনেক প্রকারের বৈজ্ঞানিক পত্রিকা আছে। এই সব পত্রিকা না পড়িলে বিজ্ঞান-জ্ঞান কখনই সম্পূর্ণ হয় না; কেননা অধিকাংশ গবেষণার ফল এখনও মাসিক বা ত্রৈমাসিক পত্রিকার কলেবর পরিত্যাগ করিয়া পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয় নাই। জর্ম্মাণ ইউনিভার্‌সিটি হইতে পি, এইচ, ডি, উপাধিপ্রাপ্ত আমার এক দেশীয় বন্ধুর নিকট শুনিয়াছি যে একজন বাঙ্গালী ছাত্র পি, এইচ, ডি, উপাধির জন্য শিক্ষকের পরামর্শে কয়েক বৎসর ধরিয়া গবেষণা করিয়া একটি প্রবন্ধ রচনা করিয়া পাঠাইলে, বৈজ্ঞানিক পত্রিকার সূচিপৃষ্ঠে দেখা গেল যে, এ বিষয়ের গবেষণা পূর্ব্বে হইয়া গিয়াছে, তিনি ইহা জানিতেন না; কিন্তু তথাপি আর এক বৎসর থাকিয়া অন্য বিষয়ে গবেষণা করিয়া প্রবন্ধ রচনা করিয়া পি, এইচ, ডি, উপাধি লাভ করিতে হইল।

সম্প্রতি ইন্‌ষ্টিটিউট্-সংলগ্ন প্রকাণ্ড লাইব্রেরী বাটী নির্ম্মিত হইতেছে। ট্রাষ্টিদিগের সহিত কোন বিষয়ে মনোমালিন্য হওয়ায়, ইহার অধ্যক্ষ সুপ্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত ডক্টার ট্রাভার্‌স্ ইন্‌ষ্টিটিউটের সহিত সম্পর্ক পরিত্যাগ করিয়া স্বদেশে চলিয়া গিয়াছেন। হিসাব লইয়া ইঁহার সম্বন্ধে অনেক অপবাদ শুনিলাম; সে সব কথা যাউক।

ফিরিবার সময় কিছু জলযোগ করিয়া যাইবার জন্য সিন্ধুদেশীয় ছাত্রটি বিশেষ অনুরোধ করিতে লাগিলেন; তিনি কিছুতেই ছাড়িলেন না। ইনি স্বামীজির আবার বন্ধু; ইঁহাদের হোষ্টেলে যাওয়া গেল। হোষ্টেলটি দেখিতে সুন্দর; বাটীটি একতল; টেনিস্‌কোর্ট ইহার সহিত সংলগ্ন। সবে ত দশ বারটি ছাত্র আছে; প্রায় সমস্ত

প্রকোষ্ঠগুলিরই দ্বারবন্ধ; ভূতের বাটীর মত বোধ হইল। স্থানটি বেশ নির্জ্জন। বাস্তবিক এই প্রকার স্থানই সরস্বতীর উপাসনার জন্য বিশেষ উপযোগী।

আমরা ইঁহাদের প্রশস্ত ও পরিচ্ছন্ন ভোজনাগারে (Dining Hall) প্রবেশ করিলাম। টেবিলের উপর সুধাধবল বস্ত্র বিছান; মধ্যে ফুলদানীতে ফুল রহিয়াছে। আমাদের প্লেটে করিয়া হালুয়া, কফি ও দুই একখানি বিস্কুট দিয়া যাইল। মিঃ চক্রবর্ত্তী ও পার্‌সী ভদ্রলোকটিও আমাদের সঙ্গে বসিলেন; বৈজ্ঞানিক, সামাজিক, রাষ্ট্রীয় ও অর্থতত্ত্ব-সম্বন্ধীয় নানা কথাবার্ত্তায় অপরাহ্ণ মধুরভাবে কাটিয়া গেল। সে-দিনকার স্মৃতি চিরকাল থাকিবে।

শ্রীমনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায়।

তীর্থ-ভ্রমণ *

[১]

(খানাকুল হইতে হরিদ্বার। ১৮৫৩ অব্দ।)

খানাকুল কৃষ্ণনগরের সর্ব্বাধিকারী বংশ বাঙ্গালায় বহুদিন অবধি খুব প্রসিদ্ধ,—ইঁহারা জাতিতে কায়স্থ,—ইঁহাদের উপাধি বসু। কায়স্থ কুলীন সমাজে ইঁহাদের স্থান সকলের অপেক্ষা উচ্চ। পাঠানেরা যখন গৌড়ে রাজত্ব করিতেন তখন রাঢ়ের দক্ষিণ ও পশ্চিমাঞ্চল অনেক সময় উড়িষ্যারাজ্যভুক্ত থাকিত। এখনও

* গ্রন্থকার ৺যদুনাথ সর্ব্বাধিকারী, ৺প্রসন্নকুমার সর্ব্বাধিকারীর পিতা ও শ্রীযুক্ত বাবু দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী, সি, আই, ই, মহোদয়ের পিতামহ।

রাঢ়ের কিয়দংশ উড়িষ্যার ময়ূরভঞ্জরাজ্যভুক্ত। এই সময়ে অনেক দক্ষিণরাঢ়ী কায়স্থ উড়িষ্যার রাজসরকারে বড় বড় চাকরি করিয়া বিলক্ষণ প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। উড়িষ্যার রাজসরকারের সহিত পুরীর জগন্নাথের মন্দিরের সম্পর্ক অতি ঘনিষ্ঠ এবং ওতপ্রোতভাবে মিলিত। যাঁহারাই উড়িষ্যা রাজসরকারে চাকরি করিতেন তাঁহাদেরই মন্দিরে কিছু কিছু বিশেষ অধিকার থাকিত। সেকালে কুলীনগাঁয়ের বসুরা ডুরী না দিলে কোন বাঙ্গালী মন্দিরে যাইতে পারিত না। নারাণগড়ের পালেরা অনুমতি না দিলে কেহই জগন্নাথে যাইতে পারিত না; কারণ বাঙ্গালা হইতে পুরী যাইতে গেলে ঐ গড়ের মাঝখান দিয়াই পথ। খানাকুলের বসুরা উড়িষ্যার রাজসরকারে চাকরি করিয়া সর্ব্বাধিকারী উপাধি পাইয়াছিলেন, অনেক তালুক মুলুক পাইয়াছিলেন এবং সকল সময়ে রাজসম্মানে জগন্নাথের মন্দিরে প্রবেশের অধিকার পাইয়াছিলেন। সে উপাধি তাঁহাদের এখনও আছে,—সে তালুক এখনও আছে এবং পুরীর মন্দিরের সে সম্মান তাঁহাদের এখনও আছে। উড়িষ্যায় হিন্দু রাজত্ব গিয়া পাঠানের রাজত্ব হইয়াছিল,—পাঠানের পর মোগল আসিয়াছিল,—মোগলের পর মারাঠা আসিয়াছিল, তাহার পর ইংরাজ রাজত্ব হইয়াছে। রাঢ়েও অনেক রাজপরিবর্ত্তন হইয়া গিয়াছে,—সর্ব্বাধিকারীদের সম্মান যায় নাই। তাঁহাদের প্রভাব খর্ব্ব হইয়াছে,—তালুকমুলুক অনেক গিয়াছে। খৃষ্টীয় উনিশ শতের শেষে তাঁহারা খানাকুলের পাঁচ সাত ঘর পাড়াগাঁয়ের জমিদারদের মধ্যে একঘর মাত্র হইয়াছিলেন।

সেই সময়ে আমাদের গ্রন্থকার যদুনাথ সর্ব্বাধিকারী মহাশয় জন্মগ্রহণ করেন। পাড়াগাঁয়ের জমিদারেরা আপনার ঘরে বসিয়া যে প্রকার শিক্ষা পাইতেন তিনি সে শিক্ষা সকলই পাইয়াছিলেন। আপনার তালুকের বন্দোবস্ত করা, প্রজার খাজানা আদায় করা, তাহার হিসাব রাখা,—এসকল তিনি বেশ বুঝিতেন। বাঙ্গলা লেখা-

পড়াও বেশ শিখিয়াছিলেন। থানাকুল কৃষ্ণনগরে একটি প্রবল ব্রাহ্মণ ও একটি প্রবল কায়স্থ সমাজ ছিল। তাহার উপরে আবার শাক্ত ও বৈষ্ণব দুই সম্প্রদায়ের লোকই ছিল। থানাকুলের কণাদ ভট্টাচার্য্যের বংশ, বাঁড়ুয্যে ঠাকুরের বংশ, বাঙ্গালায় সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধ ছিল। যদুনাথ কায়স্থসমাজের নেতা ছিলেন এবং পরম বৈষ্ণব ছিলেন। তিনি পরমভক্তিভাবে রাধাকৃষ্ণের সেবা করিতেন। রাধাকৃষ্ণের প্রসাদ ভিন্ন কিছু ভক্ষণ করিতেন না। তিনি খুব হুঁসিয়ার ও জবরদস্ত লোক ছিলেন। সেই জন্য দেশের লোকে তাঁহাকে ভয় করিয়া চলিত ও মান্য করিয়া চলিত। তাঁহার দুই বিবাহ ছিল এবং অনেকগুলি সন্তান-সন্ততি ছিল। ইঁহাদের অনেকে বাঙ্গালায় প্রভূত খ্যাতিলাভ করিয়া গিয়াছেন। ইঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র প্রসন্নকুমার সর্ব্বাধিকারী মহাশয়ের নাম কে না জানে? ইনি পুরাণ হিন্দুকলেজের সর্ব্বোৎকৃষ্ট ছাত্র, গণিত ও ইংরাজীতে অদ্বিতীয় ছিলেন। বহুকাল সংস্কৃত কলেজে প্রিন্সিপালি করিয়া ঐ কলেজে তিনি বি-এ, এবং এম-এ ক্লাস পর্য্যন্ত খুলিয়া গিয়াছিলেন। ইনি গরীব ছাত্রদিগের মা বাপ ছিলেন এবং নিজ ব্যয়ে বহুদিন ধরিয়া থানাকুলে একটি এংলো-সংস্কৃত হাই স্কুল চালাইয়া গিয়াছেন। যদুনাথের দ্বিতীয় পুত্র সূর্য্যকুমার সর্ব্বাধিকারী বহুকাল ধরিয়া কলিকাতার একজন প্রধান ডাক্তার ছিলেন। তৃতীয় পুত্র আনন্দকুমার সর্ব্বাধিকারী সুখ্যাতির সহিত সবজজী করিয়া পেন্সন লইয়াছিলেন। চতুর্থ পুত্র রাজকুমার সর্ব্বাধিকারী লক্ষ্ণৌ ক্যানিং কলেজের সংস্কৃতের অধ্যাপক ছিলেন, লক্ষ্ণৌ 'Times' কাগজের এডিটর এবং লক্ষ্ণৌ ব্রিটিস্ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসনের সেক্রেটারী ছিলেন; পরে কলিকাতায় আসিয়া হিন্দু পেট্রিয়টের এডিটর হন ও ব্রিটিস ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসনের সেক্রেটারী হন।

যদুনাথ কিন্তু ছেলেদের রোজগারের উপর একেবারেই নির্ভর করিতেন না। নিজের যা তালুক ও জমিজমা ছিল তাহারই উপর

তিনি নির্ভর করিতেন; কেবল তীর্থযাত্রার সময় প্রসন্নকুমারের নিকট হইতে বত্রিশটি টাকা লইয়াছিলেন এবং তীর্থ ভ্রমণের সময় মাসিক কিছু সাহায্য লইতেন।

তিনি বাঙ্গলা ১২৬০ সালে অর্থাৎ ইংরাজী ১৮৫৩ সালে তীর্থ যাত্রায় বাহির হন এবং পদব্রজে চারি বৎসরকাল নানাতীর্থে ভ্রমণ করিয়া মিউটিনীর পর কলিকাতায় আসিয়া উপস্থিত হন। তীর্থ-করিতে করিতে তিনি বদরিকাশ্রম, কুলুর পাহাড়, পুষ্কর প্রভৃতি দুর্গম স্থানে গমন করিয়াছিলেন। এতদূর ভ্রমণ করিয়া নিত্য দশ পনর মাইল পথ হাঁটিয়া তীর্থাদি দর্শন করিয়া তীর্থের সমস্ত ক্রিয়া পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে নির্ব্বাহ করিয়া যদুনাথ যে সময়টুকু পাইতেন তাহাতে তীর্থভ্রমণের রোজনামচা লিখিয়া রাখিতেন। সে রোজনামচা পড়িয়া অনেকেই বিস্মিত হইয়াছেন। তাঁহার বাঙ্গলা—তৎকালে বিষয়ীলোকদের মধ্যে যে বাঙ্গলা চলিত খাঁটী সেই বাঙ্গলা। খৃষ্টীয় উনিশ শতকের আরম্ভে তিন রকম বাঙ্গলা চলিত, (১) ভট্টাচার্য্যদিগের বাঙ্গলা, (২) আদালতের বাঙ্গলা ও (৩) বিষয়ীলোকদের বাঙ্গলা। প্রথমটীতে টোলে যে সকল সংস্কৃত বই পড়া হয় সেই সকল সংস্কৃত বইএর সংস্কৃত শব্দ অনেক থাকিত। দ্বিতীয়টীতে পারসী আরবী ও উর্দ্দু শব্দ বেশী থাকিত। তৃতীয়টীতে সংস্কৃতও থাকিত আরবীও থাকিত পারসীও থাকিত উর্দ্দুও থাকিত, কিন্তু কিছুই অধিক পরিমাণে থাকিত না, কোন কড়া শব্দ থাকিত না, যাহা দেশে প্রচলিত, যাহা সকলে বুঝিতে পারিত, —সেই শব্দই থাকিত। যদুনাথের বাঙ্গলা খাঁটী এই বাঙ্গলা। ইহার পর বাঙ্গলার অনেক পরিবর্ত্তন হইয়া গিয়াছে; তিন রকম বাঙ্গলায় মিশিয়া এক রকম অদ্ভুত পদার্থের সৃষ্টি হইয়াছে। সংস্কৃত কলেজের পণ্ডিতমহাশয়েরা অনেক অপ্রচলিত সংস্কৃত পুস্তক হইতে ঝুড়ী ঝুড়ী চোয়ালভাঙ্গা সংস্কৃত শব্দ আনিয়া চালাইয়া দিয়াছেন; পারসী ও আরবী শব্দ একেবারে উঠাইয়া দেবার চেষ্টা হইয়াছে। সুতরাং

যদুনাথ সর্ব্বাধিকারীর এ বাঙ্গলা বাঙ্গালী মাত্রেরই বিশেষ করিয়া পাঠ করা উচিত। যদুনাথ যে রোজনামচা লিখিয়াছেন তাহা ত আর তিনি রীতিসিদ্ধ করিয়া, ভাবিয়া চিন্তিয়া, গ্রন্থকার হইব এই আশায় লেখেন নাই। অবসর মত যাহা দেখিয়াছেন শুনিয়াছেন তাহাই টুকিয়া রাখিয়াছেন, সুতরাং উহাতে মাজাঘষা কিছু নাই। যেমন মনে উদয় হইয়াছে তেমনি তিনি লিখিয়াছেন,—বাঙ্গলায় ভাবিয়াছেন, বাঙ্গলায় লিখিয়াছেন। এখনকার মত ইংরাজীতে ভাবিয়া বাঙ্গলায় তর্জ্জমা করেন নাই। তাই আবার বলিতে চাই, যাঁহারা বাঙ্গলাভাষা শিখিতে চান, তাঁহাদের এ বইখানার বাঙ্গলা যত্ন করিয়া পড়া উচিত। যদুনাথের আর এক বাহাদুরী, তিনি পদ্যে লেখেন নাই। সেকালকার সকলেই পদ্যে লিখিতেন, পয়ারে লিখিতেন,—গদ্য বলিয়া যে একটা জিনিস আছে, চিঠীপত্রে ভিন্ন সেকথা কাহারও মনেই থাকিত না। তাঁহারা জানিতেন লিখিতে হইলেই পয়ারেই লিখিতে হয়।

যদুনাথ সর্ব্বাধিকারীর এই তীর্থ-ভ্রমণে আমাদের একটি বিশেষ উপকার হইবে। এখন রেলপথ হইয়া হাঁটাপথ ও নৌকাপথের কথা আমরা ভুলিতে বসিয়াছি। যদুনাথ যেবার তীর্থ-ভ্রমণে বাহির হন, সেই বৎসরেই রেলের সুরু। সুতরাং রেল হইবার ঠিক পূর্ব্বেই কিরূপে দেশের লোক দূরদূরান্তরে গমনাগমন করিত, কোথায় সরাই ছিল, কোথায় চটি ছিল, কোথায় কি খাবার মিলিত, কোথায় কি মিলিত না; কোন্ পথে কেমন করিয়া যাইতে হইত, তাহা সূক্ষ্মাণুসূক্ষ্মরূপে এই পুস্তকে দেখিতে পাই। ইহাতে আমাদের দেশী ভূগোলের জ্ঞানের মাত্রা একটু বাড়িয়া যাইবে। তাহাতে আবার যদুনাথের নূতন জিনিস দেখিবার ক্ষমতা বেশ একটু ছিল; সুতরাং যেটা যেটা তাঁহার একটু মনে লাগিয়াছে, যেটা যেটা তিনি বাঙ্গলায় সর্ব্বদা দেখেন নাই, তাহা দেখিলেই তিনি টুকিয়া রাখিয়াছেন। ইহাতে তাঁহার বইএর একটু বেশ কদর বাড়িয়া গিয়াছে।

আর এক জিনিস। যদুনাথের জন্ম খৃষ্টীয় উনিশ শতের গোড়ায়।

সেটা বাঙ্গালার বড় অশান্তির সময়; চারিদিকে চুরি, ডাকাতি, লুঠ-তরাজ হইত। ইংরাজেরা কেমন করিয়া প্রভূত পরাক্রমে সেই সকল অশান্তি নিবারণ করিয়াছিলেন যদুনাথ তাহা স্বচক্ষে দেখিয়াছিলেন এবং তাহাতে ইংরাজরাজের প্রতি ও ইংরাজ জাতির প্রতি তাঁহার একটা অসীম ভক্তি ও শ্রদ্ধা হইয়াছিল। সেই রাজভক্তির নিদর্শন এই পুস্তকের পাতে পাতেই আছে। তিনি কোন জায়গায়ই ইংরাজের সুখ্যাতি বই অখ্যাতি করেন নাই। এবং যে কেহ ইংরাজের বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছে তাহারই উপর নিজেও বিরক্তিভাব দেখাইয়াছেন। তিনি যতদূর গিয়াছিলেন, ইংরাজরাজত্বের শান্তি ও সুশৃঙ্খলা দেখিয়া তাঁহার সে রাজভক্তি আরও বাড়িয়া গিয়াছিল। আসিবার সময় যে সকল দেশে মিউটিনীর খুব উৎপাত হইয়াছিল, তিনি সেই সকল দেশের মধ্য দিয়া আসিয়াছিলেন। মিউটিনীর অনেক ঘটনা তিনি স্বচক্ষে দেখিয়াছিলেন অথবা যাহারা দেখিয়াছিল তাহাদের মুখে শুনিয়াছিলেন। কিন্তু 'মিউটিনীয়ার'দের প্রতি তাঁহার কিছুমাত্র শ্রদ্ধা ছিল না। তিনি গোড়া হইতেই বলিয়াছেন, ইহারা অত্যাচার করিয়া দেশ উৎখাত করিবে সত্য, কিন্তু ইংরাজের কিছুই করিতে পারিবে না। ইংরাজের বাহুবল, ইংরাজের যুদ্ধকৌশল, ইংরাজের সুবিবেচনা ও ইংরাজের ধর্ম্মভাবের প্রতি তাঁহার অচলা অটলা ভক্তি ছিল। এবং সে ভক্তি প্রকাশ করিতে তিনি কোথাও ত্রুটি করেন নাই। কাশীতে যখন মিউটিনীর বড়ই গোলযোগ, তখন তিনি কাশীতেই ছিলেন। দেহাতের সুরজবংশী ও রঘুবংশীরা একটা মিছা কথায় ক্ষেপিয়া কিরূপে নানা উৎপাত করিয়াছিল এবং কিরূপে ইংরাজ রাজপুরুষগণ কাশীরাজ ঈশ্বরী সিংহের মধ্যস্থতায় অল্প আয়াসে তাহাদের সহিত সমস্ত গোলযোগ মিটাইয়া লইয়াছিলেন, তাহা তিনি বেশ অপক্ষপাতে বর্ণনা করিয়াছেন। তাঁহার ভ্রমণ-বৃত্তান্ত পড়িতে পড়িতে অনেক সময় তাঁহার সাহস দেখিলে আশ্চর্য্য হইতে হয়।

এখন আমরা রিটার্ণ টিকিটে জগন্নাথ দর্শন করি, রিটার্ণ টিকিটে

গয়ায় পিণ্ড দিই। রবিবার সকালে গয়ায় পৌঁছিয়া দিনের মধ্যে গয়াকৃত্য সারিয়া রাত্রে ফিরিয়া আসিয়া সোমবার আফিস করি। উইক-এণ্ড টিকিটে কাশী, প্রয়াগ এমন কি মথুরা বৃন্দাবন পর্য্যন্ত করিতে পারি। ইউরোপীয় সভ্যতা আমাদের মধ্যে একটা তাড়াতাড়ি হুড়াহুড়ি ভাব আনিয়া দিয়াছে। সব কর্ম্মই আমরা শীঘ্র শীঘ্র সারিতে চাই। ষাট বৎসর পূর্ব্বে এভাবটি ছিল না, তখন তীর্থে যাইলে লোকে তীর্থের সব কর্ম্মই করিয়া আসিত। এখন গয়ায় গিয়া তিনটি পিণ্ড দিলেই যথেষ্ট মনে হয়,—বিষ্ণুপদে, ফল্গু-নদীতে ও অক্ষয় বটে। সেকালে একবার গয়ায় গেলে আর কখনও আসিতে পারিব কি না এই ভয়ে এই আশঙ্কায় লোকে 'খাপ্‌রেল' অর্থাৎ পঁয়তাল্লিশ দিন থাকিয়া পঁয়তাল্লিশ পীঠে পিণ্ড দিত। অথবা 'দরপণী' অথবা পঁয়ত্রিশ পীঠে পিণ্ডদান অথবা 'একদৃষ্ট' বা চার পীঠে পিণ্ডদান। এখনকার বাবুরা এ তিনের কিছুই করেন না, একটা বা তিনটা পীঠে পিণ্ড দিয়া তীর্থ শেষ করিয়া আসেন। সকল তীর্থেই প্রায় এইরূপ হইয়াছে। দুই• একটি প্রধান দেবতা ভিন্ন অন্য দেবতারা লোপ পাইতে বসিয়াছেন। অনেক ছোট ছোট তীর্থও লোপ পাইতে বসিয়াছে। লোকে যখন হাঁটিয়া যাইত,—আপন বশে যাইত,—দুই এক ক্রোশ এদিক ওদিক করিয়া এই সকল তীর্থ দেখিয়া যাইত। এখন রেলে যায়, পথের পাশে যে তীর্থ থাকে তাহাও দেখিতে পারে না। মুঙ্গেরের সীতাকুণ্ডের পাণ্ডারা এখন হায় হায় করিতেছে। সেখানে আর যাত্রী যায় না। যখন লুপ লাইন ভিন্ন লাইন ছিল না, তখন বরং কেহ কেহ সীতা-কুণ্ড দেখিয়া যাইত, কিন্তু কর্ড লাইন ও গ্রাণ্ড কর্ড লাইন খুলায় সীতাকুণ্ড বেপোট হইয়া গিয়াছে। এইরূপ অবস্থায় হাঁটাপথের একটা তীর্থ-যাত্রার কাহিনীতে আমরা অনেক তীর্থের অনেক খবর পাই। সর্ব্বাধিকারী মহাশয়ের তীর্থ-ভ্রমণে এ লাভটা একটু বেশী পরিমাণে আছে।

তীর্থ হইলেই তাহার একটা মাহাত্ম্য আছে। ভুল সংস্কৃতে লেখা অনুষ্টুপ ছন্দে বার পাতা হইতে পঞ্চাশ পাতা পর্য্যন্ত এক একখানি মাহাত্ম্যের পুঁথি। বড় বড় তীর্থের মাহাত্ম্য ইহা অপেক্ষা আরও বড় হয়। মাহাত্ম্যের পুঁথিতে তীর্থের একটা আদি আছে। সত্যযুগে হউক বা তাহারও আগে হউক অথবা কোন প্রাচীন কল্পের সত্যযুগের কোন ঋষি বা দেবতা কোন একটি ধর্ম্ম-কার্য্য করিয়া বা কঠিন তপস্যা করিয়া কোন একটি স্থানকে তীর্থ করিয়া গিয়াছেন। তাহার পর সে তীর্থে কোন কোন দেবতা বাস করেন, তাঁহাদের কেমন করিয়া পূজা করিতে হয়। মূল পূজা ছাড়া তীর্থযাত্রীকে কোন কোন পূজা করিতে হয় এবং সে সকল ক্রিয়ার ফলই বা কি, এ সকলই মাহাত্ম্যে থাকে। তীর্থও অসংখ্য, মাহাত্ম্যও অসংখ্য। যে তীর্থেই যাও মাহাত্ম্য পাইবেই পাইবে। এখন অনেক স্থানে ছাপান মাহাত্ম্যও পাওয়া যায়। হাতোয়ার পরলোকগত মহারাজা একবার তীর্থ করিতে বাহির হইয়া প্রায় পঞ্চাশখানা মাহাত্ম্য সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছিলেন। 'অফ্রেট' সাহেব বলেন যে স্কন্দ নামে একখানা পুরাণ নাই—স্কন্দপুরাণ কেবল অসংখ্য মাহাত্ম্যের সমষ্টি। সর্ব্বাধিকারী মহাশয়ের তীর্থভ্রমণে এই মাহাত্ম্যগুলির মাহাত্ম্য অনেক নষ্ট হইবে। পূজার মন্ত্রতন্ত্র ছাড়া তীর্থসম্বন্ধে হিন্দুর যাহা কিছু জানা আবশ্যক, তিনি সে সমস্তই আপনার পুস্তকে লিখিয়া গিয়াছেন। লোকের আর মাহাত্ম্য পড়িয়া সে সব কথা জানিবার দরকার নাই।

সর্ব্বাধিকারী মহাশয় পরম বৈষ্ণব ছিলেন, সুতরাং বৃন্দাবনের বর্ণনাটা তিনি অতি বিস্তৃত ভাবেই করিয়াছেন। তিনি কয়েক বৎসর ধরিয়া বৃন্দাবনে বাস করিবার জন্য তীর্থভ্রমণে বাহির হইয়াছিলেন। এবং বৃন্দাবন হইতেই তিনি পুষ্কর যাত্রা করেন, বৃন্দাবন হইতেই হরিদ্বার যাত্রা করেন, বৃন্দাবন হইতেই কুলুত পাহাড় যান এবং বৃন্দাবন হইতেই তিনি স্বদেশে ফিরিয়া আসেন। একে ত পরম বৈষ্ণব,

তাহার উপর অনেকদিন বৃন্দাবনে বাস, সুতরাং বৃন্দাবনের কথাটা খুব বেশী করিয়াই লেখা আছে। কোথায় কৃষ্ণ বাঁশী বাজাইয়াছিলেন, কোথায় কৃষ্ণ গোচারণের সময় বসিয়াছিলেন, কোথায় রাসলীলা করিয়াছিলেন, কোথায় বেলা দুই প্রহরে বনের ছায়ায় কৃষ্ণ শুইয়া থাকিতেন, কোথায় রাধিকার সহিত নির্জ্জন বিহার করিয়াছিলেন, কোথায় রাধাকে রাজা করিয়া কৃষ্ণ কোটালবেশ ধরিয়া কর লইয়াছিলেন, কোথায় বৃন্দাবনের গরুরা জলপান করিত, কোথায় কৃষ্ণ গোষ্ঠলীলা করিতেন, কোথায় কৃষ্ণ গাঁ্যাদখেলা করিতেন, এই সব জায়গায় সর্ব্বাধিকারী মহাশয় দেখাইয়া দিয়াছেন। চৈতন্য-পরিকরেরা বৃন্দাবনে কে কোথায় থাকিতেন, কে কোথায় কি লীলা করিয়াছিলেন, ছয় গোস্বামীর পাট, যমুনার দ্বাদশ ঘাট, চার বট, নিকুঞ্জবন, ধীরসমীরের ঘাট, ব্রজভূমির চারিদেব প্রভৃতি বৃন্দাবনের বৈষ্ণবদিগের জানিবার জিনিস সমস্ত তিনি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। বৃন্দাবনে যে সকল মেলা হয়, বৃন্দাবনে যে সকল প্রধান প্রধান কুঞ্জ আছে তাহারও কিছুই সর্ব্বাধিকারী মহাশয় ছাড়েন নাই।

১২৬১ সালের ৭ই আষাঢ় সর্ব্বাধিকারী মহাশয় আর কয়েকটি লোকের সঙ্গে পুষ্কর যাত্রা করেন। পুষ্কর যাইতে হইলে জয়পুর হইয়া যাইতে হইত। বৃন্দাবন হইতে জয়পুর ও জয়পুর হইতে পুষ্কর, ইহার মধ্যে যত গ্রাম নগর, সরাই পান্থশালা মাঠ, ও গাছতলায় যদুবাবু রাত্রিযাপন করিয়াছিলেন, বিশ্রাম করিয়াছিলেন, জলযোগ করিয়াছিলেন অথবা রসুই করিয়া খাইয়াছিলেন, তাহা সমস্তই যদুবাবু বিশেষ করিয়া লিখিয়া গিয়াছেন। এই সমস্ত স্থান ঘুরিয়া তিনি আবার ২০শে শ্রাবণ বৃন্দাবনে উপস্থিত হন। এই সময় হইতে ফাল্গুন পর্য্যন্ত সর্ব্বাধিকারী মহাশয় চুপ করিয়া বৃন্দাবনেই ছিলেন তাঁহার রোজনামাচায় বড় কিছু লেখাপড়া দেখা যায় না। ফাল্গুন মাসে হরিদ্বারের কুম্ভমেলার পূর্ব্বে বৃন্দাবনে

যমুনাপুলিনে এক কুম্ভমেলা হইয়া থাকে। হরিদ্বারের কুম্ভমেলা বার বৎসরের পর হয়, এ মেলাও বার বৎসর পরে হয়। প্রায়ই শুনিতে পাওয়া যায় বৃন্দাবনের কুম্ভমেলা ভাঙ্গিয়া সন্ন্যাসীরা হরিদ্বারে যায়। তথায় আরও নানাদেশ হইতে সন্ন্যাসীরা আসিয়া উপস্থিত হয়। হরিদ্বারে কুম্ভের মেলায় বহুলক্ষ লোকের সমাগম হয়। যদুবাবু ৫ই চৈত্র বৃন্দাবন হইতে যাত্রা করিয়া মিরাট, মজঃফর নগর, রুড়কী, জোয়ালাপুর হইয়া ১৫ই চৈত্র হরিদ্বারে আসিয়া উপস্থিত হন। এইখানে তিনি হরিদ্বার ও কনখলে কুম্ভমেলার যে বর্ণনা করিয়াছেন তাহা পাঠ করিলে চমৎকৃত হইতে হয়। সন্ন্যাসীদের আসন, রাজা-রাজড়ার তাঁবু, ব্যবসাদারের বাজার, ইংরাজ রাজপুরুষের সতর্কতা ও সুব্যবস্থা, লোকের যাহাতে কষ্ট না হয়, যাহাতে সন্ন্যাসীরা মারামারি করিতে না পারে তাহার জন্য পুলিশ ও পল্টন রাখা. সন্ন্যাসীদের এক একদল লইয়া পল্টন ও পুলিশে ঘেরাও করিয়া স্নান করান ও তাহার পর অন্য পথ দিয়া তাহাদের আসনে পৌঁছাইয়া দেওয়া এমনভাবে বর্ণনা করা আছে, পড়িলে সমস্ত জিনিস যেন চোখের উপর ভাসিতে থাকে।

১৫ই চৈত্র হইতে ৮ই বৈশাখ পর্য্যন্ত কেবল কুম্ভমেলারই বর্ণনা। একা মানুষ একদিনে ত আর সব দেখিয়া উঠিতে পারেন না, তাই যেদিন যেখানটা দেখিয়াছেন সেদিন সেখানটা বর্ণনা করিয়াছেন। এই পুস্তকের ১৮৮ পৃষ্ঠা হইতে ২১৮ পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত এক কুম্ভমেলারই বর্ণনা। এবার যাঁহারা হরিদ্বারে কুম্ভমেলা দেখিতে গিয়াছিলেন, তাঁহারা যদি যদুবাবুর তীর্থভ্রমণ পড়িয়া যাইতে পারিতেন নিশ্চয়ই বিশেষ উপকার হইত। এখনকার অবস্থায় ও তখনকার অবস্থায় অনেক তফাৎ। এখন সব লোকই রেলে যায়—সন্ন্যাসীরাও রেলে যায়। সুতরাং যাতায়াতের ক্লেশও অল্প, খরচও অল্প, সময়ও অধিক লাগে না। তখন কিন্তু গমনাগমন পদব্রজে এবং অনেক সময় ধরিয়া হরিদ্বারে অবস্থান করিতে হইত। ছোট

ছোট ঘাসের ঝোপড়া বাঁধিয়া বড় বড় লোককে বাস করিতে হইত, আবার লোক চলিয়া গেলে পুলীশে সেই সব ঘর পোড়াইয়া ফেলিত।

"এই মত মেলার ভঙ্গ হওয়াতে কোম্পানী বাহাদুরের যেসকল কর্ম্মকারক সাহেবগণ এবং পল্টন ছিল সকলে আপন আপন স্থানে গমনোদ্যোগ করিয়া সোহরৎ দিল, 'যে কেহ মেলাতে যাত্রী কি দোকানদার আছে, সকলে এ স্থান হইতে প্রস্থান কর, তবে যদি কেহ থাকিতে ইচ্ছা কর, আপন আপন দ্রব্যাদি সাবধানে রাখিবে, সরকার হইতে চৌকী পাহারা থাকিবে না, ইহাতে কাহার কিছু ক্ষতি হইলে সরকার দায়ী হইবে না।' এই সোহরৎ দিয়া ৬ই বৈশাখ রাত্রি দুইপ্রহর চারিঘণ্টার সময় কুচ্ হইল। যে সমস্ত ঘাসের নূতন ঘরবাড়ী হইয়াছিল, যে যখন যে ঘর হইতে উঠিল তাহার পর সে-ঘর জ্বালাইয়া দিল। এই প্রকারে সকল ঘরে অগ্নি দেওয়াতে অগ্নিময় ক্ষেত্র হইল। ঐ রাত্রি শশব্যস্ত হইয়া থাকিতে হইল। সকালে মেলা ভঙ্গ হইল।

"৭ই বৈশাখ আমাদিগকে হরিদ্বারে থাকিতে হইল। বেলা তৃতীয় প্রহরের পর বৃষ্টি আরম্ভ, অতিশয় জল ও বাতাস হইতে লাগিল, মাঠের মধ্যে গঙ্গার তীরে ঘাসের ঘরে থাকিয়া যত সুখভোগ করা হইল। বস্ত্রাদি শুষ্ক রাখা কঠিন হইল; সকলে এক এক কম্বল ক্রয় করিয়াছিল তাহা আচ্ছাদনে রাত্রি অতিবাহিত হইল।"

শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী।

কাব্য ও তত্ত্ব

একজন প্রসিদ্ধ ফরাসী সাহিত্য-সমালোচক সেক্স্‌পীয়র ও মোলিয়েরের এই দুই জনের নাট্যপ্রতিভা তুলনা করিতে যাইয়া বলিয়াছেন যে, কাব্য-জগতের সর্ব্বত্র, তাহার আদি সৃষ্টিকাল হইতে আজ পর্য্যন্ত, এস্‌খিল্‌ সোফোকল্‌ ইউরিপিদ হইতে কর্ণেই রাসীন, সকল কবিশ্রেষ্ঠদিগের মধ্যে, তাঁহাদের সৃষ্টি যতই মহৎ হউক না কেন, সর্ব্বদাই আমরা একটা দোষের অবশেষ লক্ষ্য করি—তাহা হইতেছে একটা বর্ব্বরতার আভাস। প্রবৃত্তির স্থূল প্রাকৃতজনসুলভ লীলাভঙ্গীটি তাঁহারা অতিমাত্র করিয়া দেখিয়াছেন, সর্ব্বত্রই বলাৎকার, রক্তারক্তি, পাশবিক উপায়ে প্রবৃত্তির খেলা। একমাত্র মোলিয়ের তাঁহার বিশেষত্ব ও মহত্ত্ব দেখাইয়াছেন এইখানে যে, প্রবৃত্তির খেলা চিত্রিত করিবার জন্য তিনি এই সব স্থূল বাহ্য উপকরণের সাহায্য গ্রহণ করেন নাই। মানুষকে দেখাইয়াছেন চিন্তা, ভাব, অনুভূতির চিত্র বিচিত্রতার মধ্য দিয়া, সকল খেলা চলিয়াছে অন্তরে। উচ্চ কথা না কহিয়া, কোলাহল না করিয়া, লম্ফঝম্প না দিয়াও যে হৃদয়ের কাহিনী যথাযথরূপে, এমন কি গভীরতর ভাবেই, ব্যক্ত করা যায় তাহার দৃষ্টান্ত মোলিয়ের। মোলিয়ের দেখাইয়াছেন নিছক চরিত্র, নিছক মনস্তত্ত্ব। প্রবৃত্তির যে আবিল আবেগময় স্থূল বিকাশ, তাহার উপর তিনি ততখানি জোর দেওয়া প্রয়োজন বা যুক্তিযুক্ত মনে করেন নাই। সমালোচক তাই সেক্স্‌পীয়র সৃষ্ট তাইমন ও মোলিয়েরের সৃষ্ট আলসেস্ত এই দুইটি চরিত্র উদাহরণস্বরূপ লইয়া বলিতেছেন, সেক্স্‌পীয়র কি উগ্র বন্যপশুবৎ মানুষ সৃষ্টি করিয়াছেন, মোলিয়েরে শরীরগত সে উচ্ছৃঙ্খলতা, ইন্দ্রিয়গত সে উন্মত্ততা নাই; কিন্তু তাইমন অপেক্ষা আলসেস্তেই কি মানববিদ্বেষীর গভীরতর তত্ত্ব-চিত্র ফুটিয়া উঠে নাই?

সেক্স্‌পীয়র ও মোলিয়েরের যে দুইটি চরিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন তাহা তুলনা করিয়া, কাহার স্থান নিম্নে, কাহার স্থান উচ্চে ইহা নির্দ্ধারণ করা এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নয়। আমাদের বিচার্য্য সমালোচকের মূল বক্তব্যটি। বর্ত্তমান কালে কাব্যসৃষ্টি সম্বন্ধে এইরূপ একটা ভেদ নির্দ্দেশ করিবার চেষ্টা হইতেছে যে তত্ত্ববোধ আর ইন্দ্রিয়জ বিকার এই দুইটি জিনিস সম্পূর্ণ বিভিন্ন ও পরস্পর বিরোধী। সূত্রস্বরূপ তাই দেওয়া হইতেছে, কবি সৃষ্টি করিবেন তত্ত্ব, ইন্দ্রিয়-উত্তেজনা, স্থূল বিকার কাব্যের বস্তু হইতে পারে না, কাব্যে তাহার আর স্থান নাই। কারণ প্রথমতঃ কবির উদ্দেশ্য মানুষের গভীরতম কথা যাহা, যাহা অন্তরের বস্তু, যাহা আত্মার অনুভূতি, তাহাই প্রকাশিত করা। স্থূল ইন্দ্রিয়ের স্থূল বিক্ষোভ মানুষের অন্তরের, আত্মার কথা নয়। দ্বিতীয়তঃ মানুষ আর পূর্ব্বের মত অতিমাত্র ইন্দ্রিয়-পরিচর্য্যা-নিরত নহে। তাহার মধ্যে উচ্চতর বৃত্তি ফুটিয়া উঠিয়াছে, নব নব অভিজ্ঞতায় সে পূর্ণতর হইতেছে। কালিদাস, সেক্স্‌পীয়র এ সকলের বার্ত্তা কিছুই জানিতেন না, তাই ইঁহাদের ছায়া তাঁহাদিগকে স্পর্শ করিতে পারে নাই। মানুষ এখন জগৎকে জীবনকে দেখিতেছে এক নূতন দৃষ্টি দিয়া, সভ্যতা ভাবুকতার জ্ঞানবিজ্ঞানদীপ্ত বুদ্ধি, পরিশুদ্ধ বৃত্তির চক্ষে। এখনকার কবিও তাই সেক্স্‌পীয়র ও কালিদাসের মত ইন্দ্রিয়গত অনুভূতিকে প্রকাণ্ড করিয়া কাব্য সৃষ্টি করিবেন না। তৃতীয়তঃ কাব্যের মহত্ত্বই এইখানে। যে কবি প্রাকৃতজনের অনুভূতি ও ভঙ্গী লইয়া কাব্য রচনা করেন, তাঁহার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর কবি তিনিই যিনি কবি ও মহাপুরুষ একাধারে, যিনি মানুষকে শুধু আনন্দ দিয়াই নিশ্চিন্ত নহেন কিন্তু তাহাকে মহীয়ান দেবতুল্য করিয়া তুলিতে চাহেন।

কাব্যের বিষয় তত্ত্ব, এই কথাটি আমরা সর্ব্বপ্রথমে বুঝিতে চেষ্টা করিব। তত্ত্ব কি? বস্তুর যাহা সনাতন গুণ, যাহা আশ্রয় করিয়া বস্তু বস্তু হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে, সেই আদিপ্রাণ, সেই মূল

সত্যই উহার তত্ত্ব। বস্তুর যে স্থূল বিকার তাহা তাহার তত্ত্ব নহে। স্থূল বিকারের কারণ যাহা, যে গুণসমাবেশ হইতে এই ইন্দ্রিয়গত বিক্ষোভ উদ্ভূত তাহাই হইতেছে তত্ত্ব। যেমন প্রেমের তত্ত্ব হইতেছে ভালবাসা। প্রেমের স্থূল বিকার হইতেছে ইন্দ্রিয়জ শরীরজ সেই স্বেদ পুলক ইত্যাদি—স্থূলতমটি আর আমরা উল্লেখ করিলাম না—এ সকল তত্ত্ববস্তু নহে। অতএব বলা হইতেছে যে কবি স্বেদ পুলক ইত্যাদির কথা না বলিয়া দেখাইবেন হৃদয়গত বৃত্তিটির গতি, শুধু ভালবাসার প্রকরণ। শুধু ইহাই নয় প্রেমকে শরীরের দিকে টানিয়া না আনিয়া, উহাকে সমুচ্চে উত্তোলন করিয়া ধরিব, মিলাইব বিশুদ্ধের, অনন্তের ভগবানের সহিত। বিদ্যাপতির মত আর বলিব না—

পীঠ আলিঙ্গনে কত সুখ পাব।
পানিক পিয়াস দুধে কিয়ে যাব॥

এখন বলিব রবীন্দ্রনাথের কথায়—

আমার অতীত তুমি যেথা, সেইখানে
অন্তরাত্মা ধায় নিত্য অনন্তের টানে—

অথবা ব্রাউনিংএর মত শান্ত উদাত্ত তত্ত্বজ্ঞানে পরিপ্লুত হইয়া মানবজাতিকে সান্ত্বনা দিব—

God's in His Heaven
All's well with His world.

কিন্তু সেক্সপীয়রের মত ইন্দ্রিয়-জগতের দাস হইয়া প্রাকৃতজনের ক্ষুব্ধ চিত্ত লইয়া বলিব না—

And in this harsh world draw
thy breath in pain—

তত্ত্ব শুধু তত্ত্ব হিসাবেই বিশুদ্ধ সত্য। ভূতবস্তু, স্থূল বিকাশ, ইন্দ্রিয় বিক্ষোভের মধ্যে উহা পরিস্ফুট নয়। অতএব কাব্যে উভয়ের যুগপৎ স্থান হইতে পারে না। সর্ব্বপ্রথমে আমরা এই সিদ্ধান্তের বিচার করিব। বস্তুর অতিমাত্র যে বাহ্যরূপ, তত্ত্ব তাহার অতীত জিনিস, আত্মা যে দেহকে অতিক্রম করিয়া রহিয়াছে এ কথা সকলেই স্বীকার করিবে, আমরাও অস্বীকার করিব না। কিন্তু এই আত্মাকে এই তত্ত্বকে উপলব্ধি করিবার ও প্রকাশিত করিবার নানা ভঙ্গী আছে। মানুষে মানুষে, সাধকে সাধকে, যে পার্থক্য তাহা অনুভূতির মূল বস্তুটি লইয়া নয়, তাহা এই অনুভূতিরই প্রকার লইয়া। কবি ও দার্শনিকে যে প্রভেদ তাহাও এই ভঙ্গীরই বিভিন্নতা। কবিও তত্ত্বকে দেখেন, দার্শনিকও তত্ত্বকে দেখেন—কিন্তু এক দৃষ্টি দিয়া নহে। দার্শনিক তত্ত্বকে দেখেন বিচার বুদ্ধির সাহায্যে, চিন্তার দ্বারা বিশ্লেষণ করিয়া তিনি তত্ত্বকে বোধগম্য করিতে চেষ্টা করেন। তাঁহার কাছে ঘটনা বা স্থূলবস্তুর নিজস্ব মূল্য কিছু নাই, উহার অন্তরালে যে তথ্য লুকায়িত তাহাকেই তিনি ধরিয়া দেখান—তিনি চাহেন শুধু চিন্তা-জগতের কথা। বাস্তবিকপক্ষে তত্ত্ব অর্থে আমরা ধরিয়া লইয়াছি এই চিন্তা-জগতের কথা। তত্ত্ব যে উহা অপেক্ষাও গভীরতর জিনিস ইহা ভুলিয়া গিয়াছি। তাই যখন কবিকে বলি যে তিনি বিশ্লেষণমুখী বুদ্ধির সাহায্যে শুধু চিন্তা-জগতের কথা বলিবেন তখন ফলতঃ কবিকে দার্শনিকেরই কার্য্য করিতে বলিতেছি। কবির লক্ষ্য যে তত্ত্ব তাহা দার্শনিক তথ্য নহে, তাহা তর্কবুদ্ধি-প্রসূত নহে। কারণ তাঁহার উদ্দেশ্য তত্ত্বের ব্যাখ্যা দেওয়া নহে, তাঁহার উদ্দেশ্য তত্ত্বের সৃষ্টি। কবি যখন কাব্য রচনা করেন, তখন তিনি একটা কিছু প্রমাণিত করিতে অগ্রসর হন না। তিনি চাহেন শুধু মূর্ত্ত প্রকট করিয়া তুলিতে যাহা তাঁহার অন্তরের দৃষ্টিতে জাগরূক হইয়াছে। কবির দৃষ্টিতে যে বিশ্লেষণ নাই তাহা নয়, কিন্তু উহা তর্কবুদ্ধির বিশ্লেষণ নয়। সাক্ষাৎদৃষ্টির সহচর যে 'বিবেক'

তাহার দ্বারাই বস্তুসমূহের শতমুখী পার্থক্য, বৈচিত্র্যময় লীলা এক সহজ ঐশ্বর্য্যবলে তিনি ফুটাইয়া তুলেন। দার্শনিক সত্যকে দেখেন সঙ্কীর্ণ করিয়া, তাহার একটি মাত্র প্রকরণ, তাহার তাত্ত্বিকরূপ অর্থাৎ চিন্তার ক্ষেত্রে তাহার যেমন বিকাশ। কবি সত্যকে সৃষ্টি করেন একটি সমগ্রতায় পূর্ণ করিয়া। রবীন্দ্রনাথের 'রাজা' রূপক হিসাবেই যতখানি লিখিত হইয়াছে, কবিত্ব হিসাবে তাহার মূল্য তত কম। কারণ আধ্যাত্মিক তত্ত্বকে তিনি যে স্থূল দেহ দিয়া গড়িয়া তুলিতে চাহিয়াছেন, সে স্থূল দেহকে তিনি অবহেলাভরেই দেখিয়াছেন, তাহাকে লইয়াছেন শুধু অবান্তর অলঙ্কাররূপে,—তাই তত্ত্ব ও স্থূল বস্তু একই মহৎ সত্যের মধ্যে একীকৃত হইয়া উঠে নাই, উভয়ের মধ্যে রহিয়াছে এক কৃত্রিমতার সংযোগ। সমস্ত কাব্যেও তাই এই কৃত্রিমতার অসরলতার ছায়া। কিন্তু কালিদাসের কুমারসম্ভব আধ্যাত্মিক না আধিভৌতিক বস্তু লইয়া? উভয়কে বিযুক্ত করিয়া দেখিবে কে?

এইটুকু বিশেষ করিয়া হৃদয়ঙ্গম করিতে হইবে যে কবির চক্ষে স্থূল ও সূক্ষ্মের সমান মূল্য। সূক্ষ্মই আসল জিনিস, স্থূল শুধু সূক্ষ্মের অলঙ্কার, উপমান বা সাঙ্কেতিক চিহ্ন এরূপ নয়। সূক্ষ্ম ও স্থূল একই জিনিসের দুই বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিকাশ মাত্র। বৈদিক ঋষিগণের এ বিষয়ে যে গভীর অনুভূতি ছিল তাহা অতুলনীয়। তাঁহারা জ্ঞানের দেবতার নাম দিয়াছেন সূর্য্য, তপঃশক্তির নাম দিয়াছেন অগ্নি। কেন? ইহা শুধু তুলনা নয়, উদাহরণ বা কোন বিশেষ অর্থহীন সংজ্ঞা মাত্র নয়। শুধুই যদি সংজ্ঞা হইত তবে জ্ঞানের নাম অগ্নি, শক্তির নাম সূর্য্য হইতে কোন বাধা থাকিত না। ঋষিগণ কিন্তু দিব্য কবিদৃষ্টি দিয়া দেখিয়াছেন যে অতীন্দ্রিয়ে, তত্ত্বে যাহা জ্ঞান স্থূলে জাগতিক ক্ষেত্রে তাহাই সূর্য্য—একই বস্তু, উভয়ের আত্মার ধর্ম্ম হইতেছে প্রকাশ। অগ্নির যে গুণ তাপ, মূলতঃ তাহাই তপঃশক্তির ধর্ম্ম। সূর্য্যই জ্ঞান, অগ্নিই শক্তি—ইহা

শুধু রূপক নয়, ইহা ভাববিলাসীর কল্পনা নয়। কবির সহজ প্রেরণাই তাই হইতেছে তত্ত্বকে নিছক তত্ত্বরূপে দেখা নয়, কিন্তু তত্ত্বকে বিষয়ের বস্তুর মধ্যে ধরিয়া শরীরী করিয়া দেখা। সূক্ষ্ম জগতে ভাবের মধ্যে যাহা তত্ত্ব, স্থূলে ইন্দ্রিয়জগতে তাহাই বস্তু তাহাই ঘটনারাজী, তত্ত্বের জীবন্ত বিগ্রহ হইতেছে স্থূল—একটি সৃষ্টি করিতে গিয়া আর একটি সহজেই উহার সহিত সৃষ্ট হইয়া পড়ে। তাই কালিদাসের কুমারসম্ভব তত্ত্বকথারূপে লিখিত না হইলেও, এত সহজেই উহার তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা দেওয়া সম্ভব হইয়াছে। তাই পরমতত্ত্ববাদী,—আধ্যাত্মিকতাপরিপ্লুত বৈদিক ঋষিগণের মুখ হইতে তত্ত্বকথা বলিতে যাইয়া সহজেই বাহির হইয়া পড়ে—

যত্র নারী অপচ্যবং উপচ্যবং চ শিক্ষতে—

তত্ত্ব ও বস্তু, অত্র ও অমুত্রের মধ্যে যে অঙ্গাঙ্গী সামঞ্জস্য যে নিগূঢ় একাত্মতা কবির অখণ্ড দৃষ্টিতে তাহাই ফুটিয়া বাহির হয়। কবির ইহা স্বাভাবিক ধর্ম্ম। তারপর, আমরা বলিয়াছি কবির কার্য্য মুখ্যতঃ বিশ্লেষণ নয়, তাঁহার কার্য্য সংশ্লেষণ অথবা সৃজন। এই সৃষ্টির প্রকৃতিই হইতেছে চলন্ত জীবন্ত রক্তমাংসের প্রতিমা। শুধু যাহা ভাবে, শুধু যাহা চিন্তায় তাহা হিরণ্যগর্ভের কল্পনা মাত্র, বিরাটের মধ্যে স্থূল পর্য্যন্ত যাহা প্রসারিত হয় নাই তাহা সৃষ্টি নয়। ইন্দ্রিয়স্পর্শের দ্বারা তত্ত্বকে শরীরী করিয়া তুলাই সৃষ্টি। ভগবানের সৃষ্টি সম্বন্ধে এ কথা যেমন প্রযোজ্য, কবির সৃষ্টি সম্বন্ধেও তেমনি।

এখন আর একটি কথা বুঝিতে হইবে—তত্ত্ব নানা প্রকার। ধ্যান-জগতের চিন্তা-জগতের যেমন তত্ত্ব আছে, হৃদয়-জগতের, বাসনা-জগতের, ইন্দ্রিয়জগতের, কর্ম্ম-জগতের প্রত্যেক জগতেরই তত্ত্ব আছে। ইহারা বিশেষ বিশেষ জগৎ, প্রত্যেকরই এক একটি ধর্ম্ম, এক একটি বিশেষত্ব আছে। যখন বলা হয় কবি দেখাইবেন কেবল তত্ত্ব, বস্তুতঃ তখন কবিকে আজ্ঞা করা হয়, যে ধ্যান-জগতের চিন্তা-জগতের প্রতীতি দিয়াই তিনি অন্যান্য জগৎকে বোধ করিবেন, বিচারবৃত্তি,

পরমার্থ অনুভূতির যে ছাঁচ তাহার মধ্যেই আর আর জগতের তত্ত্বকে ঢালিয়া দেখাইতে হইবে। ইহা দার্শনিকের এবং সাধুপুরুষের কার্য্য হইতে পারে কিন্তু ইহা কবির কার্য্য নয়। চিন্তা-জগতের তত্ত্বকে যেমন চিন্তার গতির মধ্য দিয়া তাহার বিশ্লেষণ করিয়া ফুটাইয়া তুলিতে হয়, ইন্দ্রিয়-জগতের তত্ত্বকে ইন্দ্রিয়ের বিক্ষোভের মধ্য দিয়াই, কর্ম্ম-জগতের তত্ত্বকে কর্ম্মের মধ্য দিয়াই প্রকটিত করা যায়। গীতি কবিতার ভাবোচ্ছ্বাসের সাহায্যেই প্রধানতঃ আমরা তত্ত্বকথা ব্যক্ত করি, নাটকের প্রধান কথা কিন্তু 'নটন', অঙ্গ-সঞ্চালন, কর্ম্মের মধ্য দিয়াই এখানে তত্ত্ব ফুটাইয়া তুলি।

মানুষের কর্ম্মের মধ্যে, ইন্দ্রিয়খেলার মধ্যে একটা সত্য আছে—তাহাও তত্ত্ব। উহা যে মানুষের আত্মার কথা, অন্তরতম কথা নয় এমন নহে। রোমিও-জুলিয়েটে যে যুবজনোচিত প্রেমবহ্নি, আন্তনী ক্লিওপাট্রায় যে তীব্র কামবহ্নি তাহা কি সত্য বস্তু নয়, আত্মার বিচিত্র লীলার অঙ্গীভূত নয়? তাহা কি সনাতন সত্যই নয়? বলা হইয়া থাকে, বর্ত্তমান কালে সভ্যতার যুগে রোমিও-জুলিয়েটে আন্তনী ক্লিওপাট্রার স্থান নাই—তাহাদের ভাবে আর কেহ পরিচালিত হয় না, মার্জ্জিতবৃত্তি মানুষ সে সকলের উচ্চে উঠিয়াছে, তাহারা সনাতন সত্য নহে। প্রথমতঃ এ কথাটি আমরা সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি না। আমরা ত দেখি যুবকযুবতী যে ভাবে চিরকাল প্রেম করিয়া আসিয়াছে, আজও যে ভাবে করিতেছে, সকল বাহ্য সভ্যতা ভব্যতার অন্তরালে রহিয়াছে সেই পরিচিত পুরাতন রোমিও জুলিয়েট। তবে রোমিও জুলিয়েটে সে ভাব যেমন তীব্র, তেমন সুস্পষ্ট যেমন স্থূলস্পর্শী ঠিক তেমন নয়, কিন্তু মূলতঃ উভয় একই জিনিষ। উভয়ের মধ্যে এই পার্থক্যটি বরং থাকিবার কথা। কারণ কবি বাস্তবের নকল করিয়া চিত্র অঙ্কিত করেন না। বাস্তবের মধ্যে যে সত্য অস্ফুট, মৃদুগতি, অলক্ষ্যচারী তাহাকে পূর্ণ, স্পষ্ট, জাজ্বল্যমান করিয়া দেখানই কবিত্ব। প্রকৃতপক্ষে সনাতন অর্থ এরূপ নয় চির-

কাল যাহাকে বাস্তবে পূর্ণ প্রকটিত দেখিতে পাই। সনাতন অর্থ যাহা রহিয়াছে চিরকাল কিন্তু অন্তরালে, বাহিরে তাহার পূর্ণ প্রকাশ কখন হয়, কখন হয় না, কিন্তু প্রায়শঃই তাহার একটা ছায়া প্রসারিত থাকে। কবির, ঋষির প্রয়োজন এই গুহাগত গুপ্তকে টানিয়া গোচর করিয়া ধরা। আর এমনও যদি স্বীকার করা যায় যে মানুষ একদিন ইন্দ্রিয়-বিক্ষোভ ছাড়াইয়া উঠিবে, আন্তনী-ক্লিওপাট্রার ছায়াও যে দিন জগতে পড়িবে না, তবুও সেদিন সেক্স্‌পীয়রের মূল্য যে থাকিবে না এমন নয়, তিনি যে তত্ত্ব যে সত্য দেখিযাছেন তাহা অসত্য হইয়া পড়িবে না। সেক্স্‌পীয়র পড়িয়া সে দিন যে কেহ আনন্দ পাইবে না তাহা নয়। দেবভাবে সিদ্ধ প্রাচীন ঋষিগণ যে কাব্য রচনা করিয়া গিয়াছেন আমরা তাহার ত কবিত্বের রস গ্রহণ করিতে পারি, অথচ আমরা দেবজন্ম কিছু পাইয়াছি কি? সেই রকম ইন্দ্রিয়ের আবিলতা হইতে মুক্ত হইয়া আমরা সেই আবিলতা-মূলক কাব্যের রস গ্রহণ করিতে যে পারিব না এমন নহে। বলা যাইতে পারে, বেদ উপনিষদের কবিত্ব যে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি বা তদ্রূপ কিছু সৃষ্টি করিতে পারি, তাহার কারণ বর্তমানের অশুদ্ধ অসিদ্ধ অবস্থাতেও আমাদের মধ্যে এমন একটি বৃত্তি বিকসিত আছে যাহার সাহায্যে সেই দেবলোকের সহিত আমরা সংশ্লিষ্ট। উত্তরে আমরা জিজ্ঞাসা করি, ইন্দ্রিয়-বিক্ষোভের অতীত হইলেই যে ইহা হইতে সম্পূর্ণ বিমুক্ত হইয়া পড়িব তাহারই বা নিশ্চয়তা কি? আর সব বন্ধন ছিন্ন হইলেও অন্ততঃপক্ষে সৌন্দর্য্যবোধ, রসবোধের বন্ধন যে থাকিবে না তাহা কে জোর করিয়া বলিবে?

মানবজাতির ক্রমোন্নতি বলিয়া যে জিনিসটি বর্ত্তমান যুগের কল্পনাকে মুগ্ধ করিয়া ফেলিয়াছে তাহার অর্থ এরূপ নয় যে মানুষ যতই উর্দ্ধ হইতে উর্দ্ধস্তরে উঠিতে থাকিবে, নিম্নস্তরের বৃত্তিগুলি ততই সে নিঃশেষে ঝাড়িয়া ফেলিবে। মানুষ যদি দেবতা হয় তবে তাহার মধ্যে মানুষভাব এমন কি পশুভাবেরও যে স্থান হইবে না তাহা

নয়। দেবচরিত্র আমরা গঠন করিতে চাই যে ভব্যতা শ্লীলতা ইন্দ্রিয়-বৃত্তির গতিমান্দ্যদ্বারা বাস্তবে তাহা কতদূর পরিণত হইবে আমরা নিঃসন্দেহে বলিতে পারি না। আমরা মহাপুরুষের যে সংজ্ঞা দিয়াছি যিনি অন্তরে বাহিরে শান্ত ধীর, সকল উগ্রতা তীক্ষ্ণতা বিহীন, ইন্দ্রিয়-খেলার অতীত, তিনিই শুধু মহাপুরুষ আর কেহ নয়—এ কথাও দ্বিধা-শূন্য হইয়া কে বলিতে সাহস করিবে?

কিন্তু সে যাহাই হউক কবিত্ববোধ, কাব্যসৃষ্টির সহিত এ সকলের কোন সম্বন্ধ নাই। মানুষ পশু হউক, দেবতা হউক, জগৎ সেণ্ট ফ্রান্সিসে ভরিয়া যাউক অথবা হূনদিগের আবাসভূমি হউক কবির তহাতে কিছু ক্ষতিবৃদ্ধি নাই। মানুষ নিরক্ষর অসভ্য বর্ব্বর, প্রকৃতি-রই কোলের সন্তান হউক, অথবা সে জ্ঞানে বিজ্ঞানে পাণ্ডিত্যে মহীয়ান হউক, কবি তাহা দেখেন না। সর্ব্বত্র সকলের মধ্যে কি গম্ভীর সনাতন সত্য, কি পরম সৌন্দর্য্য ঐশ্বরিকশক্তিবৎ সকলকে চালাইয়া লইয়াছে তাহাকে পরিস্ফুট করিয়া দেখানই কবির উদ্দেশ্য। কবির মধ্যে বর্ত্তমান যুগে আমরা চাহিতেছি culture অর্থাৎ সম্যক্ বিচারবুদ্ধি। কিন্তু যে culture শুধু চায় বিদ্যা অথবা পাণ্ডিত্য, ডারুইনের 'তত্ত্ব'টি জানাই যাহার প্রধান অঙ্গ, সে culture ব্যতি-রেকে কবির মহত্ব যে কিছু হীন হইয়া পড়ে তাহা নয়। দর্শন বিজ্ঞানে পারদর্শিতা কবিত্বের উৎস নয়। কাব্যজগতের এ সকল অবান্তর কথা। কবি যে তত্ত্ব দেখাইতে চাহেন সেজন্য এ সকল সাহায্য লইতেও পারেন, নাও পারেন। ভর্জ্জিল গ্রীককর্ত্তৃক ট্রয়নগর অধিকার যে ভাবে বিবৃত করিয়াছেন তাহা হইতে এমন প্রমাণিত হয় না বটে যে তিনি সমরনীতিতে সুপণ্ডিত ছিলেন, কিন্তু সেই জন্য 'এনিদ' কাব্যের কবিত্বের কিছু অপচয় হইয়াছে কি? দান্তের স্বর্গ নরক এঞ্জেল শয়তান প্রভৃতি সম্বন্ধে কি অদ্ভুত ধারণা ছিল, কিন্তু জ্ঞানালোকদীপ্ত আধুনিক জগতে কয়খানি 'দিভিনা কমেদিয়া' সৃষ্ট হইয়াছে? বস্তুতঃ কি moral value কি intellectual

value দ্বারা কবিত্বের মহত্ত্ব স্থিরীকৃত হয় না। কারণ কাব্যের তত্ত্ব intellectual তত্ত্বও নয়, moral তত্ত্বও নয়। কাব্যের তত্ত্ব হইতেছে বস্তুর গুণ অথবা character, বুদ্ধির সত্য অসত্য, নীতিবোধের ভাল মন্দ অপেক্ষা গভীরতর পদার্থ হইতেছে, বস্তুর প্রকৃতি বা স্বভাব, প্রাণে character এ যাহা অনুস্যূত হইয়া গিয়াছে। মূলে এই স্বভাবজ গুণের যে স্থূল বিক্ষোভ তাহা আত্মারই মূর্ত্ত প্রকাশ। আমরা যাহাকে passion বলিয়া ভ্রুকুঞ্চিত করি তাহা আর কিছুই নয়, তাহা আত্মার গুণের পূর্ণ জাগ্রত জীবন্ত দ্যোতনা। তাই যাহাকে ইন্দ্রিয়গত, এই passion করিয়া তুলিতে না পারি তাহা কাব্যের বিষয় হইতে পারে না। আর যাহাকেই passionএ পরিণত করিতে পারি, তাহাই যথার্থ সৃষ্টি, তাহাই যথার্থ কবিত্ব।

কবির লক্ষ্য সেই তত্ত্ব যাহা শুধু চিন্তাগ্রাহ্য ধ্যানগত নহে কিন্তু যাহা আবার শক্তিপূর্ণ, যাহা বস্তুসৃজনক্ষম—বৈদিক ঋষিগণের ভাষায়, যাহা যুগপৎ সত্য ও ঋত। তত্ত্বকে যখন ঋতময় করিয়া অনুভব করি তখনই কেবল তাহার কবিত্বরসের সন্ধান পাই। বস্তুর মধ্যে যন্ত্রীবৎ সমারূঢ় যে নৈসর্গিক শক্তি, যে মৌলিক প্রেরণা, তাহার বলেই কবি প্রকৃত তত্ত্ব সৃষ্টি করেন, সে তত্ত্ব যেখানেই থাকুক না কেন, ধর্ম্মে অধর্ম্মে, পাপে পুণ্যে, জ্ঞানে অজ্ঞানে। তত্ত্বকে যিনি এইভাবে দেখেন তাঁহাকে আর শুধু দার্শনিকের মত বিশ্লেষণ করিয়া তত্ত্বকে বুঝাইতে হয় না—তত্ত্বের এত স্থূল মূর্ত্তি দিয়া, কর্ম্মজগতে তাহার লীলাভঙ্গী অঙ্কিত করিয়াই তত্ত্বের সকল রহস্য অতি সহজে গোচর করিয়া প্রকটিত করেন। অন্তরের খেলাকে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে দেখাইতে হইলে বাহিরের খেলাকে যে মৃদুতর করিয়া আনিতেই হইবে এমন বাধ্যবাধকতা নাই। এ বাধ্যবাধকতা তখনই আসে যখন ঋষি কবির ঋতপূর্ণ দৃষ্টির পরিবর্ত্তে দার্শনিকের বিচারবুদ্ধির আশ্রয় গ্রহণ করি। বালজাকের (Balzac) ন্যায় মনস্তত্ত্ববিৎ কয়জন ঔপন্যাসিক আছে? কিন্তু দেখ তাঁহার Pere Gorist

মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণের সঙ্গে সঙ্গে কি স্থাণু পাষাণে খোদিত বিরাট মূর্ত্তি তিনি গড়িয়া তুলিয়াছেন। শুধু ভাবজগতে মনোবিজ্ঞানের কারু-কার্য্য চাতুর্য্য, চমৎকারিত্বই তাহাতে নাই, কিন্তু একটা বাস্তব, জীবন্ত, রক্তমাংসের শরীরই তিনি সৃজন করিয়াছেন। আর সেক্সপীয়রের হ্যাম্‌লেট্—তাহাতে যে সূক্ষ্ম মনস্তত্ত্বের বিশ্লেষণ রহিয়াছে, বুদ্ধির ভাষায় চুল চুল করিয়া কে তাহা নিঃশেষ করিয়া দেখাইবে? অথচ, কিম্বা সেই জন্যই, কি জ্বলন্ত জীবন্ত তত্ত্ব এই হ্যাম্‌লেট্—তাহার প্রত্যেক বাক্য, প্রত্যেক অঙ্গভঙ্গীরই মধ্য দিয়া কি গভীর সত্য, কি তত্ত্ব যেন ফাটিয়া বাহির হইতেছে।

প্রকৃতপক্ষে বর্ত্তমানকালে আমরা ভুলিয়া গিয়াছি যে কবিত্বের প্রধান কথা হইতেছে শক্তি, সত্যের মৌলিক শক্তি, সত্য অনুভূতির সহজ অদম্য প্রেরণা। কবিতা সূক্ষ্ম হইতে পারে, গভীর হইতে পারে, কিন্তু সেই সঙ্গে এবং প্রধানতঃই powerful হওয়া প্রয়োজন একথাটি আমরা আর কাহার মুখে বড় শুনিতে পাই নাই। বাল্মীকি হোমরকে আমরা নাম দিয়াছি primitive poets—অর্থাৎ আদিম প্রকৃতির। প্রকৃতপক্ষে তাঁহারা primitive ছিলেন না, তাঁহারা ছিলেন primary, আদিম প্রকৃতির নয়, আদি প্রকৃতির। তাঁহা-দের কবিত্বে উৎস ছিল একটা elemental force যাহার বলে সত্যকে বিদীর্ণ করিয়া তাহার অন্তরের রহস্য মহিমামণ্ডিত করিয়া স্থূলে প্রকটিত করিতে পারিয়াছেন। কবিত্বের এই মূল সত্যশক্তি—বেদ যাহার নাম দিয়াছেন 'কবিক্রতু'—সৃষ্টির ইহাই একমাত্র প্রসূতি। কিন্তু তৎপরিবর্ত্তে আমরা প্রতিষ্ঠা করিতেছি ভাবগত শোভনতা, চিন্তাবৃত্তির কারুকার্য্য। ফলে কাব্যজগতে বর্ত্তমানকালে সর্ব্বত্র নিপুণ কারিকর পাইতেছি, কিন্তু কোথাও সেই ঈশ্বরভাব পরিপ্লুত স্রষ্টার সাক্ষাৎ পাই না।

উপনিষদের কবি নিছক তত্ত্বকথা লইয়াই কাব্যসৃষ্টি করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহারা আধুনিক বিশ্লেষণপরায়ণ মনস্তত্ত্ববিদগণের মত এই

তত্ত্বকথার ব্যাখ্যা দেন নাই। তাঁহারা সেক্স্‌পীয়র অথবা কালিদাসের মতনই 'কবিক্রতু', দৃষ্টির তপঃশক্তি, তীব্র passion এর দ্বারাই অনুপ্রাণিত হইয়া সৃষ্টি করিয়াছেন। তাই তাঁহাদের সৃষ্টি এত অগ্নিময়, এত স্ফুট, এত বস্তুতন্ত্র। সেক্স্‌পীয়র ও উপনিষদের ঋষিগণের মধ্যে আর যে দিক হইতে যতই পার্থক্য থাকুক না কেন, উভয়ের কবিত্ব-প্রতিভার উৎস এক স্থান হইতে, তাহাদের মধ্যে প্রকৃতিগত বৈষম্য নাই। পার্থক্য যাহা তাহা বিষয়ের, আখ্যানবস্তুর মধ্যে, কিন্তু যে কবিত্বপ্রেরণা উভয়কে পরিচালিত করিয়াছে তাহা একই প্রকার। ঋষিগণ দেখাইয়াছেন আধ্যাত্ম-তত্ত্ব, সেক্স্‌পীয়র দেখাইয়াছেন ইন্দ্রিয়-তত্ত্ব—উভয়ই তত্ত্ব, কিন্তু কোনটিই দার্শনিক তত্ত্ব নয়। তাই সেক্স্‌পীয়র যখন বলিতেছেন

And in this harsh world draw thy breath in pain—

আর উপনিষদ যখন বলিতেছেন

ক্ষুরস্য ধারা ইব নিশিতা দুরত্যয়া

তখন চিন্তাগত না হউক কিন্তু কবিত্বগত একটা গভীর ঐক্যই অনুভব করি।

শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত।

সাধ

(১)

আজ্‌কে মোরে নেওগো আবার
তোমার নন্দনে,
তুলবো কুসুম, গাঁথবো মালা,
বড় সাধ মনে ;
নানান্ রংয়ের নানান্ ফুল
কদম্ব মালতী বকুল,
আঁচল ভরে তুলবো, তোমায়
ভাব্‌বো আনমনে
আজ্‌কে মোরে নেওগো বঁধু
তোমার নন্দনে।

(২)

কতবার না ডাকলে আমায়,
কতবার না জাগলে হিয়ায়
আমি, কাণ দিনু কি মন দিনু তায়!
অলস ভরে
নিদ্রাঘোরে
উঠলেম না আর
শয্যা ছেড়ে
আমার, ভাঙ্গা ঘরে, উঁকি মেরে
ফিরলে কোন বনে?
আজ্‌কে মোরে নেওগো সখা
তোমার নন্দনে।

(৩)

আমার, ঘরের কোণে যে ক'টা ফুল
ফুটে ছিল সখা!
জান্‌তে তুমি দেখাওনি তো
জান্‌তে তুমি একা
বাসি ফুলে মালা গেঁথে
দিতে চাই গো তোমার হাতে
তা ও হয় না গাঁথা
ছিঁড়্‌ছে সূতা,
হেলায় অযতনে
আজ্‌কে মোরে নেওগো বঁধু!
তোমার নন্দনে।

(৪)

সেথা, তুলবো কুসুম ভ'রে আঁচল
দেখ্‌তে দেখ্‌তে হব পাগল;
রূপের রাশি
ফুলের হাসি,
মন ভুলানো শুনবো বাঁশী,
লহর 'পরে লহর তুলে
নাচ্‌বে ফুলের ঢেউ
আমি, একলা বসে গাঁথবো মালা
দেখ্‌বে না তো কেউ;
তুমি, আড়াল হ'তে
জাগবে হেসে
দু'লিয়ে ফুলের বন

আমি, করবো বুকে, মনের সুখে
বুক-জুড়ান ধন!
তোমার, মুখের পানে রব চেয়ে,
পড়বে ধারা চক্ষু বেয়ে;
আপনা ভুলে ছুটে' লুটে'
পড়বো চরণে
চুমোর পরে আঁকবো চুমো
ও চাঁদ বয়ানে!

শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র সেন।

তুমি।

কল্পনা করিতে চাই ধ্যানের মাঝারে,
তোমার মুরতিখানি সদা মনে পড়ে;
সেই সে প্রফুল্ল মুখ সেই মৃদু হাসি
কেবলি প্রাণের মাঝে উঠিতেছে ভাসি।
আকুল আবেগ ভরে যদি গাহি গান,
তোমারি বন্দনা সে যে গাহে মোর প্রাণ;
কখন বিরলে বসি ভাবি কিছু যদি;
মনে পড়ে সেই তব মধুমাখা স্মৃতি।
কহি যদি কোন কথা কাহারে কখন,
সে শুধু তোমারি কথা চিত্ত-বিনোদন।
থাকে যদি কোন দুঃখ বিরহ তোমার,
আর কোন ব্যথা নাই বেদনা আমার।
যদি থাকে জীবনের কোন সুখ আশা,
সে শুধু মিলন তব তব ভালবাসা।

শ্রীকানাই দেবশর্ম্মা।

বিশ্ব-সেবায় বিদ্যুৎ

বিদ্যুতের যথার্থ স্বরূপ কি তাহা বৈজ্ঞানিকেরা অদ্যাবধি অবগত নহেন। তাঁহারা বলেন যে, ইহার শক্তি ও কার্য্য দেখিয়া আমরা ইহার অস্তিত্ব স্বীকার করিতে বাধ্য। অধিকাংশ আধুনিক বৈজ্ঞানিকের মতে বিদ্যুৎ হচ্ছে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডব্যাপী "ঈথার" নামক কাল্পনিক পদার্থবিশেষের কম্পন। আমরা এই সকল কূট-তত্ত্বের ভিতর প্রবেশ করিবার অধিকারী নহি। সুতরাং আমাদের স্থূল দৃষ্টির সমক্ষে বিদ্যুৎ ম্যালেরিয়ার পেটেণ্ট ঔষধের ন্যায় "ফলেন পরিচিয়তে" —"ব্যবহারেণ জ্ঞাতব্যম্।"

আজ পঁয়ত্রিশ বৎসর হইল বিলাতের "পঞ্চ্" নামক ব্যঙ্গ-পত্রে একটি চিত্র প্রকাশিত হইয়াছিল। এই চিত্রে দুইজন মুকুটধারী পুরুষ —বাষ্পরাজ (King Steam) ও অঙ্গাররাজ (King Coal)— ঠেলাগাড়ীতে শয়ান "Storage"-মাইপোষ হইতে দুগ্ধপানরত শিশু-বিদ্যুতের প্রতি ভয়চকিতনেত্রে দৃষ্টিপাত করিয়া ইহার ভবিষ্যৎ অতি-বৃদ্ধির আশঙ্কা করিয়া পরস্পরে কাণাকাণি করিতেছে। বর্ত্তমানে এই শিশু যে কি পর্য্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং বিশ্বের কত দিকে কত কাজ করিতেছে তৎসম্বন্ধে নারায়ণের পাঠকদিগের নিকট সংক্ষেপে যৎকিঞ্চিত বিবৃত করাই এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

বৈজ্ঞানিকদিগের সম্মোহন মন্ত্রে মুগ্ধ হইয়া বিদ্যুৎ যে বহুকাল হইতে দেশদেশান্তরে মানবের দৌত্যকার্য্যে নিযুক্ত আছে ইহা আমরা সকলেই জানি। এই বিশ্বদূতের গতিবিধির জন্য এতাবৎ ধাতুময় তারের পথ প্রস্তুত করিয়া দিতে হইত। বোধ হয় এই পথ এখন তাহার নিকট নিতান্ত পুরাতন ও বিরক্তিকর হইয়া দাঁড়াইয়াছে বলিয়া তিনি সম্প্রতি জলস্থলের ধাতব পথ প্রত্যাখ্যান করিয়া নিরালম্ব

ব্যোমপথে উড়িয়া দেশবিদেশে যাতায়াত আরম্ভ করিয়াছেন। মনে হয়, ভবিষ্যতে একদিন তারবিহীন টেলিগ্রাফ ও টেলিফোন চরম উৎকর্ষ লাভ করিয়া বায়স্কোপের সহযোগে বিশ্বমানবকে সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বদর্শী করিয়া তুলিবে। তখন মুনিঋষিদিগের যোগবল বিজ্ঞানের অনুকম্পায় সাধারণের সম্পত্তি হইয়া দাঁড়াইবে।

বস্তুতঃ সৃষ্টির প্রাক্কাল হইতে ব্যোমদেশই চপলার লীলাস্থল। কবি চিরদিন মেঘের ক্রোড়ে সৌদামিনীর ক্রিড়া বর্ণনা করিয়া আসিতেছেন। মেঘের সঙ্গে বিদ্যুতের কি সম্বন্ধ এবং সেখানে কোথা হইতে বিদ্যুৎ আসে, সেই তত্ত্ব নিরূপণ করিবার জন্য বৈজ্ঞানিকেরা দেখাইয়াছেন যে, ধাতব বা অন্যান্য কঠিন পদার্থের সঙ্গে বাষ্পকণা ও ধূলির সংঘর্ষে বিদ্যুতের উৎপত্তি হয়। ইঞ্জিনের বয়লার হইতে যখন বেগে বাষ্প বাহির হইতে থাকে তখন বিদ্যুতের সৃষ্টি হয়। ঐ বয়লারকে ইন্‌সুলেট্ করিলে, অর্থাৎ তাহা হইতে তড়িতের অদৃশ্য ভাবে অন্তর্দ্ধান নিবারণ করিতে পারিলে, তাহার গাত্র হইতে বিদ্যুতের স্ফুলিঙ্গ বা ইলেক্‌ট্রিক্ স্পার্ক পাওয়া যায়। ঝড়ের সময় ইজিপ্টের পিরামিডের সহিত বায়ুচালিত ধূলিরাশির সংঘর্ষে বিদ্যুতের সৃষ্টি হইতে দেখা গিয়াছে। বৈজ্ঞানিকগণ প্রমাণ করিয়াছেন যে, এতাদৃশ কারণ হইতেই আকাশে মেঘের দেশে বিদ্যুতের উৎপত্তি হয়।

গগনে বজ্রনির্ঘোষাদি বৈদ্যুতিক উপদ্রবের পর বায়ুর অক্সিজেন্ শোধিত ও বায়ুমণ্ডল অপেক্ষাকৃত ধূলিশূন্য হয়, ইহা অনেকেই লক্ষ্য করিয়াছেন। শিলাবৃষ্টি, ঘূর্ণিবায়ু ও জলস্তম্ভের সঙ্গে বিদ্যুতের সম্ভবতঃ ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে বলিয়া অনেক বিশেষজ্ঞ অনুমান করেন। যে দিন atmospheric electricity বা আকাশ-তড়িতের সকল হদিস্ মানুষের জ্ঞানগোচর হইবে সে দিন ঝড়বৃষ্টির আফিসের গণনা এখনকার অপেক্ষা অনেকটা সঠিক ও অভ্রান্ত হইয়া দাঁড়াইবে, এবং তখন বৈজ্ঞানিকেরা আকাশ-তড়িতের সাহায্যে অতিবৃষ্টি অনাবৃষ্টি

নিবারণ করিয়া ধরিত্রীকে ধনধান্যে পূর্ণ করিতে সক্ষম হইবেন বলিয়া আশা করা যায়।

উত্তর দক্ষিণ মেরুপ্রদেশে অরোরা নামে যে সুবর্ণের ঝালরের ন্যায় আকাশে দোদুল্যমান স্নিগ্ধোজ্জ্বল আলোকজাল দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা স্থির সৌদামিনীর এক বিচিত্র মূর্ত্তি ভিন্ন আর কিছুই নহে। পৃথিবী নিজ মেরুদণ্ডের উপর নিত্য অভিবেগে আবর্ত্তন করিতেছে বলিয়া বিশ্বব্যাপী তরল বায়ুমণ্ডল বিষুবরেখার নিকটে bulged বা স্ফীত হইয়া পড়িয়াছে; এবং তজ্জন্য উভয় মেরুপ্রদেশের বায়ু বিশেষ rarified বা পাতলা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এই পাতলা বায়ুস্তরের ভিতর দিয়া পৃথিবীর বিদ্যুৎ বিচ্ছুরিত হইয়া অরোরার সৃষ্টি করে। বৈজ্ঞানিক পরীক্ষাগারে মণ্ডলাকারে সজ্জিত কতকগুলি কাচের পাইপের মধ্যে পাতলা বা rarified বায়ু পুরিয়া তাহাদের ভিতর দিয়া বিদ্যুৎ চালিত করিলে ক্ষুদ্রাকারে কৃত্রিম অরোরা উৎপাদন করিতে পারা যায়। বন্ধনমুক্ত বিদ্যুৎ স্বাধীনভাবে স্বেচ্ছা-প্রণোদিত হইয়া জগতের কত স্থানে কত কাজ করিতেছে, কে তাহার গণনা করিবে?

কিন্তু মানুষ বর্ত্তমান যুগে এই উদ্দাম বিদ্যুদ্দামকে জ্ঞানবিজ্ঞানের বল্গার দ্বারা সংযত করিয়া তাহার দ্বারা অসংখ্য কলকারখানায় কুলি মজুরের কাজ করাইয়া লইতেছে। এখন ময়দার কলে, চট্‌কলে, ছাপাখানায়, এমন কি ধোবীখানায় পর্য্যন্ত চঞ্চলাকে মানুষের দাসীবৃত্তি করিতে হইতেছে। বিধাতাপুরুষ নিশ্চয়ই হতভাগিনীর কপালে তাহার জন্মদিনে লিখিয়া দিয়াছিলেন যে, কলিকালে তাহাকে এই সকল নীচ কাজ করিতে হইবে। কেবল তাহাই নহে; বিদ্যুৎ যে ট্রামকারে যোজিত হইয়া ঘোড়ার কাজ পর্য্যন্ত করিতেছে তাহা আমরা নিত্য প্রত্যক্ষ করিতেছি। ইলেক্‌ট্রিক রেলওয়ের সঙ্গে ভারতবর্ষে আমাদের এখনও সাক্ষাৎ পরিচয় হয় নাই। এককালে মনের দুঃখে কবি গাহিয়াছিলেন—"পর দীপমালা নগরে নগরে, তুমি যে

তিমিরে তুমি সে তিমিরে।” বোধ হয় তাঁহার আমলে উজ্জ্বল ইলেক্‌-ট্রিক লাইটের সৃষ্টি হয় নাই; এবং তাঁহার উষ্ণ মস্তিষ্ক শীতল করিবার জন্য তখন বৈদ্যুতিক পাখাও ছিল না।

অদ্যাবধি পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকগণ বিদ্যুৎকে বন্দুক কামানের ন্যায় শত্রুনিধনকারী অস্ত্রে পরিণত করিতে পারেন নাই। বোধ হয় মানব-সভ্যতা আরও উচ্চ ডিগ্রীতে উঠিলে ইহাও সম্ভব হইবে। সত্যযুগে স্বর্গের দেবগণ যখন বিদ্যুৎকে বিশ্ববিধ্বংসী কুলিশাস্ত্রে পরিণত করিতে পারিয়াছিলেন, তখন কলিযুগে মর্ত্তের ভূদেবগণ কেন যে তাহা না পারিবেন তাহা বুঝিতে পারি না। বৃত্রাসুর বধের সময় এই বৈদ্যুতিকাস্ত্র নির্ম্মিত হইয়াছিল বটে; কিন্তু তাহা তদবধি আকাশে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে এবং আজও তাহা সময়ে সময়ে ভূপৃষ্ঠে পতিত হইয়া স্থাবর জঙ্গমকে নির্ম্মমভাবে দগ্ধ করিতেছে। আধুনিক বৈজ্ঞানিকগণ ইহার দৌরাত্ম্য নিবারণের জন্য lightning conductor নামে এক প্রকার ধাতুনির্ম্মিত শিক আবিষ্কার করিয়াছেন। কোনও প্রাসাদের গায়ে এই শিক লাগানো থাকিলে বজ্রপাতের বিদ্যুৎ তাহা ধরিয়া বিনা উপদ্রবে ভূগর্ভে চলিয়া যায়—তাহাতেই প্রাসাদ রক্ষা পায়। সম্ভবতঃ মানুষেও এইরূপ একটি ধাতুর শিক হাতে করিয়া বেড়াইলে বজ্রাঘাত হইতে রক্ষা পাইতে পারে। এ ব্যবস্থা যে কেবল আমি একা করিতেছি তাহা নহে। শুনিয়াছি অশেষবিধ রোগে আক্রান্ত হইয়া এক রোগী প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকারের কাছে গিয়াছিল। ডাক্তারবাবু তাহার দেহ পরীক্ষা করিয়া বলিলেন—“বাপু হে, যত কিছু উৎকট ব্যাধি আছে, তাহা সমস্তই তোমার হইয়াছে; কেবল তোমার মাথায় এখনও বাজ পড়িতে বাকি আছে। অতএব তুমি একটি তামার শিক হাতে করিয়া বেড়াইবে। তোমার জন্য ইহাই আমার প্রেস্‌ক্রিপ্‌সন্‌।”

তবে বজ্রাঘাত হইতে রক্ষা পাইবার জন্য মানুষের পক্ষে আর এক উপায় করিলেও চলে। একটি বাস্তব ঘটনার উল্লেখ করি-

তেছি; তাহা হইতে এই উপায় কি তাহা জানা যাইবে। বিলাতে টাইন্ ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কসে একটি লোক কাজ করিত। সে কর্ম্ম-স্থল হইতে বাটী আসিবার সময় ঝড়বৃষ্টিতে পড়ে। তাহার উপরে বজ্রপাত হয়। তাহার টুপি ও মোজা ছিঁড়িয়া পুড়িয়া গিয়াছিল। তাহার পকেটে যে সকল ধাতুমুদ্রা ছিল তাহাও গলিয়া জমিয়া গিয়াছিল। তাহার ঘড়ী ও চেইনেরও ঐ দশা হইয়াছিল। তাহাকে হাঁসপাতালে লইয়া যাওয়া হয়। কয়েকদিনের চিকিৎসায় লোকটি বাঁচিয়া গেল। ডাক্তারদিগের মতে তাহার ভিজা কাপড়-চোপড়ই তাহাকে বাঁচাইয়া দিয়াছিল। ভিজা কাপড় লাইটনিং কণ্ডাক্-টরের কাজ করে। বজ্রপাতের বিদ্যুৎ এই ভিজা কাপড় বাহিয়া মৃত্তিকাতে প্রবেশ করিয়াছিল—তাহার দেহের কোন মারাত্মক অনিষ্ট করে নাই।

বিদ্যুতের সাহায্যে যাহাতে সত্বর বিনা আয়াসে বড়লোক হওয়া যায়, তাহারও চেষ্টা হইতেছে। কোনও কোনও উল্কাপিণ্ডের ভূপ-তিত দগ্ধাবশিষ্ট অংশের মধ্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র হীরককণা পাওয়া গিয়াছে। তাহা দেখিয়া কোন কোন রসায়নশাস্ত্রবিদ্ পণ্ডিত স্থির করেন যে প্রচণ্ড উত্তাপ ও চাপের সাহায্যে কৃত্রিম উপায়ে হীরক প্রস্তুত করা যাইতে পারিবে। বহু গবেষণা ও পরীক্ষার ফলে তাঁহারা বিদ্যুতের সাহায্যে ফারণ্‌হীটের ৫০০০ ডিগ্রী উত্তাপের দ্বারা এলুমিনা নামক মৃত্তিকা হইতে রক্তবর্ণ রুবি বা চুণী, এবং অঙ্গার হইতে হীরক প্রস্তুত করিতে সমর্থ হইয়াছেন। কিন্তু এই পরীক্ষা হইতে এ পর্য্যন্ত লাভবান ব্যবসা করিবার উপযোগী ফল পাওয়া যায় নাই; ভবিষ্যতে পাইবার আশা আছে।

এতদ্ব্যতিরেকে সভ্য জগতে বিদ্যুৎকে দিয়া ইদানীং অনেক প্রকার হাল্‌কা কাজও করাইয়া লওয়া হইতেছে। ইলেক্‌ট্রিক্ Bell বা ঘণ্টা অনেকেই দেখিয়াছেন। চোর ধরিবার জন্য ঘরের দর-জার সঙ্গে এই ঘণ্টার তারের এরূপ যোগ রাখা হয় যে, চোরে ঐ

দরজা খুলিবামাত্র ঘণ্টা বাজিয়া উঠে। ইহাতে ঘরের লোক জাগিয়া উঠিয়া তাহাকে ধরিয়া ফেলে। বাগানের hot houseএ থার্ম্মিটারের পারদস্তম্ভের সহিত ইলেক্‌ট্রিক বেল্‌-এর তারের এরূপ যোগ রাখা হয় যে, সেখানে আবশ্যকীয় তাপের উৎপত্তি হইলে ঘণ্টা আপনাআপনি বাজিয়া উঠিয়া মালীকে সতর্ক করিয়া দেয়। সম্প্রতি কলিকাতার সর্ব্বত্র fire-alarm বা অগ্নিদাহের সংবাদ দিবার সাঙ্কেতিক উপায় সংরক্ষিত হইয়াছে। ইহার সাহায্যে কোন স্থানে আগুন লাগিলে সত্বর Fire-Brigadeকে সংবাদ দেওয়া হয়। বিদ্যুতের সাহায্যে একটি ঘড়ীর দ্বারা নানাস্থানের ইলেক্‌ট্রিক্‌ ডায়েলের কাঁটা যথাযথ রূপে পরিচালিত করা যায়। ইহাতে একটি ঘড়ীর দ্বারা বহু ঘড়ীর কাজ করা সম্ভব হয়। বিদ্যুতের সাহায্যে এক সেকেণ্ডের পাঁচ হাজার ভাগের এক ভাগকেও মাপিতে পারা যায়। সুতরাং এখন ঝড় বায়ু ও বন্দুকের গুলির গতির বেগ নির্দ্ধারণ করা আর দুরূহ নহে। রেলওয়ের ডিষ্ট্যাণ্ট্‌ সিগ্‌ন্যালের পাখাকে বৈদ্যুতিক উপায়ে বিনা ভুলভ্রান্তিতে উঠানো নামানো হইয়া থাকে। এবং দ্রুতগামী ইঞ্জিনের ড্রাইভারকে বিদ্যুতের সাহায্যে নির্ব্বিঘ্নে "লাইন্‌ ক্লিয়ার" দেওয়া হয়। এরূপ একপ্রকার বৈদ্যুতিক চেয়ার আবিষ্কৃত হইয়াছে, যাহাতে বসিয়া থাকিলে জাহাজে সমুদ্রযাত্রার সময় sea-sickness বা বমনরোগ নিবারিত হয়। এমন বৈদ্যুতিক ল্যাম্প প্রস্তুত হইয়াছে, যাহা লইয়া খনির মধ্যে কাজ করিলে কিছুতেই খনিতে আগুন লাগিবার আশঙ্কা থাকে না। সমুদ্রে ভীষণ তুফানের সময় জাহাজকে টলিতে না দিয়া ঠিক রাখিবার জন্য এক প্রকার আশ্চর্য্য বৈদ্যুতিক উপায় উদ্ভাবিত হইয়াছে। জঙ্গলের বড় বড় গাছ কাটিবার জন্য এখন আর কুঠার ও করাতের প্রয়োজন হয় না; ইলেক্‌ট্রিক তারের দ্বারা "কটারাইজ্‌" করিয়া প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড কাঁচা গাছ অতি সহজে কাটা যায়। বিদ্যুৎকে আজকাল কৃষি-কার্য্যেও প্রত্যক্ষভাবে নিয়োজিত করা হইয়াছে। ইহার

সাহায্যে বীজ হইতে সহজে অঙ্কুরোদ্গম হয়, এবং চারা গাছ-গুলি শীঘ্র শীঘ্র বর্দ্ধিত হইয়া প্রচুর ফল-শস্য প্রদান করে। বিদ্যুতের অন্যান্য তথ্য ও রোগ চিকিৎসার ব্যাপারে তাহা যে কত কাজ করিতেছে তাহা স্বতন্ত্র প্রবন্ধে বলিবার বাসনা রহিল।

শ্রীহরিদাস হালদার।

বৈষ্ণব

১

মোদের হরি বংশীধারী, মোদের হরি মাখনচোরা
যুগলরূপের উপাসী গো, পিপাসী সে রূপের মোরা।
স্মরণে তার পরশ মধু, নামে ঝরে পীযূষ ধারা,
মুগ্ধ মোদের মানস বধূ পেয়ে তাহার বাঁশীর সাড়া।
কোথায় কুরুক্ষেত্রে কোথা, গভীর 'পাঞ্চজন্য' বাজে,
গাণ্ডীবেরি টঙ্কারেতে, দলে দলে সৈন্য সাজে,
আমরা তাহার ধার ধারিনে, খুঁজি কোথায় তমাল ছায়ে,
মিশেছে রাই কণক লতা কল্পতরু শ্যামের গায়ে।

২

বিজ্ঞান জ্ঞান তোমরা লহ শাস' বরুণ প্রভঞ্জনে
তুচ্ছ কর বিশ্বনাথে দর্পহারী নিরঞ্জনে।
জ্ঞান তাহারে মিলিয়ে দেবে, প্রমাণ তারে আনবে কাছে
এমন দারুণ দুষ্ট আশায় বৈষ্ণবেরি প্রাণ কি বাঁচে?

চাইনে মোরা শক্তি ওগো ভক্তিভরে ডাকবো তারে
প্রণয়ী সে রাখাল-রাজা দূরে কি আর থাক্‌তে পারে ?
মগ্ন র'ব সে রূপ ধ্যানে মনে মনে গাঁথবো মালা
আসবে হৃদয়কুঞ্জে ওগো আসবে মোদের চিকণ কালা।

৩

আমরা ভীরু আমরা ভীত মর্য্যাদাজ্ঞান নাইক মনে
ক্ষুদ্র শুধু চাইগো ধরা ঢাক্‌তে প্রেমের আচ্ছাদনে।
যুদ্ধ করো শত্রু নাশ' কাঁপাও ধরা গর্জ্জনেতে।
আনন্দ পাই আমরা ত্যাগে শান্তি যে পাই বর্জ্জনেতে।
রঙ্‌ মেখে তোমরা নাচ, টলাও তারে বসুন্ধরা
প্রীতির ফাগ্‌ ও কুঙ্কুমেতে হোলি খেলাই খেল্‌ব মোরা।
দাও দেবে দাও টিট্‌কারী গো নিত্য রটাও নূতন কথা,
নিবিড় মিলন আনন্দেতে ভুল্‌বো মোরা সকল ব্যথা।

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক।

মহারাজা রাজবল্লভের জমিদারীর পরিণাম

১৭২৮ খৃঃ অব্দে সুজাখাঁর বন্দোবস্তকালে আমরা সর্ব্বপ্রথম রাজবল্লভের জমিদারীর সূত্রপাত দেখিতে পাই *। এদিকে কিন্তু ১৭৯৯ খ্রীঃ অব্দেই দেখা যায়, ঐ সম্পত্তির বিলোপ সাধিত হইতে বসিয়াছে। মধ্যবর্ত্তী এই সপ্ততি বৎসর মধ্যেই কিরূপ উজ্জ্বল প্রতিভায় উদ্ভাসিত হইয়া, রাজনগরের রাজশ্রী ধ্বংসের পথে উপনীত হইল তৎপ্রদর্শন করাই এই প্রবন্ধের প্রধান উদ্দেশ্য।

১৭৬৩ খ্রীঃ অব্দে নবাব মীরকাসেম আলী খাঁ কর্ত্তৃক মহারাজা রাজবল্লভ ও তদীয় দ্বিতীয় পুত্র রাজা কৃষ্ণদাস বাহাদুর নিহত হইলে, মহারাজের তৃতীয় পুত্র রাজা গঙ্গাদাসের উপরে বিষয় সম্পত্তির রক্ষণাবেক্ষণের ভার পতিত হইল। এই সময়ে ইংরেজ কুঠিয়ালগণ তদীয় জমিদারী বোজের গোউমেদপুর মধ্যে যেরূপ অত্যাচার করিতেছিলেন, তাহার মূলকারণসম্বলিত যে আবেদনপত্র রাজপক্ষ হইতে জনৈক উকীল কর্ত্তৃক গবর্ণমেণ্ট নিকট উপস্থিত করা হয়, উহা সদাশয় বিভারেজ সাহেব তদীয় বাখরগঞ্জের ইতিহাসে সন্নিবেশ করিয়া গিয়াছেন। রাজকার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াই গঙ্গাদাসকে এইরূপ অনর্থ ঘটনায় পতিত হইতে হয়। তিনি এই কারণে এত উদ্বিগ্ন হইয়াছিলেন যে, ঐ পরগণা পরিত্যাগ করাই শ্রেয়স্কর মনে করেন, কিন্তু জপসাবাসী জ্ঞাতি ভ্রাতা লালা রামপ্রসাদ ও শ্রীনগরবাসী লালা কীর্ত্তিনারায়ণের নানাবিধ প্রবোধ বচনে এই কার্য্য হইতে বিরত থাকিয়া গবর্ণমেণ্ট সমীপে আবেদনপত্র প্রদান

---

* ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর পঞ্চম রিপোর্টে, ঢাকা নেয়াবতী দেখ। এই সময়ে রাজনগর পরগণার প্রথম পরিচয় পাওয়া যায়।

করিতে বাধ্য হন।* বলা বাহুল্য তাঁহাদের আবেদনে সুফল ফলিয়াছিল।

এই ঘটনার অল্পকাল পরেই গঙ্গাদাসের মৃত্যু ঘটে। তখন রাজ-সংসারের পরিচালনার ভার, রাজবল্লভের পঞ্চম পুত্র রায় গোপালকৃষ্ণের উপর অর্পিত হয়। রাজবল্লভের যথাক্রমে সাতটি পুত্র জন্মগ্রহণ করেন, তন্মধ্যে প্রথম পুত্র দেওয়ান রামদাস ও চতুর্থ পুত্র রায় রতনকৃষ্ণ, পিতা বর্ত্তমানেই অকালে কালকবলিত হন। এই জন্য পঞ্চম পুত্র রাজ্যভার গ্রহণ করেন।

রায় গোপালকৃষ্ণ অতি তেজস্বী ও বুদ্ধিমান পুরুষ ছিলেন। তিনি কর্ম্মচারীগণের হস্তের ক্রিয়াপুত্তলী ছিলেন না, স্বয়ংই সমুদয় কার্য্যের পর্য্যবেক্ষণ করিতেন। রাজবল্লভ বহু বিষয় সম্পত্তি অর্জ্জন করিয়া যান বটে, কিন্তু তৎসমুদয়ের সুশৃঙ্খলা বিধান করিয়া যাইতে পারেন নাই। তৎসমুদয় উদ্ধারের ভার গোপালকৃষ্ণের উপর পতিত হইল। স্বকীয় প্রতিভাবলে তিনি ঐ সকল বিঘ্ন-বিপত্তি অনায়াসে অতিক্রম করিতে সমর্থ হন।

---

* এই আবেদন-পত্রের সার মর্ম্ম এই যে কুঠিয়াল সাহেবেরা জমিদারের অনুমতি ব্যতীতই পরগণার নানাস্থানে তাফাল (লবণ প্রস্তুত করার চুল্লী) প্রস্তুত করিত; তজ্জন্য জমিদারের অনুমতি লওয়া দূরে থাকুক, বরং স্থানীয় নায়েব প্রভৃতি কর্ম্মচারীগণকে পীড়ন করিত। কোন কোন কুঠিয়াল, তাহাদের দ্রব্যাদি চুরি হইয়াছে বলিয়া জমিদারের কাছে ক্ষতিপূরণ চাহিত, না পাইলে পিয়ন পাঠাইয়া কর্ম্মচারীগণকে আটক করিতে চাহিত, এবং পিয়নের খরচ দৈনিক একটাকা হিসাবে আদায় করিয়া লইত। জমিদারের প্রজারা কুঠিয়ালগণের আশ্রয় গ্রহণ করিলে, আর খাজনা দেওয়া আবশ্যক মনে করিত না। তাফালে কর্ম্ম করার জন্য, লোক ধরিয়া সুন্দরবনে পাঠাইয়া দিয়া, অর্দ্ধ বেতনে বিদায় করা হইত। এতন্মধ্যে ভবিন নামে একজন কুঠিয়াল সম্বন্ধে আরও নানাবিধ অত্যাচারের কথা শুনা যায়।

(বিভারেজ-কৃত বাখরগঞ্জের ইতিহাস ৯৫ পৃষ্ঠা)

পূর্ব্বে বোজের গোউমেদপুর পরগণা সম্বন্ধে বলা হইয়াছে যে, কুঠিয়াল সাহেবগণের সহিত কতক প্রজা যোগদান করিয়া খাজনা দেওয়া আবশ্যক মনে করিত না। পরে উহারা এরূপ হইয়া দাঁড়াইল যে জমিদারের প্রতিকূলে অভ্যুত্থান করিয়া কর দেওয়া বন্ধ করে। রাজপক্ষ যখন তাহাদিগকে কোন মতেই স্ববশে আনিতে পারিলেন না তখন কতিপয় পর্টুগীজকে সৈনিক কার্য্যে নিযুক্ত করিয়া, বোজের গোউমেদপুরে সংস্থাপন করেন। এই বিদ্রোহ নিবারিত হইলে পরও ঐ সকল পর্টুগীজেরা সপরিবারে তথায় বাস করিতে থাকে, এই জন্য রাজপক্ষ হইতে তাহাদিগকে প্রচুর ভূবৃত্তি ও তালুক প্রদত্ত হয়—যাহা অদ্যাপি তাহাদের বংশীয়েরা পাদ্রীয়ান তালুক নামে ভোগ করিতেছে। উহারা যে স্থানে বাস করে, উহা পাদ্রীশিবপুর নামে প্রসিদ্ধ।✓

কার্ত্তিকপুর পরগণা রাজসরকারের ক্রয় করা হইলেও তত্রত্য মুন্সী চৌধুরীগণ উহার স্বত্ব-দখল রাজপক্ষকে দিতেছিলেন না। রায় গোপালকৃষ্ণ বহু লাঠিয়াল ও হিন্দুস্থানী সৈন্য প্রেরণ করিয়া, চৌধুরী পক্ষের অস্ত্রধারী জনসঙ্ঘের সহিত ঘোরতর যুদ্ধ বাধাইয়া দেন; উহাতে উভয় পক্ষে প্রায় সহস্র মানবের শোণিতপাত ও বিনাশের সহিত উক্ত পরগণা রাজপক্ষের হস্তগত হয়। উপরি উক্ত দুইটি ঘটনার ফল দেখিয়া আর কেহই রাজনগরের রাজগণের বিরুদ্ধে দাঁড়াইতে সাহসী হন নাই।

তৎকালে নিম্নলিখিত পরগণাগুলি ও বহু তালুক রাজসম্পত্তির অন্তর্গত ছিল। রাজনগর, কার্ত্তিকপুর, বোজের গোউমেদপুর, লক্ষীর-দিয়া ও আমিরাবাদ প্রভৃতি পরগণা। বিক্রমপুর ও জালালপুর মধ্যে বহু তালুক। উত্তর সাহাবাজপুর পরগণার কতকাংশও এই জমিদারীভুক্ত ছিল।

পরগণে সেলিমাবাদের সাড়ে এগার আনা অংশ রাজবল্লভের হস্তগত হয় বটে, কিন্তু উহার মালিকান স্বত্ব তাঁহার ছিল না, কেবল

আদায় তহশীলের ভার তৎপ্রতি অর্পিত হয়, এইজন্য তাঁহাকে জিম্মাদার বলা হইত। কারণ ১৭৫২ খ্রীঃ অব্দে আগাবাখরের মৃত্যু হইলে ঐ সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত হইয়া রাজবল্লভের হস্তগত হয় *। আগাবাখর বোজের গোউমেদপুরের জমিদার ছিলেন বটে, কিন্তু সেলিমাবাদেরই জিম্মাদার ছিলেন, কাজেই রাজবল্লভও তদ্রূপ ভাবেই উহা প্রাপ্ত হন। সেলিমাবাদের ভূতপূর্ব্ব মালিকগণ এই কারণে, ভূকৈলাশের জমিদারগণের পূর্ব্বপুরুষ গোকুলচাঁদ ঘোষালের সহায়তায় ঐ সম্পত্তির উদ্ধার সাধন করিতে সমর্থ হন।

সমগ্র জমিদারী ও তালুক প্রভৃতির সদর রাজস্ব দিয়া উহার নয় লক্ষ টাকা আয় দাঁড়াইয়াছিল। যতদিন পর্য্যন্ত রায় গোপালকৃষ্ণ জীবিত ছিলেন, ততদিন পর্য্যন্ত এই নয়লক্ষ জমিদারীর কোনরূপ অপচয় সংঘটিত হয় নাই। কিন্তু উহা নষ্ট হইবার সূত্রপাত তাহা হইতে হইয়াছিল বলিয়াই অনুমিত হয়।

পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে রাজবল্লভের প্রথম পুত্র রামদাস ও চতুর্থ পুত্র রতনকৃষ্ণ পিতা বর্ত্তমানেই লোকান্তরিত হন। তাঁহারা দুইটি দত্তক পুত্র রাখিয়া যান। গোপালকৃষ্ণ এই দুই দত্তককে সম্পত্তির অংশ প্রদান না করিয়া অপর পাঁচ ভ্রাতার নামে স্বয়ং জমিদারী পরিচালনা করিতে থাকেন। মিঃ টমসন এই জন্য গোপালকৃষ্ণকে রাজসম্পত্তির ম্যানাজার বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।†

যেকাল পর্য্যন্ত দুষ্ট সরস্বতীর বশবর্ত্তী না হইয়া, গোপালকৃষ্ণ নিরপেক্ষভাবে জমিদারীর কার্য্য পরিচালনা করিয়াছিলেন, ততদিন

(*) আগাবাখর সেলিমাবাদেরও ওয়াধাদার ছিলেন। (বিভারেজ-কৃত বাখরগঞ্জের ইতিহাস ১৫৬ পৃঃ)

রাজবল্লভ সেলিমাবাদ পরগণার ওয়াধাদার (জিম্মাদার) ছিলেন। ঐ ইতিহাস ১০৮।৯ পৃষ্ঠা।

(†) বিভারেজ-কৃত বাখরগঞ্জের ইতিহাস ১০০ পৃষ্ঠা।

পর্য্যন্ত কোনরূপ গোলযোগের আবির্ভাব না হইয়া সুশৃঙ্খলার সহিত, জমিদারীর কার্য্য চলিয়া রাজসংসারের উন্নতি সাধিত হইতে-ছিল। এই সময়ে গোপালকৃষ্ণ কর্তৃক রাজনগরের সুপ্রসিদ্ধ একুশ রত্ন মন্দিরটি নির্ম্মিত হয়। এভাব কিন্তু আর অধিককাল স্থায়ী থাকিল না, কারণ গোপালকৃষ্ণ পুত্রস্নেহে এইরূপ মুগ্ধ হইলেন যে, হাওলা ও তালুক প্রভৃতি নানাশ্রেণীর প্রবর্ত্তন করিয়া সম্পত্তি হইতে প্রায় অর্দ্ধাংশ ছলনাক্রমে পুত্র পিতাম্বর সেনের নামে পৃথক্ করিয়া লইলেন।

অপর চারি অংশীদারগণ মধ্যে এই সময়ে যাঁহারা জীবিত ছিলেন, তন্মধ্যে রাজা গঙ্গাদাসের পুত্র কালীশঙ্কর সর্ব্বাপেক্ষা উপযুক্ত বলিয়া বিবেচিত হইতেন। তিনি পিতৃব্যের এই আচরণে নিতান্ত ক্ষুণ্ণ হইয়া, অন্যান্য অংশীগণসহ, এই বিষয়ের মীমাংসা জন্য গোপাল-কৃষ্ণ সমীপে উপস্থিত হইলেন। গোপালকৃষ্ণ তাহাদের কথা শুনা দূরে থাকুক কোন প্রকার আপ্যায়িত করাও আবশ্যক মনে করি-লেন না। তখন তাহারা অনোন্যপায় হইয়া, জমিদারী বণ্টন জন্য গবর্ণমেণ্টের নিকট আবেদন করিলেন। গোপালকৃষ্ণ তৎবিরুদ্ধে বহুচেষ্টা করিলেও ১৭৮২ খ্রীঃ অব্দে বাঁটোয়ারার অনুমতি প্রদত্ত হয়। পুনরায় আপিল হইল বটে, কিন্তু ১৭৮৭ খ্রীঃ অব্দে উহা অগ্রাহ্য হইয়া গোপালকৃষ্ণের পরাজয় সাধিত হইল। তবে আর তাঁহাকে এজন্য অধিক ভাবনা ভাবিতে হইল না। সেই বৎসর (বাঙ্গলা ১১৯৪ সনে) গোপালকৃষ্ণ মৃত্যুমুখে পতিত হইয়া সমস্ত চিন্তার দায় হইতে নিষ্কৃতিলাভ করিলেন। তিনি বর্ত্তমান থাকা পর্য্যন্ত, রাজনগরের জমিদারীর কোন অংশই হস্তচ্যুত হইতে পারিয়া-ছিল না।

১৭৯০ খৃঃ অব্দে জমিদারী বাঁটোয়ারার জন্য টমসন সাহেব অনুমতি প্রাপ্ত হন। ১৭৯১ খৃঃ অব্দে তাহাকে কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতে দেখা যায়। টমসন বাঁটোয়ারা আরম্ভ করিয়া দিতেই,

রাজবল্লভের স্ত্রীগণ ও প্রথম এবং চতুর্থ পুত্রের দত্তক পুত্রদ্বয় মাসহারার দাবীতে এক এক দরখাস্ত উপস্থিত করেন। উহাতে স্থির হয় তিন রাণী প্রত্যেকে এক শত করিয়া তিন শত ও দত্তকদ্বয় এক শত করিয়া দুই শত মোট পাঁচ শত টাকা মাসিক রাজসম্পত্তি হইতে প্রাপ্ত হইবেন। পাছে জমিদারীর মালিকগণ হইতে এই টাকা পাইতে বেগ পাইতে হয় এজন্য টমসন সাহেব উহা সদর রাজস্বের অন্তর্ভুক্ত করিয়া বাৎসরিক ছয় সহস্র টাকা, জমিদারগণের প্রতি অতিরিক্ত কর ধার্য্য করিয়া লন। মাসহারা প্রাপকেরা ঐ টাকা গবর্ণমেণ্ট হইতেই বরাবর পাইবেন এই নিয়ম স্থির হয় *। এতদ্ভিন্ন টমসন সাহেব জমিদারীর সদর রাজস্ব বহুপরিমাণে বর্দ্ধিত করেন। উহাতে রাজসন্তান বাদী প্রতিবাদী সকলেই একমত হইয়া টমসনের বিরুদ্ধে অভিমত প্রদান করিতে লাগিলেন। ১৭৯৮ খৃঃ অব্দে তাহাদের পক্ষ হইতে রাজস্ব বর্দ্ধনজনিত কষ্টের কথা বর্ণনা করিয়া এক দরখাস্ত গবর্ণমেণ্টের নিকট প্রেরণ করা হয়। গবর্ণমেণ্ট সার ইলাইজা ইম্পের উপর উহার বিবেচনার ভার অর্পণ করেন। এতৎ সম্বন্ধে, ইম্পে সাহেব যাহা করেন উহাও বিভারেজের ইতিহাসে উল্লেখ আছে; তৎসম্বন্ধীয় চিঠীগুলি আর এই স্থানে উদ্ধৃত করিলাম না। ফলে কর-ভার হইতে তাঁহারা আর অব্যাহতি লাভ করিতে পারিলেন না।

এদিকে বাঁটোয়ারার জন্য প্রচুর অর্থব্যয় করিয়াও পরে জলপ্লাবন হেতু জমিদারীর দুর্দ্দশা হওয়ায়, জমিদারগণ একেবারে অবসন্ন হইয়া পড়েন। ডে সাহেব জলপ্লাবনঘটিত প্রজার দুরাবস্থার কথা গবর্ণমেণ্টকে পরিজ্ঞাত করাতেও কোন ফল ফলিল না। বর্দ্ধিত হারের

---

* রাণীগণের মৃত্যুর পর তাঁহাদের মাসহারা বাজেয়াপ্ত হয়, কিন্তু অপর দুই জনের বংশধরগণ অদ্যাপি বর্ত্তমান থাকিয়াও উহা প্রাপ্ত হইতেছে না।

করসহ বাকী টাকার জন্য পরওয়ানা জারী হইল; গবর্ণমেণ্ট দাবী করিলেন কিন্তু জমিদারগণ উহা আদায় করিতে সমর্থ হইলেন না। কাজেই তৎকালের নিয়মানুসারে উহা নিলামে উঠিল।

এইকালে মসিসাহেব ঢাকার কালেক্টর ছিলেন। তিনি তিন দিবস পর্য্যন্ত ঐ মহাল নিলামে উঠাইলেও কোন ক্রেতা উপস্থিত হইল না। তখন গবর্ণমেণ্টের পক্ষ হইতে মাত্র এক টাকা মূল্যে উহা ক্রয় করিয়া লন। বাকী রাজস্বের জন্য জমিদারীর নীচস্থ বহু তালুক যাহা রাজাদের দখলে ছিল উহা নিলাম করাইয়া গবর্ণমেণ্টের পক্ষে খাস করিয়া লওয়া হয়। বর্ত্তমান সময়ে তৎকালীন ধার্য্য করের উপরে বোজের গোউমেদপুরের আয় প্রায় দুই লক্ষের উপর দাঁড়াইয়াছে।

এইরূপে আত্মকলহে লিপ্ত হইয়া তাঁহারা প্রায় সর্ব্বস্বই হারাইলেন এবং ইহা হইতেই মূল অধিকারীগণের গ্রাসাচ্ছাদনের উপায় একেবারে চিরতরে বিলুপ্ত হইয়া গেল। *

সর্ব্বোপরি আত্মকলহই মহারাজা রাজবল্লভের অতুল সম্পত্তি নাশের কারণ হইয়াছিল; আমরা এতৎ সম্বন্ধে অধিক লিখিতে সক্ষম হইলাম না, তবে যাঁহারা বিশেষ বিবরণ অবগত হইতে বাঞ্ছা করেন, তাঁহারা মিঃ বিভারেজ-কৃত বাখরগঞ্জের ইতিহাসের অন্তর্গত পরগণে বোজের গোউমেদপুরের বিবরণ পাঠ করিলেই সম্যক পরিজ্ঞাত হইতে পারিবেন।

শ্রীআনন্দনাথ রায়।

---

* জমিদারী না থাকিলেও বহু নিস্কর তালুকের আয় দ্বারা তাহাদের একরূপ চলিয়া যাইত।

নিঃশ্রেয়স

[রবার্ট ব্রাউনিং]

ক্ষুদ্র এক মধুচক্রে সারা বসন্তের
শোভাস্মৃতিসুখ ;
সিন্ধুর প্রশান্তি কান্তি স্বচ্ছ মুকুতার
ভরা ক্ষুদ্র বুক ;
খনিগর্ভে ধরে সব গৌরব বিভব
হীরা একটুক ;
শোভা স্মৃতি, শান্তি কান্তি, বিভব গৌরব,
এ সবার 'পরে—
হীরকের চেয়ে শুভ্র—সত্য সমুজ্জ্বল,
মুকুতার চেয়ে স্বচ্ছ—বিশ্বাস সরল,
পুষ্পমধু চেয়ে মিষ্ট—স্নেহ সুকোমল,
রয়েছে আমার তরে সজ্জিত ও থরে থরে
ক্ষুদ্র বালিকার এক প্রস্ফুট অধরে !

শ্রীসুশীলকুমার দে।

অপূর্ব্ব দীক্ষা

[গল্প]

এম, এ, পাশ করিবার পর কয়বৎসর নিজের প্রশংসা শুনিতে শুনিতেই কাটিয়া গেল—আর বিশেষ কোনও কাজ হইল না। জমিদারের ছেলে একটি অকাল কুষ্মাণ্ড না হইয়া যে লেখাপড়া ক'রে মানুষ হয়ে চরিত্রবান হয়, এ দৃশ্য আমাদের দেশের লোকের চক্ষে পৃথিবীর অষ্টম আশ্চর্য্য! একে অল্প বয়স, তাহাতে সকলেই অত্যন্ত প্রশংসা করিতেছে, কাজেই আমার মনে মনে যে বেশ একটুকু অহঙ্কার না হইয়াছিল এমন কথা বলিতে পারি না।

এই সময় বরাবর একদিন আমাদের জেলার একজন বড় ব্রাহ্মণ জমিদারের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাই। জমিদার-পুঙ্গব বাল্যে অনেক নিরীহ প্রাইভেট শিক্ষকের নানারূপ লাঞ্ছনা করিয়া যেটুকু বিদ্যা আদায় করিয়া লইয়াছিলেন তাহার বলে তিনি সময়ে এবং অসময়ে ইংরেজী ভাষার শ্রাদ্ধক্রিয়া সুসম্পন্ন করিয়া আত্মপ্রসাদ লাভ করিতেন। ইহা ছাড়া তাঁহার ইংরেজী বিদ্যার আরও দু'একটা প্রমাণ ছিল—যথা মনুনিষিদ্ধ পশুপক্ষী ভক্ষণ, পাঁচ ইয়ারে মিলিয়া পরস্পরের স্বাস্থ্যপান ইত্যাদি। এক কথায় নব্যতন্ত্র-সম্মত প্রণালীতে পঞ্চমকার সাধন। তবে তাঁহার ইংরেজী বিদ্যা সত্তেও জমিদারীতে গরীব প্রজার উপর অত্যাচার তাঁহার বাপদাদার আমলেও যেরূপ ছিল তাঁহার আমলেও সেইরূপ চলিয়া আসিতেছিল। জমিদার বাবুকে মহারাজ বলিয়া ডাকিতে হইত। সেদিন এক বন্ধু বলিলেন, মহারাজ সম্প্রতি কুভোজন ত্যাগ করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহার কারণ ডিস্পেপ্‌সিয়া না ডায়াবিটিস্‌ তাহা তিনি ঠিক বলিতে পারিলেন না। আমি দেখা করিতে গিয়াছিলাম সকাল বেলা। একজন

কর্ম্মচারী বলিল, "মহারাজ এখন আহ্নিক করছেন শীঘ্রই আসিবেন, আপনি একটু বসুন।" শুনিয়া মনে মনে হাসিলাম; মহারাজের এতটা নিষ্ঠা কবে থেকে হ'ল? বৈঠকখানায় দেখিলাম কয়েকটি অনুগ্রহাকাঙ্ক্ষী ব্রাহ্মণ পণ্ডিত মহারাজের অপেক্ষায় কে জানে কতক্ষণ বসিয়া আছেন।

মহারাজ আসিয়াই আমার সহিত সেকহ্যাণ্ড করিয়া কথাবার্ত্তা জুড়িয়া দিলেন, পণ্ডিত মহাশয়গণ কথা বলিবার সুযোগের প্রতীক্ষায় বসিয়া রহিলেন। এ-কথা ও-কথার পর বিলাতযাত্রার কথা উঠিল। মহারাজ বলিলেন, "ব্রাহ্মণ যদি বিলাত যায় তাহা হইলে প্রায়শ্চিত্ত করিলেও তাহাকে জাতিচ্যুত হইতে হইবে।"

আমি বলিলাম, "কৈ শাস্ত্রে ত কোথাও সমুদ্রগমনকে এত বড় একটা মহাপাতক বলে লিখ্‌ছে না যে তার প্রায়শ্চিত্ত হয় না।"

একজন পণ্ডিত মহাশয় টিকি নাড়িয়া বলিয়া উঠিলেন, "হাঁ, হাঁ, সমুদ্রগমনটা তত বড় পাপ নয় বটে, কিন্তু যদ্যপি কেহ ব্রাহ্মণবংশে জন্মগ্রহণ করে' জ্ঞাতসারে বহুবার অভক্ষ্য ভক্ষণ করে, তাহ'লে তার আর প্রায়শ্চিত্তের অধিকার থাকে না। ইহাই শাস্ত্রের আদেশ।"

আমি আর থাকিতে পারিলাম না—উত্তেজিত ভাবে বলিয়া উঠিলাম, "পণ্ডিত মহাশয়, আপনার শাস্ত্রের আদেশ আমরা দেশশুদ্ধ লোক মানিয়া লইতেছি কিন্তু আপনি নিজের বুকে হাত দিয়া বলুন দেখি, যে সকল ব্রাহ্মণ বিলাত না গিয়া এখানেই অভক্ষ্যভক্ষণ করিতেছেন আপনি কি তাঁহাদের জাতিচ্যুত বিবেচনা করেন? আপনি বলবেন তাঁহারা লুকাইয়া খায়, কিন্তু দেখুন নিজের বিবেককে ফাঁকি দিবেন না। তাহারা যে এ সব খায় তাহা আমিও জানি, আপনিও জানেন, আর দশ জনেও জানে। তবে ধনীলোক, আর সময়ে অসময়ে আপনাদের দু'দশ টাকা সাহায্য করেন, কাজেই আপনারা দেখিয়াও দেখেন না।"

আমার বক্তৃতাটি শেষ করিয়া একবার বিজয়ী বীরের স্থায় পর্য্যু-দস্ত পণ্ডিতগণের দিকে চাহিয়া দেখিলাম, তাঁহারা মাথা চুলকাই-তেছেন। তখন ইহাতে বড় আমোদ হইয়াছিল। এখন কিন্তু মনে হয় কাজটা ভাল করি নাই। দরিদ্র ভদ্রলোক পেটের দায়ে যে সকল অপকর্ম্ম করিতে বাধ্য হন, তাহার জন্ম তাহাদের মনে কষ্ট দেওয়া সদয় হৃদয়ের লক্ষণ নয়। কিন্তু সদ্য এম, এ, পাশের গৌরবে তখন আমার মেজাজ অত্যধিক উষ্ণ।

এইখানে আর একটি কথা বলিয়া রাখি। বিলাতযাত্রার উপর মহারাজের খড়গহস্ত হইবার একটু গূঢ় কারণ ছিল। আমাদের জেলার একটি ব্রাহ্মণ জমিদারের সঙ্গে মহারাজের পুরুষানুক্রমে রেষারিষী ছিল। এখন সেই জমিদারটী ছেলেকে বিলাত পাঠাইয়া-ছিলেন। এই সূত্রে তাঁহাকে সমাজচ্যুত করিয়া নিজেকে একচ্ছত্রী সমাজপতিপদে উন্নীত করিবার আশাতেই আমাদের মহারাজ বিলাত-যাত্রার বিরুদ্ধে এক আন্দোলনের সূচনা করেন—নহিলে তাঁহার আহার-বিহার দেখিলে হিন্দুধর্ম্মের প্রতি প্রবল নিষ্ঠার পরিচয় সকল সময় পাওয়া যাইত না।

আমার বক্তৃতার আর একটি ফল এই হইল যে, মহারাজের মুখে বিরক্তির চিহ্ন ফুটিয়া উঠিল। তিনি বলিলেন, "সত্যেন বাবু, আপনি চটেন কেন? পণ্ডিত মহাশয় বলছেন ব্রাহ্মণই জাতে উঠতে পারবে—আপনারা না। বিলাত থেকে এসে প্রায়শ্চিত্ত করলেই জাতে উঠে যাবেন। বুঝেছেন সত্যেন বাবু, ব্রাহ্মণশূদ্রে লাখবাড়ি তফাৎ।" আমি জাতিতে কায়স্থ।

মহারাজ এইবার আমার হৃদয়ের একটি পুরাতন ক্ষতে লবণ নিক্ষেপ করিলেন। যখনই কোনও উপাদেয় শাস্ত্র পাঠ করিয়া মোহিত হইতাম, তখনই ছ্যাৎ করিয়া মনে পড়িত এসকল ব্রাহ্মণের কীর্ত্তি, আর আমি ঘৃণিত পদদলিত শূদ্রের সন্তান। সম্প্রতি কেহ কেহ প্রমাণ করিতেছিলেন বটে যে কায়স্থরা এক শ্রেণীর ক্ষত্রিয়।

রমেশ্চন্দ্র দত্ত লিখিয়াছেন বৈশ্য ; কিন্তু তাহা ত দেশের লোকে মানিতে চায় না। আর মানিলেই বা কি হইল ? ব্রাহ্মণের তুল্য সম্মান ত আর পাওয়া গেল না ? ব্রাহ্মণ ! তোমাকে দেখিয়া বাস্তবিক আমার হিংসা হয়। তুমি কি উচ্চবংশেই জন্মগ্রহণ করিয়াছ ! আমি যদি ব্রাহ্মণ হইতাম !

যাহা হউক, মহারাজের কথাতে আমি একেবারে তেলে-বেগুণে জ্বলিয়া উঠিলাম। বলিলাম, "দেখুন, এই বিংশ শতাব্দীতে সেকেলে বামণাই আর চলে না। আজকালকার ব্রাহ্মণ কায়স্থ আর বৈদ্যের মধ্যে কি প্রভেদ আছে বলুন। তবে ব্রাহ্মণরা অমাদের শূদ্র ব'লে ঘৃণা করবার কে ? সত্ত্বগুণের আধার ব্রাহ্মণ যতদিন স্বীয় ব্রহ্মণ্য পালন করেন, ততদিনই তিনি পূজ্য, সমাজের শীর্ষস্থানীয়, নচেৎ নয়। ইহাই আমাদের বর্ণাশ্রম।" মহারাজ আমার দিকে চাহিয়া একটু মুরুব্বীয়ানার হাসি হাসিলেন. মুখে বলিলেন, "না, না, ঘৃণা নয়, ঘৃণা নয়। যাক, যাক ওকথা যেতে দিন, সত্যেন বাবু।"

কিছুক্ষণ পরে একটি নামাবলীপরিহিতা ধর্ম্মনিষ্ঠা বৃদ্ধা এক গণ্ডূষ গঙ্গাজল আনিয়া মহারাজের পায়ের নিকট ধরিয়া বলিলেন, "বাবা, একটু চরণামৃত দাও।" তখন এই ঘোর বিষয়ী, কদাচারী জমিদার তাঁহার মাতৃতুল্যা এই ধার্ম্মিকা রমণীর জলগণ্ডূষে আপনার চরণাঙ্গুলী স্পর্শ করিলেন এবং বৃদ্ধা ভক্তিভরে তাহা পান করিলেন —কেননা মহারাজ ব্রাহ্মণ আর বৃদ্ধা শূদ্র।

ইহার পর সেখানে আমি আর এক মুহূর্ত্তও তিষ্ঠিতে পারিলাম না। চলিয়া আসিবার সময় জমিদার বাবুর পণ্ডিতের দলের দিকে চাহিয়া দেখিলাম। তাঁহাদের ঘোর কৃষ্ণ বর্ণ সত্তেও আমার মনে হইল ইঁহারা উচ্ছে ফুলে পীত প্রজাপতি ; মহারাজের তিক্ত মধু আহরণের জন্য লালায়িত।

(২)

সেইদিন হইতে আমার চিরপোষিত ব্রাহ্মণ-বিদ্বেষে নূতন ইন্ধনের

সংযোগ হইল। নানা প্রবন্ধ ও বক্তৃতায় আমি বিধিমতে প্রমাণ করিতে লাগিলাম যে ভারতবর্ষের অধঃপতনের সর্ব্বপ্রধান কারণ সমাজে ব্রাহ্মণের আধিপত্য ও নিম্নজাতিগণের উপর ব্রাহ্মণের অত্যাচার; ব্রাহ্মণ যাহা কিছু শাস্ত্র লিখিয়াছে তাহার একমাত্র উদ্দেশ্য আপনার চালকলার বন্দোবস্ত সম্পাদন। শেষটা এতদূর দাঁড়াইল যে ব্রাহ্মণ দেখিলেই জ্বলিয়া যাইতাম এবং তাহার সম্মুখে তাহার পূর্ব্বপুরুষগণের সয়তানীর বর্ণনা করিয়া অপার আনন্দ লাভ করিতাম। এখন একথা মনে পড়িলে লজ্জাবোধ হয়, একটু হাসিও আসে, কারণ সম্প্রতি আমার যে মত পরিবর্ত্তিত হইয়াছে তাহারও মূলে ব্রাহ্মণ। হাঁ, আমি একজন প্রকৃত ব্রাহ্মণের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া গৌরবান্বিত হইয়াছি। এই তপঃপ্রভাবশালী ব্রাহ্মণের সাক্ষাৎকার লাভ করিবার জন্য আমায় ওঁকারনাথ তীর্থেও যাইতে হয় নাই, গঙ্গোত্রীর পথেও ছুটিতে হয় নাই, হরিদ্বারে, হৃষীকেশেও গঙ্গাজলে ডুব দিতে হয় নাই। ইনি আমারই গ্রামবাসী এবং বাল্যসহচর। ইঁহার না আছে কোনও ভড়ং, না আছে কোনও বুজরুকী —নিতান্ত সাদাসিধে ভদ্রলোক।

শ্রীযুক্ত রামনাথ তর্কালঙ্কারের পিতাও একজন বিখ্যাত পণ্ডিত ছিলেন—রামনাথ উপযুক্ত পিতার উপযুক্ত সন্তান। আমার পিতৃদেব রামনাথের পিতৃদেবকে কিছু ব্রহ্মোত্তর দিয়া আমাদের গ্রামে বাস করান। ভট্টাচার্য্য মহাশয় একটি টোল স্থাপন করিয়া নিজ ব্যয়ে কয়েকটি ছাত্রের ভরণপোষণ ও শিক্ষাদান সম্পন্ন করিতেন। বৃদ্ধবয়সে কৃতবিদ্য পুত্র রামনাথের হস্তে টোল ও সংসারের ভার অর্পণ করিয়া তিনি সস্ত্রীক কাশীবাসী হন।

আমি লেখাপড়ার জন্য কলিকাতাতেই থাকিতাম, কাজেই বহুকাল রামনাথের সহিত আলাপের সুযোগ হয় নাই। বি, এল, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার পর আমার ইচ্ছা হইল নিজের গ্রামে বাস করিয়া জমিদারীর সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি সাধন ও প্রজাপালন করিব।

এই সময় হইতে রামনাথের অদ্ভুত বিদ্যা বুদ্ধি ও চরিত্রের পরিচয় লাভ করিয়া ক্রমে ক্রমে আমার ব্রাহ্মণবিদ্বেষ লোপ পাইল।

রামনাথের সহিত আমার কিরূপ আলাপ হইত তাহার একটু নমুনা দিতেছি। প্রতিদিন দুপুর বেলা রামনাথ আমাদের বাড়ী আসিত। আমি তাহার নিকট সংস্কৃত শিখিতাম এবং তাহার পরিবর্ত্তে তাহাকে ইংরেজী শিখাইতাম। যে অল্প সময়ের মধ্যে রামনাথ ইংরেজী কাব্য, দর্শন, ইতিহাস, বিজ্ঞানের উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট পুস্তকগুলি আয়ত্ত করিয়া লইল, তাহা দেখিয়া আমি একেবারে বিস্মিত হইয়া গেলাম। ভাবিলাম এই সকল কুশাগ্রবুদ্ধি ব্রাহ্মণ পণ্ডিত যদি সংস্কৃতের পরিবর্ত্তে ইংরেজী পড়িতেন, তাহা হইলে বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্ব্বোচ্চ সম্মানগুলি ব্রাহ্মণের একচেটিয়া হইয়া যাইত, বিশ্ববিদ্যালয় গৌরবান্বিত হইত, সহযোগী ও উপযোগী নূতন শিক্ষার আলোকে দেশ নূতন শ্রী ধারণ করিত।

একদিন কথাপ্রসঙ্গে রামনাথকে বলিলাম, "হাঁহে, শাস্ত্র ত অনেক পড়লাম, কৈ ধর্ম্মে ত কিছু বিশ্বাস-টিশ্বাস জন্মাল না।"

রামনাথ বলিল, "দেখ, তোমার মত ইংরেজী জানা লোকের একটা মহৎ দোষ দেখতে পাই যে তাঁরা অনেক শাস্ত্র-টাস্ত্র পড়ে ফেলেন, কিন্তু শাস্ত্রোক্ত বিধি অনুসারে কোনও সন্ধ্যাপূজাদি ক্রিয়া করেন না; সাধনা করেন না; সাধনা নহিলে সিদ্ধি হয় না। এর অবশ্যম্ভাবী ফল এই হয় যে ধর্ম্মের আদর্শে বিশ্বাস জন্মায় না। তোমার ঐ যন্ত্রাগারটীতে নিজের হাতে পরীক্ষা না ক'রে কেবল বৈজ্ঞানিক পুস্তক পড়লে আমার যেরূপ বিজ্ঞানের জ্ঞান হ'ত, ক্রিয়া না ক'রে কেবল শাস্ত্র পড়ে তোমাদেরও তেমনি ধর্ম্মের জ্ঞান হয় আর কি।"

আমি বলিলাম, "আসল কথাটা কি জান? শাস্ত্র যাঁরা লিখেছেন তাঁদের যুক্তিতর্ক আমাদের ইংরেজী রুচিতে আদবে ভাল লাগে না। তাঁদের কা'রও স্বাধীন চিন্তা দেখা যায় না—সবাই আগেকার ঋষিদের দোহাই দিয়ে লিখে যাচ্ছেন।"

আমাকে বাধা দিয়া একটু উত্তেজিত ভাবে রামনাথ বলিল, "দেখ ভাই, একথাগুলি তুমি ভাল করে না ভেবেই বলছ। প্রাচীন দর্শন ও স্মৃতিতে যথেষ্ট স্বাধীন চিন্তা দেখ্‌তে পাওয়া যায়, তবে হিন্দুর অধঃপতনের পর যে সকল শাস্ত্র লেখা হয়েছে তাতে মৌলিকতা খুব কম বটে—কিন্তু ভেবে দেখ তখন দেশের কি দুরবস্থা; সে সময়-কার লেখকেরা যে নিকৃষ্ট হবেন তাতে আর আশ্চর্য্য কি আছে? তাঁরা যে কোনো রকমে হিন্দুসমাজকে আর হিন্দুশাস্ত্রকে ধ্বংসের মুখ থেকে বাঁচিয়ে রাখতে পেরেছিলেন, তারই জন্য তাঁদের ধন্যবাদ দাও। আর তাঁদের যে স্বাধীনভাবে চিন্তা করিবার শক্তি একেবারে ছিল না একথাও স্বীকার করতে পারি না। নৈয়ায়িকগণ সময়ে সময়ে নূতন মত স্থাপন করবার জন্য তর্ক করে যেতেন—ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্বন্ধেও বেশ তর্কযুদ্ধ চলিত। আর আজকালকার ইংরেজী-শিক্ষিত লোকে যে স্বাধীন চিন্তার এত বড়াই করেন, আমি ত দেখি তাঁরা ইংরেজ লেখকের বুলি আওড়াইতে থাকেন মাত্র। রাগ করো না, এই তুমিই রুশো, মিল প্রভৃতি প'ড়ে বর্ণাশ্রমের উপর যেরূপ চটা ছিলে, সম্প্রতি নিৎসে, (Nietzsche) গ্যাল্টন প্রভৃতি প'ড়ে সে ভাবটা ছেড়ে দিয়েছ। কিন্তু যথেষ্ট অবসর সত্ত্বেও স্বাধীনভাবে নিজে তুমি কি চিন্তা করেছ?"

তর্কে পরাস্ত হইয়া আমি কথা বদলাইয়া ফেলিলাম। বলি-লাম, "দেখ, তুমি ত মনুসংহিতার অত প্রশংসা কর, আমি ত দেখি, মনু শূদ্রদের অত্যন্ত হীন অবস্থায় রেখে দিতে চান। আর রঘু-নন্দনের মতে ত কায়স্থরা শূদ্র। তাহ'লে বলতে হবে মনু আমা-দের পূর্ব্বপুরুষদের উপর অত্যন্ত অবিচার করেছিলেন।"

উত্তেজিত ভাবে রামনাথ বলিল, "এই শূদ্র কথাটার অর্থ লয়ে মহা অনর্থের সৃষ্টি হয়েছে। মহর্ষি মনুর মতে শূদ্ররা অনার্য্য ছিল, কিন্তু স্মার্ত্ত রঘুনন্দনের মতে দেখি যাঁরা ব্রাহ্মণ নন তাঁরাই শূদ্র। আসল কথা হচ্ছে এই যে মনুর বহুকাল পরে কায়স্থ বৈদ্য প্রভৃতি

জাতির উৎপত্তি হয়—এঁরা যে মূলতঃ আর্য্য সে বিষয়ে আমার কোনও সন্দেহ নাই।"

শেষে আমি বলিলাম, "একটা কথা জানবার বড় ইচ্ছা হচ্ছে, কিছু মনে করো না। আচ্ছা, তুমি নিজে কোনো প্রমাণ পেয়েছ যে ঈশ্বর আছেন ?

রামনাথ একটু চুপ করিয়া থাকিয়া বলিতে লাগিল, "আর কেউ একথা জিজ্ঞাসা করলে আমি উত্তর দিতাম না, কিন্তু তুমি আমায় ভালবাস, তোমাকে বলতে পারি। আমি অজ্ঞ ব্রাহ্মণ, ধ্যানধারণার কিছুই জানি না। ঈশ্বর আছেন কি না এ প্রশ্নের উত্তর দিবার স্পর্দ্ধা আমার নাই। তবে আমি সাধ্যমত শাস্ত্রের উপদেশ পালন করিতে চেষ্টা করি, আর তাতে আছি ভাল। আমার শরীর সুস্থ, বুদ্ধি সতেজ, হৃদয়ে মাঝে মাঝে ধর্ম্মভাবের আবির্ভাব হয়। আহ্নিক করবার সময় মাঝে মাঝে মনে হয় যেন জগন্মাতা এ অধম সন্তা-নের প্রতি করুণানয়নে চাইছেন। বলতে পারি না সেটা আমার মনের ভুল কি না। যাই হোক ভাই, দিন দিন আমার এই বিশ্বাস বাড়ছে যে ঋষিরা শাস্ত্রে মিথ্যা কথা লিখে যান নাই।"

রামনাথের নয়নকোণে অশ্রুবিন্দু দেখিয়া আমার আর বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল না।

(৩)

কয়েক দিন পরে আমার জেঠা মশায়ের শ্রাদ্ধ উপলক্ষে খুব ধূমধাম হয়। শ্রাদ্ধে অঙ্গ বঙ্গ কলিঙ্গ, কাশী কাঞ্চী দ্রাবিড় প্রভৃতি বহুস্থান হইতে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ নিমন্ত্রিত হইয়া আসিয়া মোটা মোটা বিদায় গ্রহণ করেন। উঠানে কাপড় পাতিয়া লক্ষ ব্রাহ্মণের পদধূলি সংগ্রহ করা হইল এবং জেঠাইমা সেই অমূল্য বস্ত্রখণ্ডটী সযত্নে তুলিয়া রাখিলেন।

শ্রাদ্ধের কয়দিন আমাকে রাজবাটীতে (জেঠামশাই সরকার

হইতে রাজা খেতাব পাইয়াছিলেন) ব্যস্ত থাকিতে হইয়াছিল। বাড়ী আসিয়া একদিন মধ্যাহ্নে ইজি চেয়ারে বসিয়া সিগারেটের ধূম পান করিতেছি, এমন সময় চটীর সেই পরিচিত ফট্‌ফট্‌ শব্দের সঙ্গে রামনাথের জামাহীন কমনীয় গৌরাঙ্গ মূর্ত্তি আসিয়া সম্মুখে উপস্থিত হইল। দেখিবামাত্র আমি বিস্ময়সহকারে বলিয়া উঠিলাম, "হাঁহে, রামনাথ, তোমায় রাজবাড়ীতে শ্রাদ্ধে দেখলাম না কেন? তোমার কি হয়েছিল?"

ঈষৎ হাসিয়া, একখানি চেয়ারে বসিতে বসিতে, রামনাথ বলিল, "সে একটা বিশেষ কারণ বশতঃ আমি গিয়ে উঠতে পারি নাই।" কারণটা যে কি তাহা সে কিছুতেই বলিতে চাহে না। শেষ আমি অভিমান করিয়া বলিলাম, "আমায় বল্‌বে না, বটে? এই বুঝি তুমি আমায় ভালবাস?"

আবার তাহার সেই মনোমোহন হাসি হাসিয়া রামনাথ বলিল, "তবে নিতান্তই শুন্‌বে? বহুদিন হ'তে আমি মনে মনে একটি প্রতিজ্ঞা করেছি যে কাকেও আমি পাদোদক বা পদধূলি দিব না বা কাকেও আমার পা স্পর্শ করতে দিব না। কারণ আমি জানি আমি ব্রাহ্মণ কুলের কলঙ্কস্বরূপ, আমি কিছুতেই লোকের অতটা ভক্তি গ্রহণ করতে পারি না—কর্‌লে আমার আরও অধোগতি হবে। যখনই শুন্‌লাম স্বর্গীয় রাজার শ্রাদ্ধে ব্রাহ্মণের পদধূলি কুড়ান হবে, তখনই আমি স্থির করলাম আমার সেখানে যাওয়া হবে না।"

আমার হাত হইতে সিগারেটটি পড়িয়া গেল, আমি হঠাৎ দাঁড়াইয়া উঠিলাম এবং তাহাকে আলিঙ্গন করিয়া বলিলাম, "রামনাথ, আমি কোন ব্রাহ্মণকে প্রণাম করি না, আমি তোমাকেও কখনো প্রণাম করি নাই—কিন্তু আজ থেকে তোমায় প্রণাম করব! আজ থেকে তুমি আমার গুরু! আর কাউকে না দাও তোমায় সত্যেনকে আজ থেকে পদধূলি দিতেই হবে।"

শ্রীসতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

দুখের হরি

জানিগো হরি তোমার রীতি
দুঃখে তাই ডরিনা,
ভবের সুখ—তোমার হেলা
তাহারে যেন বরি না।
দলিয়ে তুমি পালন কর'
জ্বলায়ে তুমি কলুষ হর'
ঠেলিয়া তুমি সরা'য়ে দিয়ে বিপদে রাখ বাঁচায়ে
পীড়িয়া তুমি পাড়াও ঘুম,
দংশি' তুমি খাও যে চুম,
বক্ষে চাপি দাও যে দোল, আদর তুলে কাঁপায়ে
বিঁধিয়া তাহে করুণা ঢালো,
ঘরষি চিত জ্বাল গো আলো,
বিদরি বুকে বিতর' জ্ঞান, এরীতি তব ভুবনে
আঘাতে তুমি জাগাও প্রভু
চোখের পাতা টানিয়া কভু,
মারিয়া তুমি বাঁচাও হরি মরণহীন জীবনে।
বুঝেছি হরি তোমার রীতি
তোমার রাগ বিরাগে,
দুখেরে ডরি হারাতে নাহি
চাহি গো তব সোহাগে।

শ্রীকালীদাস রায়।

শ্রীশ্রীকৃষ্ণ-তত্ত্ব

[১৫]

[আষাঢ়ের নারায়ণের ৮৪১ পৃষ্ঠার অনুবৃত্তি]

ভগবদ্গীতায় কৃষ্ণ-জিজ্ঞাসা

(১০)

জীব-প্রকৃতি ও ভগবান।

গীতায় ভগবান তাঁর জীবাখ্যা পরাপ্রকৃতির মূল লক্ষণ নির্দ্দেশ করিতে যাইয়া বলিয়াছেন যে এই জীবপ্রকৃতির দ্বারাই তিনি এই জগত ধারণ করিয়া আছেন। এই জগৎ বলিতে আমরা রূপ-রসাদির সমষ্টি বুঝি। রূপরসাদি আমাদের ইন্দ্রিয়ানুভূতির সঙ্গে অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধে আবদ্ধ। চক্ষু বা দর্শন-শক্তি না থাকিলে রূপের জ্ঞান, এবং জ্ঞান না থাকিলে, তার প্রকাশ ও প্রতিষ্ঠা অসম্ভব হয়। সেইরূপ শ্রবণ বা শ্রুতিশক্তি না থাকিলে শব্দের, আঘ্রাণ-শক্তি না থাকিলে গন্ধের,—এই সকল ইন্দ্রিয়ের শক্তি না থাকিলে, এই বিষয়-রাজ্যের কোনও জ্ঞান, এবং এই জ্ঞান না থাকিলে, ইহার কোনও প্রকাশ ও প্রতিষ্ঠা থাকে না। সুতরাং যে-জীবের দ্বারা ভগবান এই জগৎ ধারণ করিয়া আছেন, আমাদের ইন্দ্রিয়-শক্তির অনুরূপ শক্তি তাহার অবশ্যই আছে; না থাকিলে, তাহার দ্বারা জগৎ-ধারণ কার্য্য কখনই সম্ভব হইতে পারে না। আমাদের স্থূল ইন্দ্রিয়ের মতন ভগবানের এই জীবাখ্যা পরাপ্রকৃতিরও রক্তমাংসের উপাদানে নির্ম্মিত কোনও ইন্দ্রিয় আছে, এমন কথা বলি না। আমাদের এসকল ইন্দ্রিয়ের উপচয় ও অপচয় আছে; বৃদ্ধি ও ক্ষয়, বিকাশ ও পরিণাম আছে। ভগবানের জীবাখ্যা

পরাপ্রকৃতির পক্ষে এই উপচয়-অপচয়-ধর্ম্মশীল, এই বিকাশ ও ক্ষয়ের অধীন কোনও ইন্দ্রিয় থাকা সম্ভব নহে। কারণ, এসকলের দ্বারা পূর্ণ-জ্ঞানলাভ ত হয় না। কারণ, এসকল ইন্দ্রিয়ের পটুতা-অপটুতা আছে। এই অপটুতা নিবন্ধন বিষয়-জ্ঞানের ব্যাঘাত জন্মে। এইরূপ ইন্দ্রিয়ের দ্বারা কোনও নিত্য বস্তুকে নিত্যকাল ধরিয়া রাখা যায় না। আমাদের ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে তাহাদের বিষয়ের যোগ কখন থাকে কখন থাকে না। ভগবানের জীবাখ্যা পরাপ্রকৃতির ইন্দ্রিয়শক্তির সম্বন্ধে ত এরূপ কল্পনা করা সম্ভব নহে। কারণ তাহার এসকল শক্তি যদি হ্রাসবৃদ্ধির, প্রকাশ-অপ্রকাশের অধীন হয়, তাহা হইলে জগতের কোনও স্থায়ীত্ব থাকে না। তাহা হইলে এই জগৎ-প্রবাহের অবিরামত্ব থাকে না। এই প্রবাহ যে পরিণামী হইয়াও নিত্য, এমন কথা ত তখন বলা সম্ভব হয় না। আর এই প্রবাহ যদি নিত্য না হয়, তাহা হইলে কাল এবং আকাশ লয় প্রাপ্ত হয়। কারণ ঘটনা-পারম্পর্য্য ব্যতীত কালের প্রতিষ্ঠা থাকে না। আর এক অখণ্ড ও অবিভাজ্য দেশ ব্যতীত আকাশের জ্ঞান এবং সত্তাও থাকে না। এই দেশকালের আশ্রয়েই জগতের প্রবাহও প্রতিষ্ঠিত। এই অখণ্ড, অবিভাজ্য, অনাদ্যনন্ত দেশ ও কালকে আশ্রয় করিয়াই জগতের প্রবাহ নিয়ত চলিতেছে এবং আপনার এই প্রবাহের তরঙ্গভঙ্গের দ্বারাই এই অখণ্ড, অবিভাজ্য এবং অনন্ত দেশ ও কাল অনন্তভাবে বিভক্ত হইয়া দেখাইতেছে। এই জগৎ-প্রবাহের সঙ্গে অনন্ত দেশ-কালের সম্বন্ধ অতি ঘনিষ্ঠ। এ সম্বন্ধ নিত্য। এই সম্বন্ধেতেই দেশ এবং কালের প্রকাশ ও প্রতিষ্ঠা। এই সম্বন্ধ অঙ্গাঙ্গী বা organic, অনন্ত দেশ ও কালকে ছাড়িয়া জগৎ-প্রবাহের অস্তিত্ব অসম্ভব হয়, আবার এই জগৎ-প্রবাহকে ছাড়িয়া দেশ এবং কালেরও কোনও সত্তা থাকে না। ইহারা ছায়াতপের মতন নিত্যযুক্ত হইয়া রহিয়াছে। এই জগৎ-প্রবাহই অনন্ত দেশ-কালকে বিবিধ সম্বন্ধেতে আবদ্ধ করিয়া সীমাবদ্ধ করিতেছে;

যাহা প্রকৃতপক্ষে অবিভাজ্য, তাহাকে খণ্ড খণ্ড করিয়া দেখাইতেছে। অসীম কখনও সীমাবদ্ধ হইতে পারে না, অবিভাজ্য বস্তুকে কখনও ভাগ করা যায় না। অথচ অনন্ত ও অবিভাজ্য দেশকালকে এই জগৎ-প্রবাহের মধ্য দিয়া আমরা নিয়তই সীমাবদ্ধ ও খণ্ড খণ্ড করিয়া দেখিতেছি। যাহাকে আশ্রয় করিয়া এই প্রবাহ চলিতেছে, ভগবানের সেই জীবাখ্যা পরাপ্রকৃতিই তবে এই অঘটন ঘটাইতেছেন। এই অঘটন-ঘটাইবার শক্তিকেই আমাদের প্রাচীন পরিভাষায় মায়া কহিয়াছেন। অতএব ভগবানের জীবাখ্যা পরাপ্রকৃতিতেই এই অঘটন-ঘটনপটীয়সী মায়াশক্তি নিহিত রহিয়াছে। এই মায়া ভগবানের এই পরাপ্রকৃতিরই ধর্ম্ম। ভগবানের জীবাখ্যা পরাপ্রকৃতির অন্তর্নিহিত এই অঘটন-ঘটনপটীয়সী শক্তিকেই শাস্ত্রে তাঁর বৈষ্ণবী মায়া কহিয়াছেন। ইহা ছাড়া ভগবানের এই বৈষ্ণবী মায়ার আর কোনও বোধগম্য অর্থ হয় না। তারপর, এই জগৎ-প্রবাহ যখন পরিণামী হইয়াও নিত্য, তখন যে-জ্ঞান বা চৈতন্য-বস্তু এই নিত্য প্রবাহকে ধরিয়া আছে, তাহাও নিত্য। এই প্রবাহ যখন অনাদি ও অনন্ত, তখন এই জ্ঞান বা চৈতন্য-বস্তুও অনাদ্যনন্ত। এই প্রবাহ যখন অখণ্ড, তখন যে-চৈতন্যে বা জ্ঞানেতে ইহার প্রতিষ্ঠা, তাহাও অখণ্ড হইবেই হইবে। অর্থাৎ ভগবান তাঁহার যে-জীবাখ্যা পরাপ্রকৃতির দ্বারা এই বিশাল, এই অনাদ্যনন্ত, এই অবিরাম জগৎ-প্রবাহকে ধারণ করিয়া আছেন, সেই জীব-প্রকৃতি এক, অনাদি ও অনন্ত। ভগবান আপনি যেমন এক, এই জীব-প্রকৃতিও সেইরূপ এক। ভগবান আপনি যেমন অনাদি ও অনন্ত, তাঁর এই জীব-প্রকৃতিও সেইরূপ অনাদ্যনন্ত। ভগবান আপনি যেমন নিত্যবুদ্ধ, এই জীব-প্রকৃতিও সেইরূপ নিত্যবুদ্ধ, ইহার জ্ঞানেতে কোনও প্রকারের আচ্ছাদন বা বিক্ষেপ নাই ও সম্ভবে না। কারণ এই জীবের জ্ঞানের বিচ্ছেদে, জগৎ-প্রবাহের অবিরামগতি সম্ভব হয় না। এই জ্ঞান-সূত্র ছিন্ন হইলে, জগৎপ্রবাহ থামিয়া যায়, ব্রহ্মাণ্ড লয়প্রাপ্ত হয়।

অতএব গীতায় ভগবান তাঁর যে-জীবাখ্যা পরাপ্রকৃতির কথা কহিয়াছেন তাহার এই কয়টি লক্ষণ নির্দ্ধারিত হয়—

(১) তাহা চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের শক্তিসম্পন্ন অথচ এসকল জড়-ইন্দ্রিয়-যন্ত্র-বিহীন।

(২) তাহা নিত্য-বুদ্ধ বা অখণ্ড-চৈতন্য-সম্পন্ন।

(৩) তাহা এক ও সর্ব্বপ্রকারের দ্বৈত-শূন্য।

(৪) তাহা অনাদি ও অনন্ত।

(৫) তাহা অঘটন-ঘটনপটীয়সী মায়াশক্তি-সম্পন্ন।

(৬) তাহা জগদ্বীজরূপী। অর্থাৎ, এই জীব-প্রকৃতি কেবল যে জগৎ ধারণ করিয়া আছে তাহা নহে, কিন্তু জগৎ-প্রবাহকে প্রবর্ত্তিতও করিতেছে।

ভগবান আপনি যেমন সর্ব্বেন্দ্রিয় বিবর্জ্জিত হইয়াও সর্ব্বেন্দ্রিয়-গুণা-ভাস-সম্পন্ন, এই জীবও সেইরূপ। ভগবান যেমন অখণ্ড চৈতন্য-বস্তু, অদ্বৈত-জ্ঞানবস্তু, অনাদি ও অনন্ত, অঘটন-ঘটনপটীয়সী মায়াশক্তির অধীশ্বর, তিনি যেমন এই জগতের সৃষ্টি করিয়া তাহাকে ধারণ করিয়া রহিয়াছেন, তাঁর জীবাখ্যা পরাপ্রকৃতিও সেই সকল লক্ষণাক্রান্ত ও সেই কর্ম্মই করিতেছে। প্রশ্ন হয়—তবে এই জীবাখ্যা পরাপ্রকৃতিতে আর ভগবানেতে প্রভেদ কি ও কোথায়?

প্রভেদ এই যে ভগবান স্ব-তন্ত্র, এই জীবপ্রকৃতির স্বাতন্ত্র্য নাই; ইহা ভগবানের অধীন। এই জন্যই ভগবান বলিতেছেন যে এই জীবাখ্যা পরাপ্রকৃতির দ্বারাই তিনি জগৎ ধারণ করিয়া আছেন।

"যয়েদং ধার্য্যতে জগৎ।"

যাহার দ্বারা—আমা-কর্ত্তৃক—এই জগৎ ধৃত হইয়া রহিয়াছে তাহাই আমার পরাপ্রকৃতি। তারই নাম জীব। আর এখানে "আমা-কর্ত্তৃক"—"ময়া"—এই শব্দের দ্বারা জীবের স্বতন্ত্র কর্তৃত্ব বারিত হইয়া ভগবানের কর্ত্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। অর্থাৎ জগৎ-

ধারণ-কার্য্যের কর্ত্তা জীব নহে, কিন্তু ভগবান স্বয়ং, জীব তাঁর এই কার্য্যের সহায়, অবলম্বন বা যন্ত্রমাত্র। কিন্তু যন্ত্র আর যন্ত্রী বলিলেও ভগবানের সম্পূর্ণ স্বাতন্ত্র্য বাধা প্রাপ্ত হয়। কারণ আমাদের অভিজ্ঞতাতে যন্ত্র যেমন যন্ত্রীর অধীন, যন্ত্রীও সেইরূপ তাঁর নিজের যন্ত্রের অধীন হইয়া থাকেন; তিনি যেমন যন্ত্রকে চালান, যন্ত্রও সেইরূপ তাঁহার কর্ম্মকে নিয়ন্ত্রিত করে, ইহা সর্ব্বদা এবং সর্ব্বত্রই দেখিতে পাই। আমাদের অভিজ্ঞতাতে যন্ত্র যন্ত্রী হইতে ভিন্ন ও স্বতন্ত্র বলিয়াই ইহারা এরূপভাবে পরস্পরকে নিয়ন্ত্রিত করে, অর্থাৎ উভয়ের কেহই সম্পূর্ণ স্ব-তন্ত্র নহেন। কিন্তু জীবেতে আর ভগবানেতে এরূপ স্ব-তন্ত্র-ভেদ কল্পিত হয় নাই। জীব ভগবানের সম্পূর্ণ অধীন, ভগবানের নিজের সত্তার অঙ্গীভূত। এইজন্যই এই জীবের মধ্যে চৈতন্যাদি ভগবৎ-লক্ষণ প্রকাশিত হইয়াছে। জীব আর ভগবানের মধ্যে স্ব তন্ত্র ভেদ নাই, স্ব-গত ভেদ মাত্র আছে। শক্তি আর শক্তিমানেতে যেমন স্ব-তন্ত্র-ভেদ নাই, শক্তিমানকে ছাড়িয়া, তাঁহা হইতে পৃথকভাবে যেমন কোথাও শক্তির প্রতিষ্ঠা হয় না, অথচ শক্তি এবং শক্তিমান ঠিক এক নহে, ইহাদের মধ্যে একটা ভেদ আছে। জীব-ভগবান সম্বন্ধেও তাহাই। শক্তি আর শক্তিমানেতে স্ব-তন্ত্র-ভেদ নাই, স্ব-গত ভেদ আছে। এইরূপেই ভগবানের সঙ্গে তাঁর জীবাখ্যা পরা-প্রকৃতির অভেদের মধ্যেই যে ভেদ, একত্বের মধ্যেই যে দ্বৈত আছে, ইহা বুঝিতে হইবে। জগৎধারণ-কার্য্যে জীব ভগবানের যন্ত্র বটে, কিন্তু ইহা এমন যন্ত্র যাহা যন্ত্রীর দ্বারা ব্যবহৃত হয়, কিন্তু ঘুণাক্ষরেও যন্ত্রীকে আপনার অধীন করিতে বা আপনার শক্তি বা প্রকৃতির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত করিতে পারে না। কারণ এক্ষেত্রে যন্ত্রী আর যন্ত্রের মধ্যে কোনও স্ব-তন্ত্র ত ভেদ নাই, কেবল স্ব-গত ভেদই আছে।

ভগবান কহিতেছেন যে এই জীবাখ্যা পরাপ্রকৃতির দ্বারাই তিনি জগৎ ধারণ করিয়া আছেন। এই জগৎ-ধারণ ব্যাপারে জীব আর জগতের মধ্যে একটা সম্বন্ধের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। দেখিয়াছি যে দ্রষ্টা ছাড়া

দৃষ্টবস্তুর বা রূপের প্রামাণ্য নাই। শ্রোতা ছাড়া শ্রুতবস্তুর বা শব্দের প্রামাণ্য নাই। দর্শন-শ্রবণাদি ছাড়া রূপরসগন্ধময় জগতের প্রামাণ্য নাই। জীব দ্রষ্টা শ্রোতা প্রভৃতি, জগৎ তার দৃষ্ট শ্রুত প্রভৃতি। এই ভাবে জীব এবং জগতের মধ্যে একটা অতি ঘনিষ্ঠ, অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধের প্রতিষ্ঠা হইয়া, ইহাদিগকে বাঁধিয়া রাখিয়াছে। জীব ছাড়া জগৎ থাকে না, জগৎ ছাড়াও ত জীব থাকে না। জীব ও জগৎ ইহাদের কেহই স্ব-তন্ত্র ও স্বাধীন নহে; ইহারা পরস্পরের অপেক্ষা রাখে। এই দ্বৈত-সম্বন্ধকে ধরিয়া আছে কে? গীতায় ভগবান কহিতেছেন—আমি। আমার দ্বারাই, এই জীবের আশ্রয়ে এই জগৎ ধৃত হইয়া আছে।

ধারণ-কার্য্যেতে একজন ধারয়িতা ও একটা ধৃত বস্তু থাকে। ধারক ও ধৃত এই দুই না হইলে ধারণ সম্ভব হয় না। এই দুইএর মধ্যে একটা সম্বন্ধ বা যোগ স্থাপিত হইয়াই ধারণ সম্ভব হইয়া থাকে। ফলতঃ যেখানেই কোনও কর্ম্মের প্রতিষ্ঠা হয়, সেই-খানেই এই সম্বন্ধ বা relation গড়িয়া উঠে। আমার এই লেখাটা একটা কর্ম্ম। এই লেখার বা প্রবন্ধের উপকরণ ভাব ও ভাষা। ভাব ও ভাষার মধ্যে একটা যোগ স্থাপিত হইয়াই এই প্রবন্ধ রচিত হই তেছে। যোগ বলিলেই একটা যোগসূত্রের প্রয়োজন হয়। আমার প্রবন্ধের ভাব ও ভাষার যোগের যোগ-সূত্র কি? না, আমার মন বা বুদ্ধি। আর যোগ-সূত্রমাত্রেই যে সকল বস্তুকে পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত করিয়া থাকে, তাহাদের প্রত্যেকটিকে যুগপৎ অধিকার করে ও অতিক্রম করিয়া যায়। এই প্রবন্ধ-রচনায় আমার মন বা বুদ্ধি, আমার জ্ঞান বা অনুভূতি,—একদিকে ভাব ও অন্যদিকে ভাষাকে অধিকার করিয়া আছে। ভাব আমার মনেতে আছে, আমার জ্ঞানেতে প্রকাশিত ও প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। ভাষাও আমার সেই মনেতে বা জ্ঞানেতেই সঞ্চিত আছে। আমার মন বা জ্ঞান এই দুই বস্তুকে ধরিয়া রাখিয়াছে। ভাবকে ধরিয়া, ভাবকে আবার অতি-

ক্রম করিয়া, আমাকে ধরিয়াছে; তাহাকে ধরিয়া, আবার তাহাকে ছাড়াইয়া গিয়া, তাহাকে অধিকার করিয়া রহিয়াছে। আকাশে যেমন আয়তনবিশিষ্ট পদার্থসমূহ বিধৃত হইয়া থাকে, সেইরূপ আমার মনেতে বা জ্ঞানেতে এই প্রবন্ধের ভাব ও ভাষা উভয়ই বিধৃত হইয়া আছে। আকাশ যেমন প্রত্যেক আয়তনবিশিষ্ট বস্তুকে ধরিয়া, তাহাতে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া, যুগপৎ তাহাকে অতিক্রম করিয়া আছে; আমার মন বা জ্ঞান সেইরূপ এই প্রবন্ধের ভাব ও ভাষাতে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া তদুভয়কে ছাড়াইয়া আছে। যেখানেই একাধিক বস্তুর মধ্যে কোনও সম্বন্ধের প্রতিষ্ঠা হয়, সেইখানেই এই সম্বন্ধের একটা যোগসূত্র থাকে। আর প্রত্যেক সম্বন্ধের এই যোগসূত্র সেই সম্বন্ধের প্রত্যেক অঙ্গকে ধরিয়া, প্রত্যেক অঙ্গেতে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া, যুগপৎ সেই সকল ভিন্ন ভিন্ন অঙ্গকে ও তাহাদের সমষ্টিকে অতিক্রম করিয়া থাকে। যে-সম্বন্ধের আশ্রয়ে ভগবান এই জগৎ ধারণ করিয়া আছেন, তার একদিকে জীবপ্রকৃতি আর অপরদিকে এই জগৎ রহিয়াছে। জীব ও জগৎ একে অন্যের অপেক্ষা রাখে। ইহারা কেহই স্বতন্ত্র ও স্বাধীন নহে। আর ভগবান আপনি যোগসূত্র হইয়া এতদুভয়কে ধারণ করিয়া আছেন। জীব এবং জগৎ, এতদুভয়কে অধিকার করিয়া তিনি সর্ব্বদাই আবার ইহাদিগকে অতিক্রম করিয়া আছেন। জীবের যাহা কিছু জীবত্ব তাহা তাঁর মধ্যে স্থিতি করিতেছে। জগতের যাহা কিছু জগতত্ব তাহাও তাঁর মধ্যে স্থিতি করিতেছে। তিনি এতদুভয়ে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া, যুগপৎ আবার উভয়কে অতিক্রম করিয়া আছেন। এইজন্য ভগবান জীবও নহেন, জগৎও নহেন; অথচ তিনি ছাড়া জীব ও জগতে আর কোনও কিছুও নাই।

এই জীব ভগবানের পরা-প্রকৃতি। পরা-প্রকৃতি এইজন্য যে ভূমিরাদি অপরা-প্রকৃতি যেমন উপচয়-অপচয়-ধর্ম্মশীল, এই জীব সেরূপ নহে। ভূমিরাদির নিজের জ্ঞাতৃত্ব, ভোক্তৃত্ব, কর্ত্তৃত্বাদি চৈতন্য-

ধর্ম্ম নাই। ইহারা জ্ঞানের, ভোগের, কর্ম্মের বিষয়মাত্র। আমাদের মন বুদ্ধি এবং অহঙ্কারেরও প্রকৃতপক্ষে নিজেদের মধ্যে জ্ঞান-শক্তি নাই। মন বিষয়-সংযোগ ব্যতীত মনন করিতে পারে না,—বুদ্ধি এবং অহঙ্কারও এই বাহিরের বিষয়-জগতের ও এই সকল ইন্দ্রিয়ের সমবায়েতেই আপন আপন জ্ঞান-কার্য্য সাধন করে। বিষয় ও ইন্দ্রিয় না থাকিলে, মন জড়বৎ অচেতন হইয়া রহে। বিষয়, ইন্দ্রিয় ও মন না থাকিলে, বুদ্ধিও সেইরূপ আপনার ধারণ-কার্য্য সাধন করিতে পারে না। আবার এই যে অহঙ্কার বা ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য-বোধ, ইহাও বিষয় হইতে আরম্ভ করিয়া বুদ্ধি পর্য্যন্ত আমাদের সংসার-জীবনের যা-কিছু উপাদান ও উপকরণ আছে, তৎসমুদায়ের অধীন। মন বিষয়ের অপেক্ষা রাখে, কিন্তু বিষয়কে সৃষ্টি করে না। বুদ্ধিও এইরূপ কোনও কিছুর সৃষ্টি করে না। অহঙ্কারেরও এই সৃষ্টি-শক্তি নাই। জীব-প্রকৃতিই ভূমিরাদি হইতে আরম্ভ করিয়া অহঙ্কার পর্য্যন্ত এই বিশাল ও জটিল সম্বন্ধ-জালকে ধরিয়া রাখিয়াছে, এই সৃষ্টি-ব্যাপারের সঙ্গে কেবল তাহারই সম্বন্ধ আছে। দেখিয়াছি যে এই জীবপ্রকৃতিই জগদ্বীজ। ইহা হইতেই এই জগৎ উৎপন্ন হইয়াছে। এই জগৎ-প্রবাহকে ধারণ করিয়া আছে বলিয়াই এই জীবাখ্যা পরাপ্রকৃতি এই প্রবাহের অতীত রহিয়াছে—ইহাতে অনুপ্রবিষ্ট হইয়াও ইহাকে অতিক্রম করিয়া আছে। এই জগদ্বীজ রূপেই এই জীবপ্রকৃতি সৃষ্টিমূলে আছে। ইহাই জগৎ প্রসব করিতেছে; কিন্তু করিতেছে আপনার শক্তিতে নয়, ভগবানের প্রেরণায়।

ময়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতিঃ সূয়তে সচরাচরম্।

"আমা কর্ত্তৃক অধিষ্ঠিত হইয়া প্রকৃতি এই চরাচর ব্রহ্মাণ্ড প্রসব করিতেছে।" কিন্তু সৃষ্টি ত একটা কর্ম্ম। আর কর্ম্ম মাত্রেই কর্ত্তৃ-কর্ম্ম সম্বন্ধের প্রতিষ্ঠা করে। এই সম্বন্ধের জন্য এমন কোনও তত্ত্বের বা বস্তুর প্রয়োজন হয়, যাহা কর্ত্তাতেও আছে, আবার তাঁর কর্ম্মেতেও আছে—যাহা কর্ত্তা ও তাঁর কর্ম্ম উভয়কে ধারণ ও একে

অন্যের সঙ্গে যুক্ত করিয়া রাখিয়াছে ও রাখিতেছে। সৃষ্টি-কার্য্যে জীবাখ্যা পরা-প্রকৃতি কর্ত্তা, জগৎ কর্ম্ম; আর যে তত্ত্ব বা বস্তু এই কর্ত্তা ও তার কর্ম্মকে ধারণ করিয়া আছে—সেই তত্ত্ব, সেই বস্তু, সেই "যাহা"—ভগবান স্বয়ং।

প্রশ্ন উঠিতে পারে—অমন ঘুরাইয়া ফিরাইয়া ভগবানকে এই সৃষ্টি-কার্য্যের সঙ্গে যুক্ত করিবার চেষ্টা কর কেন? সোজাসুজি বলিলেই ত হয়—ভগবানই জগতের স্রষ্টা। কিন্তু অত সোজাসুজি এ সকল গভীর ও জটিল জিজ্ঞাসার নিবৃত্তি হয় না। সৃষ্টি-ব্যাপার একটা কর্ম্ম। কর্ম্ম মাত্রেই কর্ত্তাতে পরিবর্ত্তন বা পরিণাম আনয়ন করে। কর্ম্মের পূর্ব্বে কর্ত্তার যে অবস্থা থাকে, কর্ম্মের পরে তাহার অন্যথা ঘটিবেই ঘটিবে। কিন্তু নিত্য-তত্ত্ব ভগবানেতে এরূপ পরিবর্ত্তন ত ঘটিতে পারে না। এই জন্যই আমাদের প্রাচীন শাস্ত্র ও সাধনা ভগবান স্বয়ং জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন একথা বলিতে এত কুণ্ঠিত হয়। এই হেতুই এই প্রকৃতি-তত্ত্বের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। ভগবান সৃষ্টি করেন না, প্রকৃতিই তাঁর অধিষ্ঠানেতে এই নিখিল ব্রহ্মাণ্ড প্রসব করিতেছে। প্রকৃতি সৃষ্টি-ব্যাপারের কর্ত্তা, সৃষ্টি তারই কার্য্য, আর ভগবান এই কর্ত্তা ও কর্ম্ম উভয়কে ধারণ করিয়া, একই সঙ্গে আবার উভয়কে অতিক্রম করিয়া রহিয়াছেন।

ভগবান প্রকৃতি ও তাহার সৃষ্টি—উভয়েরই মধ্যে রহিয়াছেন। এই সৃষ্টি সত্ত্ব রজঃ তমঃ এই তিন গুণের উপাদানে রচিত। এই ত্রিগুণের সংযোজন-বিয়োজন এবং বিমিশ্রণেই এই সৃষ্টির অভিব্যক্তি। এইজন্য এই সৃষ্টিকে ত্রিগুণাত্মিকা বলে। ভগবান এই সৃষ্টিতে পরিব্যাপ্ত, অনুপ্রবিষ্ট হইয়া আছেন বলিয়া সগুণ—এখানে তিনি এসকল গুণের সঙ্গে, গুণের মধ্যে প্রকাশিত। আবার প্রকৃতি ও তাহার সৃষ্টি এই উভয়ের সম্বন্ধ-সূত্র বা যোগ-সূত্র বলিয়া, ভগবান এই ত্রিগুণাত্মিকা সৃষ্টির অতীতও বটেন। এইজন্য—সৃষ্টির ও সৃষ্টিমূল প্রকৃতির উভয়ের অতীত বলিয়া—তিনি নির্গুণ। যখন তিনি প্রকৃতির

মধ্যে তখনই প্রকৃতির অতীতে, যখন সৃষ্টির মধ্যে তখন আবার সৃষ্টির অতীতে। তিনি একই সঙ্গে সৃষ্টি ও প্রকৃতির মধ্যে ও তদুভয়ের অতীতে আছেন। অতএব তিনি যখন সগুণ তখনই আবার নির্গুণ; যখন নির্গুণ তখনই আবার সগুণ। তিনি সগুণ হইয়া গুণের অতীত, নির্গুণ হইয়াও সর্ব্বগুণসমন্বিত। একদিকে তিনি যেমন সগুণ নহেন, সেইরূপ নির্গুণও নহেন। এক সময়ে বা এক অবস্থাতে সগুণ, অন্য সময়ে বা অন্য অবস্থাতে নির্গুণ—এরূপও নহেন। এরূপ হইলে নির্গুণ, অর্থাৎ সৃষ্টির অতীতে যখন থাকেন, তখন এই সৃষ্টি-প্রবাহকে রক্ষা করে কে? অন্য পক্ষে, যদি তিনি সৃষ্টির মধ্যেই আবদ্ধ থাকেন, তাহা হইলে জগতের বিচিত্র ব্যষ্টিত্বের মধ্যে যে সাকল্য, বহুত্বের মধ্যে যে একত্ব অপরিহার্য্য হইয়া আছে, যে সাকল্য এবং একত্ব ব্যতীত এই জগৎ-বৈচিত্র্যের কোনও জ্ঞান সম্ভব হয় না, সেই সম্বন্ধেরই সূত্র থাকে কৈ? আবার তাঁহাকে সগুণ-ও-নির্গুণ—সগুণ + নির্গুণ—এমনও বলিতে পারি না। কারণ এই দ্বন্দ্ব ত একটা সমাস বা সম্বন্ধ। এই সম্বন্ধের দুইটি অঙ্গ, এক সগুণ অপর নির্গুণ। এই দুই অঙ্গের প্রতিষ্ঠার জন্য ত এক তৃতীয় বস্তুর প্রয়োজন হয়, যে-বস্তু অঙ্গীরূপে ইহাদের ধারণ করিয়া আছে। অতএব সেই বস্তুকে যেমন কোনও অঙ্গ বিশেষ বলিয়া ধরিতে পারি না, সেইরূপ সকল অঙ্গের সমষ্টিও বলিতে ত পারি না। কারণ তাহা যে অদ্বৈত ও অবিভাজ্য। তাহা পরিপূর্ণরূপে প্রত্যেক অঙ্গবিশেষে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া আবার প্রত্যেক অঙ্গকে অতিক্রম করিয়া রহে। আমাদের প্রত্যক্ষ অনুভূতির দ্বারা, আমাদের মধ্যে যে চৈতন্য-বস্তু বা প্রাণ-বস্তু আছে, তাহার উপমায় অতি সহজেই আমরা এই নিগূঢ় রহস্য ভেদ করিতে পারি। আমাদের এই প্রাণ এই দেহের সর্ব্বত্র পরি-ব্যাপ্ত হইয়া আছে, চক্ষুকর্ণাদি প্রত্যেক ইন্দ্রিয়কে অনুপ্রাণিত করিয়া দর্শনশ্রবণাদি সম্ভব করিতেছে। এই সঙ্গে আমরা রূপের ও গন্ধের অনুভবলাভ করিতেছি। অথচ এই প্রাণশক্তিকে ত খণ্ড খণ্ড করিতে

পারি না। চক্ষের মধ্যে যেমন এই প্রাণ পূর্ণ, কর্ণেতেও সেইরূপ, নাসিকাতে যেমন, সমগ্র দেহে সেইরূপ। অতএব এই প্রাণ আমাদের শরীরের প্রতি অণুতে অনুপ্রবিষ্ট হইয়াও যুগপৎ তাহা-দিগকে অতিক্রম করিয়া আছে। ভগবৎ-সত্তাও সেইরূপ জগতের প্রত্যেক অণুতে অনুপ্রবিষ্ট হইয়াই আবার যুগপৎ ইহাদিগকে অতি-ক্রম করিয়া আছে। এই জন্য ভগবানকে সগুণ এবং নির্গুণ বা সগুণ+নির্গুণ বলিতে পারা যায় না। ভগবৎ-তত্ত্ব সগুণ ও নির্গুণ উভয় তত্ত্বকে অধিকার করিয়া; উভয়েতে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া, উভয়কে ধারণ ও সম্ভব করিয়া, উভয়কে ছাড়াইয়া, উভয়ের অতীতে আছে। এই জন্যই ইহা পূর্ণ তত্ত্ব, পরম-তত্ত্ব বা চরম-তত্ত্ব। ইহাতে সকল জিজ্ঞাসার নিঃশেষ নিবৃত্তি হয়। এই পূর্ণতত্ত্বকেই গীতায় পুরুষোত্তম কহিয়াছেন।

শ্রীবিপিনচন্দ্র পাল।

লীলা-চতুর্থী

[ঝুলন, রাস, দোল, রথ]

শৈশবে জীবনে মোর ঝুলন দোলায়
তুলিয়া ছড়ালে ফুলরাশি,
ভুলায়ে রাখিয়া গেলে খেলায় লীলায়
প্রাণকুঞ্জে বাজাইয়া বাঁশী।
যৌবনে সে রাসলীলা, রসরাজ নট
এ জীবনে ফিরিলে চঞ্চল,
হৃদিকুঞ্জে ধরিবারে নারিনু কপট,
যুগল মুরতি অচপল।
জীবনের অপরাহ্নে ত্রিবঙ্কিম সাজে
দেখা দিবে সেও মিছে আশা,
দ্বন্দ্ব দ্বিধা সংশয়ের দোললীলা মাঝে
ফাগে দৃষ্টি হবে ভাসা ভাসা।
তবুও ভরসা আছে একদিন তুমি,
স্থির হবে জীবনের রথে,
যেদিন ছাড়িতে হবে ভব-ব্রজভূমি,
অন্তহীন অজানার পথে।
গর্জ্জিবে আষাঢ় বজ্র দ্যুলোকে ভূলোকে
তমসায় হবে একাকার
আমার জীবন-রথ বিদ্যুৎ আলোকে
লয়ে তোমা যাবে পরপার।

শ্রীকালীদাস রায়।

নারায়ণ

য় বর্ষ, ২য় খণ্ড, পঞ্চম সংখ্যা] [আশ্বিন, ১৩২৩ সাল

অবতার-কথা

ইংরাজী শিখিয়া, খৃষ্টীয়ান্ পাদ্রিগণ সচরাচর যে-ভাবে অবতারের প্রতিষ্ঠা করিয়া থাকেন, তাহা শুনিয়া ও পড়িয়া, অবতারবাদ সম্বন্ধে আমাদের মনে এমন একটা ধারণা হইয়াছে যে অবতারের কথা শুনিলেই আমরা যেন একটু শিহরিয়া উঠি। কিন্তু প্রকৃত হিন্দু সাধনা ও সিদ্ধান্তে ঈশ্বরের অবতার এইরূপ একটা অদ্ভুত বা অসম্ভব বা অযৌক্তিক ব্যাপার নহে। হিন্দু প্রায় সকলেই অদ্বৈত-বাদী। কেহ বা বিশুদ্ধাদ্বৈতবাদী, কেহ বা বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী, কেহ বা দ্বৈতাদ্বৈতবাদী, কেহ বা অচিন্ত্যাভেদাভেদবাদী; কিন্তু ইঁহারা সকলেই আদি ও মূল তত্ত্ব যে এক, দুই নয়, ইহা স্বীকার করেন। এই অদ্বৈতবাদটা হিন্দুর হাড়ে হাড়ে ঢুকিয়া গিয়াছে, অশিক্ষিত অজ্ঞ জনেরাও অজ্ঞাতসারে এইটি বিশ্বাস করিয়া থাকে। তাহাদের নিক-টেও সকলই ঈশ্বর। আর এই অদ্বৈতবাদেতে অবতারবস্তুটিকে অতি সোজা করিয়া তুলিয়াছে। মূলতত্ত্ব ও আদিবস্তু যখন এক, দুই নহে; সেই এক আদি ও মূল তত্ত্ব বা বস্তু হইতেই যখন এই বিচিত্র বহুর উৎপত্তি ও প্রকাশ হইয়াছে; একের এইরূপ বহু হওয়াই যখন সৃষ্টি;—তখন সৃষ্টির আদি হইতেই ত স্রষ্টার অবতার আরম্ভ

হইয়াছে। সেই এক ও অনাদি তত্ত্বই ত এই সৃষ্টিধারাতে বহু রূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন। এই ভাবে যে এই জগৎটাকে দেখিবে বা দেখে, সে কখনও ভগবানের অবতার-কথা শুনিয়া একেবারে আঁৎকাইয়া উঠিবে না।

আমরা আঁৎকাইয়া উঠি এই জন্য যে আমরা এই জগতে একটা অসীম ও একটা সসীম; একটা অনন্ত ও একটা সান্ত; একটা চেতন ও একটা জড়,—এইরূপ দুইটা পরস্পর বিরোধী বস্তুর কল্পনা করিয়া থাকি। অসীম আর সসীম, অনন্ত আর সান্ত, চেতন আর অচেতন, ইহারা যে পাশাপাশি থাকিতে পারে না, এই কথাটা আমরা তলাইয়া দেখি না। সান্ত থাকিলেই অনন্তের অনন্তত্ব নষ্ট হয় সসীম কিছু থাকিলেই অসীমের অসীমত্ব লুপ্ত হয়। সান্তই যে তখন অনন্তকে প্রতিরোধ করিয়া, তার অনন্তত্ব নষ্ট করে। সসীমই যে তখন অসীমকে সীমাবদ্ধ করে। আমি যদি ভগবান হইতে পৃথক্ হই, আমার যদি একটা স্বতন্ত্র সত্তা থাকে, তবে আমার এই স্বাতন্ত্র্যের সীমানায় ঠেকিয়া, তিনি নিজেও যে সসীম হইয়া পড়েন। ভগবান হইতে কোনও কিছু যদি পৃথক্ ও স্বতন্ত্র থাকে, তাহা হইলেই ভগবানের অসীমত্ব ও অনন্তত্ব লোপ পাইয়া যায়। ভগবানকে যখনই অনন্ত ও অসীম বলি, তখনই এই জগতের যাহা-কিছু তৎসমুদায়কে তাঁরই অন্তর্ভুক্ত, তাঁরই অঙ্গীভূত, তাঁরই আপনার বিবিধ প্রকাশ বলিয়া মানিয়া লই। অতএব এই ব্রহ্মাণ্ডে দুই'এর স্থান নাই। অসীম ও সসীম, অনন্ত ও সান্ত—ইহারা পরস্পর বিরোধী নহে। যাহা প্রকৃতপক্ষে অসীম ও অনন্ত, তাহা অসীম ও অনন্ত থাকিয়াই সসীম ও সান্তরূপে এই ব্রহ্মাণ্ডে প্রকাশিত হইতেছে। এটি না মানিলে অসীম ও অনন্ত পর্য্যন্ত লুপ্ত হইয়া যান। আর অসীমের সসীমরূপে প্রকাশিত হওয়ারই নাম সৃষ্টি। এই সৃষ্টি ব্যাপারের দ্বারা ত অসীমের অসীমত্ব নষ্ট হয় না, নষ্ট হয় নাই। সৃষ্টির বহুত্বের ও বৈচিত্র্যের দ্বারা ও স্রষ্টার একত্বের কোনও ব্যাঘাত জন্মে

নাই। সৃষ্টির সীমার মধ্যে ওতপ্রোতভাবে বিদ্যমান থাকিয়াও ত স্রষ্টা সীমাবদ্ধ হন নাই। জগতের অশেষ প্রকারের ভেদ-বিরোধের মধ্যে আপনাকে প্রকাশিত করিয়াও ত ভগবানের অভেদ একত্বের কোনও ব্যাঘাত হয় নাই। এ সকল কথা যে জানে, বুঝে, কিম্বা একটু তলাইয়া দেখে, সে ভগবানের অবতার কথা শুনিয়া আঁৎকা-ইয়া উঠিতে পারে না। এসকল কথা হিন্দুর অস্থিমজ্জাগত বলিয়াই অবতার-কথা শুনিয়া সে একটুও বিস্মিত হয় না।

কার্য্যকারণ সম্বন্ধ যে ভাল করিয়া বুঝে, সেও অবতার-কথায় বিস্মিত হইতে পারে না। ঈশ্বর বলিতে সকলেই জগতের কারণ-বস্তুকে বুঝিয়া থাকেন। কাল বা প্রকৃতিকে যাঁহারা জগতের কারণ ভাবে, তাঁহারাও ঐ কাল বা প্রকৃতিকেই একরূপ ঈশ্বর বলিয়া প্রতিষ্ঠিত করেন। জগৎ-ব্যাপারটা যে একটা কার্য্য; এই জগৎ যে জন্য বা উৎপন্ন বস্তু; এই জগৎ একদিন ছিল না, অন্ততঃ এই আকারে ছিল না, ক্রমে প্রকাশিত বা অভিব্যক্ত হইয়াছে;—এসকল কথা সকলেই স্বীকার করেন। আর কার্য্য বলিলেই তার একটা কারণও আছে, ইহা ধরিয়া লওয়া হয়। আস্তিক-নাস্তিক, সেশ্বর-নিরীশ্বর সকল মতবাদেই এই প্রত্যক্ষ কারণবাদ মানিয়াছে। এই কারণের প্রকৃতি বা ধর্ম্ম সম্বন্ধে বিস্তর মতবিরোধ আছে; কিন্তু এই বিশ্ব যে একটা কার্য্য আর ইহার যে একটা কারণ আছে, এ সম্বন্ধে কোনও মতভেদ নাই। আর কার্য্য মাত্রেই কারণের পরিণাম, কারণই আপনি কার্য্যরূপে পরিণত বা আকারিত বা অভিব্যক্ত বা পরিবর্ত্তিত হয়, ইহাও অস্বীকার করা অসম্ভব। বলয়কঙ্কনাদির কারণ সুবর্ণ; এই সুবর্ণ বলয়কঙ্কনরূপে পরিণত বা আকারিত হইয়াই বলয়াদির প্রকাশ ও প্রতিষ্ঠা করে। আমার এই নিবন্ধের অন্তর্গত এই সকল পদের ও বাক্যের কারণ আমার মনের চিন্তা বা অন্তরের ভাব। আমার চিন্তা বা ভাবই এই নিবন্ধরূপে পরিণত বা আকারিত হইয়া ইহার রচনা ও অভিব্যক্তি করিতেছে। তবে এসকল কার্য্যের কারণ বস্তুতঃ

দুইটি—একটি নিমিত্ত কারণ, অপরটি উপাদান কারণ। কঙ্কনবলয়াদির নিমিত্ত কারণ স্বর্ণকার, উপাদান কারণ সোনা। স্বর্ণকারের মনের অলঙ্কারবিশেষের ছবিটি, সোনার সাহায্যে, সোনা গালাইয়া বা পিটিয়া, এই নূতন আকারে পরিণত বা আকারিত করিয়া, এসকল কঙ্কনবলয়াদির সৃষ্টি করিয়াছে। আমার এই নিবন্ধের নিমিত্ত কারণ আমার মনোভাব, উপাদান কারণ ভাষা। আমার মনোভাব ভাষাকে লইয়া, নিজের মনোমত করিয়া বিভিন্ন শব্দের, পদের, বাক্যের একটা বিশেষ সমাবেশ করিয়া তাহার মধ্যে আপনাকে প্রকাশ করিতে যাইয়া, এই নিবন্ধরচনা করিতেছে। সোনারের মনের কঙ্কনবলয়াদির চিত্র বা মানসমূর্ত্তি সোনাকে আশ্রয় করিয়া আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। সোনারের মনোভাব ও সোনার তাল—অর্থাৎ কঙ্কনবলয়ের নিমিত্ত ও উপাদান কারণ দুই'—এই কঙ্কনবলয়ের আকারে পরিণত বা আকারিত হইয়া ইহাদের সৃষ্টি করিয়াছে। আমার অন্তরের চিন্তা ও ভাব বাহিরের ভাষাকে অবলম্বন করিয়া এই নিবন্ধরূপে প্রকাশিত হইতেছে। অর্থাৎ এই নিবন্ধের নিমিত্ত ও উপাদান—দ্বিবিধ কারণই এই নিবন্ধরূপ কার্য্যের মধ্যে, এই কার্য্যরূপে পরিণত বা আকারিত হইতেছে। ইহা কার্য্য-কারণবাদের মূল তত্ত্ব। এই তত্ত্ব সার্ব্বজনীন। যেখানে কারণ ও কার্য্য, সেখানেই এরূপ পরিণাম ঘটে। কার্য্য বলিতেই কারণের পরিণাম বুঝায়। কারণে যাহা নাই কার্য্যেতে তাহা থাকিতে পারে না। কারণে যাহা প্রচ্ছন্ন, কার্য্যে তাহাই কেবল প্রকাশিত হয়। কোনও কার্য্যের মধ্যেই আপনার কারণ ছাড়া, আর কোনও কিছুর প্রকাশ বা প্রতিষ্ঠা হয় না, হইতেই পারে না।

এই বিশ্বের কারণ কি, এসম্বন্ধে নানা মত আছে, নানা মত থাকিতে পারে। কিন্তু সে-কারণ একই হউক কিম্বা বহুই হউক, তাহা চেতনই হউক, আর জড়ই হউক,—যাহাই হউক না কেন, সেই কারণই যে বিশ্ব-কার্য্যরূপে প্রকট ও পরিণত হইয়াছে ও হইতেছে, কারণবাদের প্রকৃত তত্ত্ব যে বুঝে সে'ই একথা মানিবে। ব্রহ্ম বা ঈশ্বর বা ভগবান

যদি এই ব্রহ্মাণ্ডের কারণ হয়েন, তাহা হইলে তিনিই যে এই ব্রহ্মাণ্ডরূপে পরিণত বা আকারিত হইয়াছেন বা হইতেছেন, এই বিশ্বের সমষ্টির ও ব্যষ্টির সকলের কারণ যখন ঈশ্বর, তখন সমষ্টিভাবে এই বিশ্ব ও ব্যষ্টিভাবে ইহার অন্তর্গত প্রত্যেক পদার্থ যে তাঁহারই অভিব্যক্তি, তাঁহারই অবতার, একথা না মানিয়া চারা আছে কি? যদি বল ঈশ্বর বিশ্বের নিমিত্ত কারণ মাত্র, উপাদান কারণ নহেন, তাহা হইলেও এই বিশ্বের আকারটা যে তাঁরই মনোভাবের অভিব্যক্তি, তাঁরই চিন্তার প্রকাশ, ইহা মানিতে হইবে। অর্থাৎ তাহা হইলেও এই ব্রহ্মাণ্ড সমষ্টিরূপে ও ব্যষ্টিরূপে ব্রহ্মের বা ঈশ্বরেরই একরূপ অবতার ইহা স্বীকার করিতে হইবে। সে অবস্থায়, অর্থাৎ অপর উপাদান কারণ আছে বলিয়া, ব্রহ্ম বা ঈশ্বর ব্রহ্মাণ্ডে সম্পূর্ণরূপে পরিণত হইয়াছেন, এমন বলা যাইবে না। কিন্তু তখনও তাঁর আংশিক অবতাররূপে এই ব্রহ্মাণ্ডকে গ্রহণ করিতেই হইবে।

কেহ কেহ ভাবেন ঈশ্বরের শক্তি এই ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি করিয়াছে—ঈশ্বরই যে নিজে ব্রহ্মাণ্ডরূপে পরিণত বা প্রকাশিত হইয়াছেন, তাহা নহে। কিন্তু শক্তিমান আর শক্তিতে কোনও প্রভেদ আছে কি? শক্তি যখন কোনও কার্য্য উৎপাদন করে, তখনই কেবল আমরা তাহাকে শক্তিমান হইতে পৃথক্ করিয়া ভাবি। কোনও কার্য্যবিশেষের মধ্যে যতক্ষণ শক্তি প্রকাশিত না হয়, ততক্ষণ তাহাকে আমরা শক্তিমান হইতে পৃথক্ জানি না, জানিতে পারি না, ভাবি না, ভাবিতেও পারি না। আর শক্তি অর্থ কি? শক্তির লক্ষণ কি? প্রামাণ্য কোথায়? শক্তি যতক্ষণ নিষ্ক্রিয় থাকে, ততক্ষণ তাহার প্রামাণ্য থাকে না। যাহার দ্বারা কোনও কার্য্য উৎপন্ন হয়, তাহাকেই ত আমরা শক্তি বলিয়া জানি। তবে শক্তি আর কারণ একই কথা নয় কি? যখন ব্রহ্মকে বা ঈশ্বরকে বা ভগবানকে জগৎকারণরূপে দেখি, তখন তাঁহাকে শক্তিরূপেই দেখিয়া থাকি। আর তখন এই শক্তিকে ব্রহ্মের বা ঈশ্বরের বা ভগবানের স্বরূপবস্তু, তাঁহার

মূল প্রকৃতির অন্তর্গত বলিয়াই ভাবি। কারণ হইতে যখন কার্য্য প্রকাশিত হয়, তখন যেমন সেই কার্য্যকে সেই কারণেরই বিকার-রূপে দেখি; সেইরূপ জগৎ-কার্য্য দেখিয়াই আবার জগৎকারণকে এই কার্য্যের মধ্যেই দেখিয়া থাকি। এই কার্য্যকে সেই কারণের পরিণাম বলিয়াই জানি। ঈশ্বরের শক্তিই জগতের কারণ। এই শক্তি ঈশ্বরের সঙ্গে অভিন্ন, তাঁহারই স্বরূপ বস্তু। এই জগৎ সেই স্বরূপ শক্তিরই বিকার, পরিণাম, বা কার্য্য। সেই স্বরূপ শক্তিই এই জগৎকার্য্যরূপে প্রকাশিত হইয়াছে। এই জগতের যাবতীয় পদার্থ সেই শক্তিরই পরিণাম ও প্রকাশ। ভগবদ্‌শক্তি এই বিশ্বে, এই বিশ্বরূপে, সমষ্টিভাবে ও ব্যষ্টিতাকারে অবতীর্ণ হইয়াছে। এসকল কথা অস্বীকার করা যায় কি?

তার পর, এই ঐশী শক্তি এই বিশ্বসৃষ্টি ব্যাপারে অপর কোনও পদার্থের সাহায্য লইয়াছে কিনা, এই প্রশ্নও উঠে। যদি বল লইয়াছে, তাহা হইলে এই ঐশী শক্তি জগতের একমাত্র কারণ নহে। অর্থাৎ সে-অবস্থায় ঈশ্বরকে বা ভগবানকে বা ব্রহ্মকে বিশ্বের নিমিত্ত কারণই কেবল বলিতে হয়; নিমিত্ত কারণ ও উপাদান কারণ দুই যে ব্রহ্ম, এমন কথা বলা যায় না। কিন্তু ইহাতেও সকল গোল মিটিল না। নিমিত্ত ও উপাদান এই উভয়বিধ কারণ মিলিয়া যেখানে কোনও কার্য্য উৎপাদন করে, সেখানে ইহাদের পরস্পরের মধ্যে একটা সম্বন্ধের প্রতিষ্ঠা হয়। সম্বন্ধ ছাড়া এরূপ মিলন হইতে পারে না। আর যেখানেই দুই বস্তুর মধ্যে কোনও সম্বন্ধের প্রতিষ্ঠা হয়, সেখানেই একটা সাধারণ সম্বন্ধ-সূত্রেরও প্রতিষ্ঠা হইয়া থাকে। এই সম্বন্ধের সূত্র সম্বন্ধের অন্তর্গত বস্তুসকলকে ধারণ করিয়া রহে। এই সম্বন্ধ-সূত্র সেই বস্তুসকল অপেক্ষা বড় হওয়া চাই, তাহাদের সকলের মধ্যে এবং যুগপৎ সকলের অতীতে থাকা চাই। মণি-হারের সূত্র যেমন প্রত্যেক স্বতন্ত্র মণিতে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া, তাহাকে ও হারের অপর সকল মণিকে অতিক্রম করিয়া রহে; সেইরূপ কোনও সম্বন্ধের

সম্বন্ধ-সূত্রও সম্বন্ধের অন্তর্ভুক্ত প্রত্যেক বস্তু বা তত্ত্বকে অধিকার করিয়া, একই সঙ্গে তাহাদের অতীতে থাকে। সুতরাং ঈশ্বর বা ব্রহ্ম যদি জগতের নিমিত্ত কারণমাত্র হয়েন, আর পরমাণু বা অন্য কিছু যদি ইহার উপাদান কারণ হয়,—স্বর্ণকার যেমন সোনার উপাদানে অলঙ্কার নির্ম্মাণ করে, কিম্বা কুম্ভকার যেমন মৃত্তিকার উপাদানে ঘটসরাবাদি নির্ম্মাণ করে; ব্রহ্ম বা ঈশ্বর যদি সেইরূপ কোনও বাহিরের উপাদান লইয়া এই ব্রহ্মাণ্ডকে গড়িয়া পিটিয়া বর্ত্তমান আকারে পরিণত করিয়াছেন, এরূপ কল্পনা করিতে হয়, তাহা হইলে ব্রহ্মের বা ঈশ্বরের উপরে আর একটা তত্ত্বের প্রতিষ্ঠা করা আবশ্যক হইয়া উঠে। কেননা, এইরূপ একটা চরমতত্ত্বেতেই তখন জগৎসৃষ্টিব্যাপারে ব্রহ্ম বা ঈশ্বররূপ নিমিত্ত কারণের ও পরমাণু প্রভৃতি উপাদান কারণের প্রতিষ্ঠা করা আবশ্যক হইয়া উঠে। আর সে-অবস্থায় ঐ চরমতত্ত্বেতে ঈশ্বরের ও জগতের, ব্রহ্মের ও ব্রহ্মাণ্ডের প্রতিষ্ঠা করিয়া, তাহাকেই আদিকারণরূপে গ্রহণ করিতে হয়। তখন ঈশ্বর বা ব্রহ্ম আর পরমাণু বা জগতের উপাদান, উভয়ই সেই আদিকারণের পরিণাম বা বিকার বা প্রকাশ বা অবতার হইয়া যায়।

কারণের মধ্যে যাহা থাকে, তৎসমুদায়, পূর্ণমাত্রায় কার্য্যেতে প্রকাশিত হয় না, হইতেই পারে না; ইহা সত্য। সুতরাং জগৎ-কারণ যাহাই হউক না কেন, তাহার সমগ্রতা কখনই জগৎকার্য্য-রূপে পরিণত হয় না। সুতরাং এই অর্থে পূর্ণ-অবতার কথাটি সত্য নহে। অবতার যাহা হইতে হয়, তাহাকে আমাদের শাস্ত্রীয় পরিভাষায় অবতারী করিয়াছেন। অবতারী হইতেই অবতারের প্রকাশ হয়। অবতারী অবতারের কারণ। আর কারণ বলিয়া অবতারী আপনার কার্য্যরূপ অবতারকে সর্ব্বদাই অতিক্রম করিয়া রহেন। অর্থাৎ অবতারী কখনওই নিঃশেষে আপনাকে তাঁহার কোনও অবতারের মধ্যে প্রকাশিত করিতে পারেন না। অবতারীর এই অক্ষমতা

বাহিরের নয়, তাঁর ভিতরের; অপরের আরোপিত নহে, তাঁহার আপনার প্রকৃতিরই অন্তর্গত। ঈশ্বর সর্ব্বশক্তিমান বলিয়া আপনার রূপকেও যে অতিক্রম বা বিপর্য্যস্ত করিতে পারেন, তাহা নহে। তাঁহার সর্ব্বপ্রকার শক্তিমত্তা তাঁর স্বরূপের অন্তর্গত, স্বরূপ-ধর্ম্ম। এই স্বরূপ নষ্ট হইলে তাঁর সর্ব্বশক্তিমত্তার আশ্রয় এবং প্রতিষ্ঠাও ত থাকে না, তখন এই সর্ব্বশক্তিমত্তা পর্য্যন্ত নষ্ট হইয়া যায়। এই জন্য, সর্ব্বশক্তিমান বলিয়া, ঈশ্বর যে আপনার কারণ-স্বরূপকে নষ্ট করিয়া নিঃশেষে আপনাকে কার্য্যরূপে পরিণত বা অভিব্যক্ত করিতে পারেন, এমন কখনই বলা যায় না। এই জন্যই প্রকৃতপক্ষে যে-চরমতত্ত্বকে আমরা জগৎ-কারণরূপে প্রতিষ্ঠিত করি, এই সৃষ্টি-ধারাতে কোথাও তাঁর কোনও নিঃশেষ প্রকাশ বা পূর্ণ অবতার সম্ভবে না। এই জগৎকারণ অব্যক্ত। এই অব্যক্ত-তত্ত্বই সৃষ্টিতে ব্যক্ত হইতেছে। কিন্তু স্বরূপতঃ যাহা অব্যক্ত, তাহার নিঃশেষ অভিব্যক্তি অসম্ভব। এইরূপ অভিব্যক্তিতে তার অব্যক্ত-স্বরূপই যে নষ্ট হইয়া যায়। অবতার অর্থই প্রকাশ বা অভিব্যক্তি। নিঃশেষ অভিব্যক্তি আর পূর্ণাবতার একই কথা। এই জন্যও জগৎকারণের পূর্ণাবতার সম্ভবে না।

তবে কার্য্যের মধ্যে কারণের নিঃশেষ প্রকাশ অসম্ভব হইলেও, কারণতত্ত্ব সর্ব্বদাই অখণ্ড ও পরিপূর্ণরূপে আপনার কার্য্যের অন্তরালে বিদ্যমান থাকেন। প্রকাশেরই তারতম্য ঘটে, সত্তার ইতরবিশেষ থাকে না। স্বর্ণকারের সমগ্রতাই তাহার নির্ম্মিত কঙ্কনবলয়াদির অন্তরালে বিদ্যমান থাকে, কিন্তু তাহার শক্তির ও জ্ঞানের ও কারুকুশলতার সামান্য অংশ মাত্রই এ সকল অলঙ্কারেতে প্রকাশিত হয়। সেইরূপ জগৎকারণ সমগ্রভাবেই জগতের প্রত্যেক কার্য্যের অন্তরালে বিদ্যমান থাকেন, কিন্তু এ সকল কার্য্যে তাঁর অংশ মাত্র প্রকাশ করে। সত্তার দিক্ দিয়া ব্রহ্ম বা ঈশ্বর বা ভগবান এই ব্রহ্মাণ্ডের সর্ব্বত্র সমভাবে, পরিপূর্ণরূপে বিদ্যমান রহিয়াছেন। জড় ও চেতন,

মন্দ ও ভাল, অসাধু ও সাধু, পাপী ও পুণ্যবান—সকলের মধ্যে ভগবান পরিপূর্ণরূপে বিদ্যমান রহিয়াছেন। কোথাও কম কোথাও বেশী নহেন। কিন্তু প্রকাশের বা অভিব্যক্তির দিক্ দিয়া বিস্তর ইতর বিশেষ রহিয়াছে। চেতনে তাঁর যতটা প্রকাশ, জড়েতে ততটা নাই। সাধুতে, পুণ্যবানে যতটা প্রকাশ, অসাধু পাপীতে ততটা নাই। এ সকল কথা সর্ব্ববাদীসম্মত। সত্তার দিক্ দিয়া দেখিলে সাধারণ মানুষের মধ্যে তিনি যেমন আপনার পরিপূর্ণ স্বরূপে বিদ্যমান, শ্রেষ্ঠতম অবতারের মধ্যেও সেইরূপই,—পূর্ণতার ত আর কমবেশ নাই। কিন্তু প্রকাশের দিক্ দিয়া প্রাকৃত মানুষে আর অবতারেতে আকাশ-পাতাল প্রভেদ দেখিতে পাওয়া যায়। আর এই প্রকাশের দিক্ দিয়া বিচার করিয়াই, যেখানে লোকে ভগবানের অত্যধিক বা সর্ব্বাপেক্ষা বেশী প্রকাশ দেখিতে পায়, সেখানেই তাঁর পূর্ণ অবতার হইয়াছে—ইহা বলে। প্রকৃতপক্ষে, তত্ত্ববিচারে—সত্যের আলোচনাতে, এরূপ পূর্ণাবতারের প্রতিষ্ঠা সম্ভব নহে। ভগবদ্গীতা বারম্বার এই কথা বলিয়াছেন। প্রাচীন প্রস্থানত্রয়ের মধ্যে গীতাতেই প্রথমে পরিস্ফুটরূপে অবতার কথার অবতারণা দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু এই গীতাই আবার ভগবানের পূর্ণ অবতার একরূপ অস্বীকার করিয়াছেন।

অব্যক্তং ব্যক্তিমাপন্নং মন্যন্তে মামবুদ্ধয়ঃ

বুদ্ধিহীন লোকে যে-আমি অব্যক্ত সেই আমিই ব্যক্তিত্ব প্রাপ্ত হই, এরূপ মনে করিয়া থাকে। অর্থাৎ সম্যকদর্শী পণ্ডিতেরা এরূপ মনে করেন না। তাঁহারা ইহা জানেন যে অব্যক্তের পূর্ণ অভিব্যক্তি সম্ভব নহে। যে-ভাগবত পরবর্ত্তীকালে অবতারবাদের পুচ্ছ-প্রতিষ্ঠা হইয়াছেন, সেই ভাগবত শাস্ত্রে পর্য্যন্ত এই পূর্ণাবতার অস্বীকার করিয়াছেন। ভাগবত-বর্ণিত এই অবতার-তত্ত্বটি অতি অপূর্ব্ব বস্তু। ভাগবত ব্রহ্মসূত্রের চরম সিদ্ধান্তের আশ্রয়েই প্রকাশিত হইয়াছে। ভাগবত প্রথম শ্লোকে সাধ্য-নির্দ্দেশরূপ মঙ্গলাচরণ করিতে যাইয়া জগতের

জন্ম-আদি যে-ব্রহ্ম হইতে হয়, সেই পরম সত্যের ধ্যান করি, এই কথা বলিয়া, আপনাকে প্রস্থানত্রয়ের সঙ্গে অনুস্যূত করিয়াছেন।

জন্মাদ্যস্য যতোঽন্বয়াদিতরতশ্চার্থেষ্বভিজ্ঞঃ স্বরাট্
তেনে ব্রহ্ম হৃদা য আদিকবয়ে মুহ্যন্তি যৎ সূরয়ঃ।
তেজোবারিমৃদাং যথা বিনিময়ো যত্র ত্রিসর্গোঽমৃষা
ধাম্না স্বেন সদা নিরস্তকুহকং সত্যং পরং ধীমহি॥

অর্থাৎ—সত্যস্বরূপ পরমেশ্বরের ধ্যান করি। তিনি সর্ব্বজ্ঞ ও স্বপ্রকাশ। যে-বেদার্থ সম্বন্ধে জ্ঞানিগণও মোহাচ্ছন্ন হয়েন, তিনি আদিকবি ব্রহ্মার হৃদয়ে সেই বেদ প্রকাশ করিয়াছেন। যেমন মরীচিকা ও কাচাদিতে বারিবুদ্ধি ভ্রমমাত্র, সেইরূপ ভ্রমবশতঃই তাঁহাতে এই সৃষ্টি কল্পিত হইয়া থাকে। তিনি মৃত্তিকা ও স্বর্ণের মতন কারণ-রূপে, আবার ঘট ও কুণ্ডলের মতন কার্য্যরূপে আবির্ভূত হইয়া এই বিশ্বের সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয় করেন। তিনি আপনার তেজের দ্বারা সমস্ত কুহক নিরস্ত করেন।

এই শ্লোকার্থই ভাগবত-শাস্ত্রের অদ্বৈতপরত্ব প্রতিষ্ঠিত করিতেছে। ভাগবতের দ্বিতীয় স্কন্ধের নবম অধ্যায়ে, ৩২-৩৩-৩৪ শ্লোকে ব্রহ্মা-প্রতি ভগবদ্বাক্যেও ইহাই পরিপূর্ণরূপে সমর্থিত হইয়াছে।

জ্ঞানং পরমগুহ্যং মে যদ্‌বিজ্ঞান সমন্বিতম্।
সরহস্যং তদঙ্গঞ্চ গৃহাণ গদিতং ময়া॥
যাবানহং যথাভাবো যদ্রূপগুণকর্ম্মকঃ।
তথৈব তত্ত্ববিজ্ঞানমস্তু তে মদনুগ্রহাৎ॥

এইরূপে পরম গুহ্য জ্ঞানের কথা বলিতে যাইয়া ভগবান আপনাকে অদ্বৈততত্ত্বরূপে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। পরবর্ত্তী ৩৪ শ্লোকে তার প্রমাণ দেখিতে পাই।

অহমেবাসমেবাগ্রে নান্যদ্‌যৎ সদসৎ পরম্।
পশ্চাদহং যদেতচ্চ যোঽবশিষ্যেত সোঽস্ম্যহম্॥